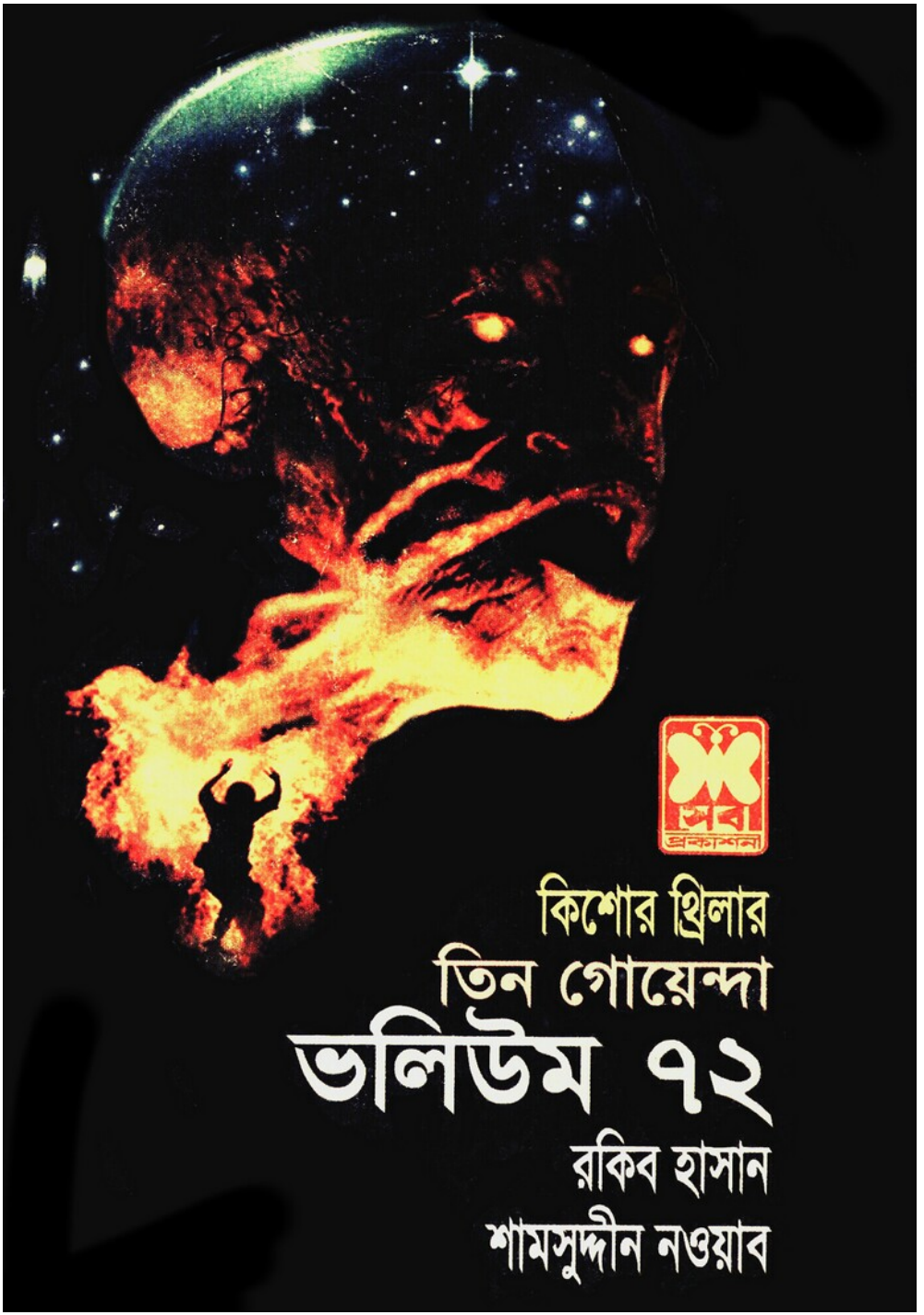

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৭২

রকিব হাসান

শামসুদ্দীন নওয়াব

ভলিউম-৭২

তিন গোয়েন্দা

ভিনদেশী রাজকুমার: রকিব হাসান

রাত দুপুরে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেল ভিনদেশী এক রাজকুমার। খবরটা শোনার পর আর দেরি নেই, তিন গোয়েন্দা ঝাঁপিয়ে পড়ল তদন্তে। এগিয়ে এল আরও একজন, বাগড়া দেয়ার ওস্তাদ, ফগর‍্যাম্পারকট।

সাপের বাসা: রকিব হাসান

চক্কর দিতে তৈরি হচ্ছে কিশোর, এই সময় ডানের ফুট প্যাডালে ঝাঁকুনি লাগল। চরকির মত পাক খেতে আরম্ভ করল আলট্রালাইট বিমান। প্রাণপণে প্যাডাল চেপে রাডার ঠিক করার চেষ্টা চালাল সে। কিন্তু কাজ হলো না, আটকে গেছে ওটা। নিয়ন্ত্রক তার ছিঁড়ে নিশ্চয়ই আটকে গেছে রাডার। মাটিতে আছড়ে পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

রবিনের ডায়েরি: শামসুদ্দীন নওয়াব

পার্কভিলে রবিনের আলফ্রেড চাচার বাসায় বেড়াতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। আবিষ্কার করল, রবিনের চাচাতো ভাই ববের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটছে। এক ধরনের হিংস্র বানরে পরিণত হচ্ছে সে। ওকে বাঁচাতে হবে এই মহাবিপদ থেকে। পাশে এসে দাঁড়াল নতুন বান্ধবী লিযি। যে বিজ্ঞানী এ-কাজ করেছেন তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে তিন গোয়েন্দার···বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভলিউম-৭২

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান ও
শামসুদ্দীন নওয়াব

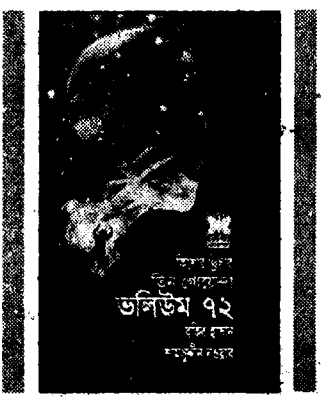

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা
প্রকাশনী

একচল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-1566-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১-৮১৯০২০৩

Volume-72
TIN GOYENDA SERIES
By Rakib Hassan &
Shamsuddin Nawab

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

ভিনদেশী রাজকুমার/রকিব হাসান ৭-৭৫
সাপের বাসা/রকিব হাসান ৭৬-১৫৫
রবিনের ডায়েরি/শামসুদ্দীন নওয়াব ১৫৬-১৯২

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কঙ্কালবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪১/-

তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুটকি শত্রু)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪১/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

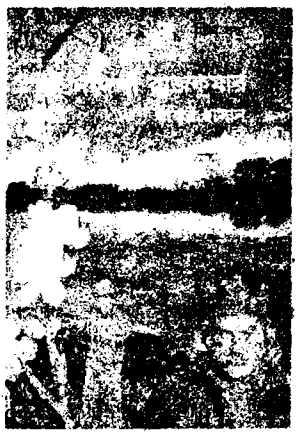

ভিনদেশী রাজকুমার

রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

'এই ছুটিটা ইকটুও ভাল্লাগছে না আমার,' ঝিমানো স্বরে বলল ফারিহা। 'রবিন নেই, কিশোর নেই, টিটু নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট।'

'ওরা নেই তো কি হয়েছে, আমি তো আছি, বাগানে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাই, পিকনিকে যাই, মাছ ধরতে যাই, তাও ভাল লাগে না?'

'সে তো খালার ভয়ে যাও, খালা বলে দেয় সেজন্যে, ইচ্ছে করে যাও নাকি।'

'তুমি একটা অকৃতজ্ঞ!'

ঝগড়ার ভয়ে চুপ হয়ে গেল ফারিহা। রোজই এ ভাবে কথা বলতে বলতে একসময় ঝগড়া বেধে যায়। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'দিনও আর বেশি বাকি নেই। কি মনে হয় তোমার, এবারের ছুটিতে কোন রহস্যের সমাধান আমরা করতে পারব?'

'পেলে তো তার সমাধান করব। রহস্যই নেই। বড় বেশি একঘেয়ে হয়ে গেছে এই গ্রীনহিলস গ্রামটা।' উঠে বসল মুসা। 'পত্রিকাটা নিয়ে এসো তো। দেখি ঘেঁটে, কোন রহস্যের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ফারিহা। পত্রিকা আনতে চলল। এরকম করে রোজই পত্রিকা দেখে ওরা। কিছুই পাওয়া যায় না। আজও যে যাবে না, সে নিশ্চিত। তবু অহেতুক বসে থাকার চেয়ে একটা কিছু করা ভাল।

ঘর থেকে গিয়ে পত্রিকাটা নিয়ে এল সে। বাগানের ঘাসের ওপর বিছিয়ে দেখতে লাগল।

'নাহ্, কিচ্ছু নেই,' মুখ বাঁকাল ফারিহা। কয়েকটা ছবি দেখিয়ে বলল, 'ফ্যাশান শোর ভয়াবহ এই মহিলাগুলোর কাণ্ড দেখো, কি উদ্ভট সব পোশাক পরে আছে।'

রাজনীতি, ঘোড়দৌড়, আবহাওয়া এসবের খবর বেশি কার ভাল লাগে? পাতা ওল্টাল মুসা। 'এই যে ক্রিকেটের কথা বলেছে···

'ক্রিকেট দেখে কে! কে জিতল না জিতল তাতে আমার কি!'

আরেক পাতা ওল্টাল মুসা। 'হ্যাঁ, এই যে, গ্রীনহিলসের একটা খবর আছে।'

আগ্রহের সঙ্গে মুখ বাড়াল ফারিহা। খবরটা পড়ল।

খবরের সারমর্ম:

গ্রীনহিলস আর ডাভহিলের মাঝখানের পাহাড়ী অঞ্চলে স্কুলের ছেলেরা ক্যাম্প করেছে। আবহাওয়া বেশ ভাল ওখানকার, অন্যান্য জায়গার তুলনায় ওখানে গরমটা সহনীয়। এই হপ্তায় দু'তিন জন নতুন মুখেরও আগমন ঘটেছে ক্যাম্পে। তাদের একজন বাকাবুয়া স্টেটের রাজকুমার প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া। সঙ্গে করে নিয়ে আসা তার আকর্ষণীয় স্টেট আমব্রেলাটা ক্যাম্পে বেশ উত্তেজনা আর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। যদিও আসার পর ছাতাটা মাত্র একবার ব্যবহার করেছে প্রিন্স।

'ঘোড়ার ডিমের খবর,' নিরাশ হয়ে বলল ফারিহা। 'এর মধ্যে রহস্য কোথায়?'

'নেই। প্রিন্স ঘুটাংফুটাং না কি যেন নাম, তাকে নিয়েই বা কে মাথা ঘামায়।'

'ঘুটাংকাউয়া। মুসা, বাকুবুয়া স্টেটটা কোথায় জানো?'

'আমার ঠেকা পড়েছে জানার জন্যে। আমি শুধু একটা কথাই জানি, ভয়ানক গরম পড়েছে, আর এই গরমে খালি খালি বসে থাকতে থাকতে পাগল হয়ে গেলাম।'

'কিশোর থাকলে সময় কাটানোর একটা উপায় ঠিক বের করে ফেলত।'

'রবিনটাও খালার বাড়ি গেছে যে গেছে, আসার আর নাম নেই। ও থাকলেও এয়ারগান নিয়ে বেরোতে পারতাম। পাহাড়ে চলে যেতাম খরগোশ মারতে।'

'যেতে তো তোমরা। আমি কি করতাম?'

সেদিন দুপুরে খাওয়ার জন্যে ওরা দুজন ঘরে ঢুকলে মুসার আম্মা মিসেস আমান সুসংবাদটা দিলেন, 'কিশোর আসছে। আগামীকাল দুপুরে।'

দুঃসময় যে কাটতে শুরু করেছে, সেটা বোঝা গেল পরদিন সকালে। মুসা আর ফারিহা নাস্তা করতে বসেছে, এই সময় ফোন করল রবিন। খালার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে।

মুসাদের বাড়িতে সে পৌঁছল আটটা বাজার কয়েক মিনিট পর। সে আসার ঘণ্টাখানেক পরই এসে হাজির হলো কিশোর আর টিটু, দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না মুসা, ফারিহা আর রবিন।

কেটে গেল একঘেয়েমি। আবার কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল মুসাদের বাগানের ছাউনি।

এসেই খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করল কিশোর, কোন রহস্য আছে কিনা। কিছুই নেই, জানাল ফারিহা আর মুসা।

মজার কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা, জানতে চাইল তখন কিশোর।

তাও নেই। কোন রকম উত্তেজনা নেই গ্রীনহিলসে। তবে প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া আর তার বিচিত্র ছাতার খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। পেয়ে গেছে বুদ্ধি, সময় কাটানোর।

'ফারিহা, প্রিন্সেস হতে চাও?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে ফারিহা। মুসা আর রবিনও অবাক। কিছু বুঝতে পারছে না।

'ওরকম হাঁ করে আছো কেন সবাই? প্রিন্সেস বোঝো না? রাজকুমারী, রাজকুমারী।'

'আমি রাজকুমারী হব কি করে? আমি কি রাজার মেয়ে? বড়জোর প্রফেসরকুমারী হতে পারি, যেহেতু আমার বাবা প্রফেসর।'

'তবে আমি তোমাকে প্রিন্সেস বানিয়ে দিতে পারি,' মুচকি হাসল কিশোর।

ব্যঙ্গ করে বলল মুসা, 'আলাউদ্দিনের চেরাগ পেয়েছ নাকি?'

'প্রিন্সেস বানাতে চেরাগ লাগে না, কিছু পোশাক-আশাক থাকলেই হয়। সেই সঙ্গে বুদ্ধি আর ছদ্মবেশ নেয়ার ক্ষমতা।'

'দেখো কিশোর, তোমার এই বৃহস্পতি গ্রহের ভাষা বাদ দিয়ে সোজা ইংরেজিতে যা বলার বলো। বাংলা বললেও বুঝতে পারব। দয়া করে আর হেঁয়ালি করো না।'

'শোনো, সময় কাটাতে হলে কিছু একটা করা দরকার আমাদের। হাতে তো কোন রহস্য নেই যে তার সমাধানে লাগব, তাই আমি ভাবছি, ফারিহাকে প্রিন্সেস সাজিয়ে দল বেঁধে আমরা তার সঙ্গে যাব। লোকে ভাববে, ফারিহাও বুঝি কোন দেশের প্রিন্স। কৌতূহলী চোখে তাকাবে। আর ভাগ্যক্রমে পথে যদি ফগের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তো কথাই নেই।'

হাততালি দিয়ে নেচে উঠল ফারিহা, 'দারুণ মজা হবে! কখন সাজব, এখনই?'

'হ্যাঁ, এখনই। দুপুরের অনেক দেরি। তার আগেই যতটা সম্ভব মজা করে নিতে চাই। চলো, আমাদের বাড়িতে, ছদ্মবেশ নেয়ার সাজসরঞ্জাম সব নিয়ে আসব।'

যার যার সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

দুই

যা যা জিনিস দরকার, নিয়ে আবার মুসাদের বাড়িতে ফিরে এল ওরা। ছাউনিতে ঢুকে ছদ্মবেশ নিতে বসল। ঠিক হলো, ফারিহা সাজবে প্রিন্সেস। মুসা আর রবিন ওর দেশের লোক, সহচর, একই স্কুলে পড়ে। কিশোর কিছু সাজবে না। সে যা আছে তাই থাকবে। সবাই বিদেশী হয়ে গেলে লোকে কোন প্রশ্ন করলে তার জবাব দেবে কে, সেজন্যে।

সাজতে সাজতে রবিন বলল, 'অ্যাই কিশোর, আরেক কথা বললে হয় না? ফারিহাও বাকাবুয়া থেকেই এসেছে, প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার বোন টেংরিকাউয়া।'

'আরিব্বাপরে, নামের কি বাহার!' হাসতে লাগল মুসা।

রবিনের প্রস্তাবটা পছন্দ হলো কিশোরের, 'হ্যাঁ, সেটা বরং ভাল হবে, বিশ্বাসযোগ্য। তাই সই, প্রিন্সেস টেংরিকাউয়া।'

সাজা সবে শেষ হয়েছে ওদের, এই সময় দরজার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত

স্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।'

'কি ব্যাপার?' ভুরু কোঁচকাল মুসা, 'অমন চিল্লাচ্ছিস কেন?'

ফারিহা বলল, 'ফগ এল না তো? দেখছ না, কেমন কান খাড়া করে ফেলেছে।'

হতেও পারে।

'দাঁড়াও, তোমরা বেরিও না, আমি দেখছি,' দরজায় মুখ বের করে বাইরে উঁকি দিল কিশোর। স্থির হয়ে গেল। একে এ সময় দেখতে পাবে কল্পনাই করেনি। ফগর‍্যাম্পারকটের ভাতিজা উইলিয়াম ববর‍্যাম্পারকট। সঙ্গে আরও দুটো ছেলে। তিনজনের চেহারায় অনেক মিল। বব সেই আগের মতই আছে, গোলগাল মুখ, তার চাচা ফগর‍্যাম্পারকটের ছেলেবেলার প্রতিকৃতি যেন।

কিশোরকে দেখে হাসি ফুটল ববের মুখে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'টিটুর ডাক শুনেই বুঝেছি, তোমরা আছো। সবাই ভেতরে বুঝি?'

কুবুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। ববকে দিয়েই শুরু করা যাক। নিরীহ স্বরে বলল, 'সবাই মানে?'

'মুসা, রবিন আর ফারিহার কথা বলছি।'

'না, ওরা কেউ নেই। বেড়াতে গেছে সব।'

'একা নাকি তুমি?'

'না, একাও নই। নতুন তিনজন বন্ধু পেয়ে গেছি। বিদেশী।'

'বিদেশী!'

'এসো। এলেই দেখতে পাবে,' ববের সঙ্গের ছেলেদুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এরা কারা?'

ছেলে দুটোকে নিয়ে এগিয়ে এল বব। 'ওরা আমার ভাই, যমজ। এর নাম জব, আর ও পাব। জব-পাব, এ হলো কিশোর পাশা, এর কথাই বলেছিলাম তোমাদের। যাও, হাত মেলাও। ভদ্রভাবে কথা বলবে, বাড়ি থেকে যেভাবে শিখিয়ে এনেছি।'

ভদ্রতা বজায় রাখতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল পাব, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, কিশোর পাশা।'

জবও হাত বাড়াল, ঠোঁট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করে শুধু বলল, 'আঁ!'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল বব। 'এখনও ওই জঘন্য টফিটা মুখে রেখে দিয়েছ! বললাম না ফেলে দিতে?'

চেহারাটা করুণ করে তুলল জব। আঙুল দিয়ে মুখ দেখাল। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে কিছু বোঝাল।

'ও বলছে,' সঙ্কেতের মানে করে দিল পাব, 'মুখ খুলতে পারছে না। আবার আটকে গেছে টফিটা। কালকের মত।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল সারাদিনই টফি আটকে ছিল, মুখ খুলতে পারেনি।'

অবাক হয়ে গেল কিশোর, 'ও কি শুধু টফি খেয়েই বাঁচে নাকি?'

'আঁ!' অনেক চেষ্টায় যেন ঠোঁট দুটো আবার সামান্য ফাঁক করে জবাব দিল জব।

'কি বলল ও, হ্যাঁ, নাকি না?' তবে জবাবের আশায় থাকল না কিশোর। তিন ভাইকে ডাকল, 'এসো, ভেতর এসো, আমার বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হবে।'

ঘরে ঢুকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল বব। একটুও চিনতে পারছে না মুসা, রবিন কিংবা ফারিহাকে। জব আর পাব অবাক চোখে তাকাচ্ছে ঘরের চারদিকে।

'বাকাবুয়া স্টেটের প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার নাম নিশ্চয় শুনেছ তুমি, বব,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'এ হলো তাঁর বোন প্রিন্সেস টেংরিকাউয়া।'

বব আর তার দুই ভাইকে দেখে বিস্ময় এখনও কাটেনি ফারিহার। রবিন আর মুসাও চুপ করে আছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল বব, 'তাই নাকি! প্রিন্সেস! আরে আমি তো ওর ভাই ঘুটাংকাউয়ার তাঁবুর পাশেই ক্যাম্প করেছি। তবে যাই বলো, ভাইয়ের চেয়ে বোনের চেহারা অনেক সুন্দর। প্রিন্সের দিকে তাকালে তো আমার খালি মোরগের কথা মনে হয়। এমন করে গলা টান করে, মনে হয় এই বুঝি কুক্কুরু করে ডেকে উঠবে।'

'উঠবে কি বলছ, ডাকেই তো,' পাব বলল। 'কেমন করে কথা বলে দেখো না। মুরগীর ডাকের চেয়ে ভাল আর কোথায়।'

'আঁ!' মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাটা বোধহয় পছন্দ হচ্ছিল না জবের, কোনমতে বলল।

'প্রিন্সেসকে তাহলে পছন্দ হয়েছে তোমাদের।' ফারিহার দিকে ফিরল কিশোর, 'টেংরি, ইদন মিদন বব, পাব, জব চিদন।'

রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা কাত করে ফারিহা জবাব দিল, 'ঘুটাং ঘুটাং হুটাং ফট।'

ব্যাঙের মত গোল গোল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন ববের, 'কি বলল ও?'

দোভাষীর কাজ চালাল কিশোর, 'আমি ওকে তোমাদের পরিচয় দিলাম। ও জিজ্ঞেস করল, তোমার চুলগুলো অমন উস্কোখুস্কো কাকের বাসা কেন?'

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি আঙুল চালিয়ে চুলগুলো সোজা করার চেষ্টা করল বব। 'ওকে বলো, রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি তো, তাই বেশভূষা ঠিক করে আসিনি।'

'যাই হোক, ও কিছু মনে করেনি। দাঁড়াও এদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।' মুসাকে দেখাল কিশোর, 'এর নাম হিটাংবগা, টেংরির খালাত ভাই।' রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও মামাত ভাই, ভেংটিশালিক।'

নামের ধাক্কা হজম করতে সময় লাগল ববের।

খিলখিল করে হেসে ওঠা থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে বিরত রাখল ফারিহা।

মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর।

এগিয়ে গেল মুসা। নাক চেপে ধরল ববের নাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হারেং হারেং, হুক্কা-হুয়া!'

চমকে গিয়ে একলাফে পিছিয়ে গেল বব। প্রায় আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল মুসার দিকে।

হেসে সান্ত্বনা দিল কিশোর, 'ভয়ের কিছু নেই। ও খারাপ কিছু বলেনি।

কারও সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এটাই ওদের দেশের রীতি।'

ভয়ে ভয়ে রবিনের দিকে তাকাল বব, ওকে আর নাক ঘষার সুযোগ দিল না, তাড়াতাড়ি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ভেঙচিশাক, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

শুধরে দিল কিশোর, 'ভেঙচিশাক নয়, ভেংটিশালিক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই,' আবার ভুল করে ফেলার আশঙ্কায় নাম উচ্চারণের ঝুঁকির মধ্যে গেল না আর বব।

'এবার তোমার কথা বলো। ক্যাম্প ফিল্ডে তাঁবু ফেলতে গেলে কোন দুঃখে?'

'আমাদের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। মা জোর করে পাঠিয়ে দিল। বলল, কটা দিন অন্তত শান্তিতে থাকতে চায়। আমরা নাকি খুব জ্বালাই। বাড়ি থেকে বিদেয় করল। ক্যাম্প তো করলাম এসে, কিন্তু মজা পাচ্ছি না। খালি হই-চই, মজার কিছু নেই।'

'ঠিক,' ভাইকে সমর্থন করল পাব।

'আঁ!' জব বলল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বড় একটা কৌটা বের করল। মুখ খুলে বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

ভেতরে তাকাল কিশোর। কালচে-বাদামী রঙের চারকোনা কতগুলো জিনিসে ভর্তি কৌটাটা, এ রকম জিনিস আর কখনও দেখেনি সে। বুঝল এগুলোই জবের টফি। মাথা নেড়ে বলল, 'ধন্যবাদ, আমি খাব না। এ জিনিস মুখে দিলে দুপুরের খাওয়াটা মাটি হবে। আমার বন্ধুদেরও দেয়ার দরকার নেই। বিকেলে ভাষণ আছে ওদের। মুখ আটকে গেলে সর্বনাশ, কথা বলতে পারবে না।'

বোদ্ধার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জব। কিছু মনে করল না। কৌটার মুখ লাগিয়ে আবার রেখে দিল পকেটে।

'এ জিনিস কোথায় পেল ও?' ববকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'জীবনেও দেখিনি এরকম টফি।'

'ক্যাম্পের কাছে মেলা হচ্ছে, ওখানকার একটা স্টল থেকে। রিঙ ছুঁড়তে ওস্তাদ জব। খেলে জিতে নিয়েছে টফিগুলো।'

'আঁ!' গর্বিত ভঙ্গিতে হাসল জব।

'হিকারি ডিক, পিকারি টিক, হিক হিক মট!' আচমকা বলে উঠল রবিন।

ওর দিকে তাকিয়ে রইল তিন ভাই। পাব জানতে চাইল, 'ও কি বলল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর, 'ও বলল, জবকে দেখতে লাগছে একটা পচা টফির মত, আধচোষা লালা লাগানো টফি।'

থমকে গেল তিন ভাই।

পেট ফেটে হাসি আসছে গোয়েন্দাদের। হাসার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে ওদের মন, অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রাখছে।

'এতটা কড়া কথা বলা ঠিক হয়নি ওর। যে দেশ থেকেই আসুক, ও রাজার মেয়ের আত্মীয়, নিজে কিছু আর মহারাজা নয়।' দুঃখ পেয়েছে বব, 'যাকগে,

আমরা এখন যাই। মুসাদের সঙ্গে দেখা হলো না বলে খারাপ লাগছে।'

'তোমার চাচার সঙ্গে দেখা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। হওয়ার দরকারও নেই। দেখলেই এক মাইল দূর দিয়ে পালাব। মনে নেই সেবার কি দুর্ব্যবহারটাই না করেছিল আমার সঙ্গে। জব আর পাবও ওকে দেখতে পারে না। আচ্ছা, কিশোর, সেবারের মত কোন রহস্য-টহস্য পাওনি এবার?'

'এখনও পাইনি। তবে রহস্যের ব্যাপারে কিছু বলা যায় না, কখন যে এসে হাজির হবে।'

'টিটিং ফিটিং পিটিং মট!' বলে উঠল মুসা। 'আইসক্রীম খেতে যেতে পারি আমরা।'

'আরি, ও তো ইংরেজিও বলতে পারে!' অবাক হলো বব। 'ঠিক কথাই তো বলেছে, আইসক্রীম খেতে যেতে পারি আমরা। নদীর ধারে এক আইসক্রীমওয়ালা বসেছে, দেখে এসেছি। গাঁয়ের ভেতর যাব না। চাচার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

হাসল কিশোর। তাকাল তিন সহকারীর দিকে। চোখ টিপল মুসা। এতটাই নিখুঁত হয়েছে ওদের ছদ্মবেশ, বুবও ধরতে পারেনি। বাইরে গিয়ে দেখা দরকার লোকে কি করে। নদীর ধারের রাস্তা ধরে গেলে মন্দ হয় না, প্রচুর লোক চলাচল ওদিকটায়।

মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'ইকারি পিকারি টিং! হিকি পিকি ফট! ভট ভট ভট!'

হা হা করে হেসে উঠল মুসা। ববের দিকে তাকিয়ে মাঝপথে থামিয়ে দিল হাসিটা। বেদম হাসির বেগ জোর করে থামাতে গিয়ে কাশতে শুরু করল সে।

ফারিহা আর রবিনও হেসে উঠতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'ঠিক আছে, তা হলে নদীর ধারেই যাব আমরা। বব, সরো, আগে প্রিন্সেসকে বেরোতে দাও। সম্মান রেখে চলা উচিত।'

মুসার হাসির কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল বব, কিশোরের কথা কানে যেতেই লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। প্রিন্সেসের ছাতাটা কোথায়? স্টেট আমব্রেলা? মাথায় দিয়ে যেতে না চাইলেও অসুবিধে নেই, ওর হয়ে আমিই বয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম,' কিশোর বলল, 'মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। তাই তো, ছাতা ছাড়া পথে বেরোনোর কথা ভাবতেই পারে না বাকাবুয়ার প্রিন্সেস।' মুসার কানে কানে কিছু বলল কিশোর।

হাসিমুখে বেরিয়ে গেল মুসা। ফিরে এল বিশাল এক রঙচঙে ছাতা নিয়ে। এটা ওর বাবার ছাতা। সিনেমায় কাজ করেন মিস্টার আমান। একটা ছবিতে শুটিঙের সময় বিশেষ প্রয়োজনে বানাতে হয়েছিল ছাতাটা। কাজ ফুরাঙ্গে ওটা আর নষ্ট করেননি, রেখে দিয়েছেন।

মুগ্ধ চোখে ছাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল বব। এরকম ছাতা আর কখনও

দেখোনি। আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে নিল ওটা। আরেকটা ধাক্কা খেল। ছাতা যে এত ভারি হতে পারে কল্পনা করেনি। কিন্তু বোকামি যা করার করে ফেলেছে, বলেছে রাজকুমারীর ছাতা সে বহন করবে, অতএব এখন কাঁধ বাঁকা হয়ে গেলেও সেটা থেকে বিরত হতে পারবে না আর, আত্মসম্মান বলেও তো একটা কথা আছে।

ফারিহা বলল, 'ছাতাং ফাতাং ঘাতাং কট!'

ছাতার কথা কিছু বলেনি তো? ভুরু কুঁচকে ফারিহার দিকে তাকাল বব। 'ও কি বলল?'

কিশোর জবাব দিল, 'ও বলল, ছাতা বহনকারী হিসেব তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে রাজকুমারীর।'

হাসল বব। 'বাকাবুয়ার ভাষা তো খুব ভাল বোঝ তুমি! অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তোমার যা শেখার ক্ষমতা! ইয়ে, রাজকুমারী টেটাংকুয়াকে বলো...'

'টেটাংকুয়া নয়, টেংরিকাউয়া।'

'ওই হলো। হার হাইনেসকে বলো, আমি সানন্দে তার ছাতা বহন করতে রাজি আছি। যদিও বুঝতে পারছি আজ রাতে একপোয়া ব্যথার মলম মালিশ করতে হবে আমার কাঁধে। বাপরে বাপ, এ জিনিস মাথায় দিয়ে ঘোরে কি করে ওরা?'

'ঘুরবে না, হাতি খায় যে। গণ্ডারও খায় বাকাবুয়ার লোকে। শুনেছি, ধরতে পারলে গরিলাও খেয়ে ফেলে। গায়ে ভীষণ শক্তি। এই যে এত ছোট্ট রাজকুমারী, লেগে দেখো একবার। দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তোমাকে।'

শক্তি পরীক্ষার ধার দিয়েও গেল না তিন ভাই। চমকে পিছিয়ে গেল বরং। হাতি-গণ্ডারখেকো মানুষদের সঙ্গে লাগতে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওদের।

দল বেঁধে পথে বেরোল ওরা। বিচিত্র একটা মিছিল। একসারিতে হেঁটে চলল।

কিশোরদের বাড়ির সামনে দিয়ে নদীতে যাওয়ার একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। সেদিক দিয়ে এগোল ওরা।

বাগানে কাজ করছিল কাজের মেয়ে পপি। একা কুলিয়ে উঠতে পারেন না বলে ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্যে ওকে রেখেছেন মেরিচাচী। কিশোরের সঙ্গে বিচিত্র পোশাক পরা ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে। চিনতে পারল না ওরা কারা।

চোখের কোণ দিয়ে সবই দেখল কিশোর। কিন্তু সরাসরি তাকাল না পপির দিকে।

নিজের বাড়ির বাগানে ফুলগাছে বসা প্রজাপ্রতি ধরছিলেন বৃদ্ধা মিসেস ডেভকার। গলায় মাফলার জড়ানো। ঠাণ্ডার রোগ আছে তাঁর। মিছিলটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। ববের কাঁধের বিশাল ছাতাটায় দৃষ্টি আটকে গেল

তাঁর। ভাবলেন, রেডিওতে ঝড়বৃষ্টি হওয়ার খবর শুনেছে বোধহয় ছেলেমেয়েরা, সেজন্যে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। বৃষ্টির ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি।

মুদী দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুদীর ছেলেটা। নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হলো ববের, রাজকুমারীর ছাতা বহন করছে সে, যা তা কথা নয়। ছেলেটার সামনে নিজেকে আরও হোমড়া-চোমড়া করে তোলার জন্যে ভারিক্কি চালে পা ফেলতে লাগল। রাজকুমারীর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে।

অবশেষে নদীর কিনারে পৌঁছল মিছিল।

গরম আর ছাতার ভারে দরদর করে ঘামছে বব। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওই যে আইসক্রীমওয়ালা।'

তিন

তিন চাকাওয়ালা ভ্যান গাড়িটা গাছের ছায়ায় টেনে এনে তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে আইসক্রীমওয়ালা। ডেকে তাকে তুলল কিশোর।

বিচিত্র পোশাক পরা ফারিহা, মুসা আর রবিনকে দেখে অবাক হলো। ববের হাতের অদ্ভুত ছাতাটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। ক্লান্ত হয়ে গিয়ে কাঁধ থেকে নামিয়ে ওটা মাটিতে খাড়া করে ধরে রেখেছে বব।

'কি চাই, আইসক্রীম?' জিজ্ঞেস করল আইসক্রীমওয়ালা। 'এরা কারা?'

সাড়ম্বরে রাজকুমারীর পরিচয় দিতে উদ্যত হলো বব, কিন্তু চোখ টিপে তাকে থামাল কিশোর। আইসক্রীমওয়ালাকে চেনে সে, বোকা নয় লোকটা, অত সহজে ফাঁকি দেয়া যাবে না ওকে। এত তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশের ব্যাপারটা ফাঁস করতে চাইল না, তাড়াতাড়ি বলল, 'আটটা আইসক্রীম দিন।'

লোকটা বলল, 'লোক তো তোমরা সাতজন, আটটা কেন?'

'সঙ্গে টিটু আছে না?' কুকুরটাকে দেখাল কিশোর।

'ও খাবে? কুকুর আইসক্রীম খেতে পারে?'

'টিটু পারে। খেতে খেতে শিখে ফেলেছে। মানুষ যা যা খায়, ও-ও তাই খায়।'

আইসক্রীম বের করে দিল লোকটা। ক্ষণে ক্ষণে তাকাচ্ছে ছাতাটার দিকে। শেষে আর জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'এটা আবার কি ধরনের ছাতা? এরকম ছাতা তো দেখিনি!'

লোকটার বলার ধরন ভাল লাগল না ববের, রাগ হয়ে গেল, বলল, 'কোত্থেকে দেখবেন? এটা রাজকীয় ছাতা।'

কিশোর বলল, 'চলো, ওদিকটায় গিয়ে বসি। বেজায় রোদ এখানে।'

'এক কাজ করলেই পারি,' বব বলল, 'ছাতাটা মেলে দিয়ে তার তলায় বসি সবাই। কি বলো, কিশোর?'

'পারলে মেলো,' বাকাবুয়ার লোক সে, এটা ভুলে গিয়ে ইংরেজিতে বলে বসল মুসা। 'বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে!'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল বব, 'এত ভাল ইংরেজি বলতে পারো, সেটা বাদ দিয়ে ঘটং-ফটং করো কেন?'

এই নিয়ে দুবার ভুল করল মুসা। এরকম করতে থাকলে ধরা পড়ে যাবে। আবার কি বলে বসে এজন্যে তাড়াতাড়ি জবাব দিল কিশোর, 'মাতৃভাষা বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষা বলতে যাবে কেন?'

'এই যে বলল?'

'স্কুলে বলতে বলতে ইংরেজিটাও অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'তাই বলো। প্রিন্স ঘুটাংকাউয়াও ভাল ইংরেজি বলতে পারে।'

চেষ্টা করে করে গলদঘর্ম হয়ে গেল বব, ছাতা আর মেলতে পারল না।

আইসক্রীম খাওয়া শেষ হলো। ফিরে চলল মিছিল। যে পথে এসেছে সেপথে না গিয়ে ভিন্নপথ ধরল ওরা।

হঠাৎ পথের মোড়ে শোনা গেল সাইকেলের বেলের টিংটিং শব্দ। ওপাশ থেকে যাকে বেরোতে দেখল, দেখে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো ববের। দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করে আতঙ্কিত গলায় বলল, 'সর্বনাশ! চাচা!'

খুশি হয়ে কিশোর বলল, 'বাহ্, ঝামেলা! এইবার হবে আসল মজা!'

ফগকে দেখে চিনে ফেলল টিটু। কিশোরের মতই আনন্দিত হয়ে ঘেউ ঘেউ করে ছুটল। সাইকেলের কাছে গিয়ে লাফিয়ে উঠে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ফগের পায়ে।

লাথি মেরে ওকে সরানোর চেষ্টা করল ফগ। 'আহ্, কি ঝামেলা! এই কুত্তা, সর সর!' নেমে পড়তে বাধ্য হলো সে।

'হাল্লো, মিস্টার ফগ...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' শুধরে দিল ফগ।

'হ্যাঁ, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' মোলায়েম স্বরে বলতে বলতে এগোল কিশোর, 'অনেকদিন দেখা নেই আপনার সঙ্গে। তা ভালই আছেন? এই টিটু, সর, সর, ঝামেলা করিসনে।'

ফগের পায়ে কামড়ানোর আগেই কিশোরের ডাক শুনে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে আসতে বাধ্য হলো টিটু।

এতক্ষণে অন্যদিকে নজর দিতে পারল ফগ। বিচিত্র পোশাক পরা মুসা, রবিন আর ফারিহার দিক থেকে নজর সরল ববের দিকে। তিন ভাতিজাকে এখানে দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো মঙ্গলগ্রহের জীব দেখছে।

'বব!' গর্জে উঠল ফগ, 'তোরা এখানে কি করছিস? কাঁধে ওই ছাতা কিসের?'

'চাচা, অত জোরে চেঁচিও না,' বব বলল, 'বিদেশী মেহমানদের সামনে এভাবে চেঁচানো অভদ্রতা। এখানে একজন রাজকুমারী আছে, ছাতাটা তারই, এটা স্টেট আমব্রেলা। কেন, দেখে চিনতে পারছ না?'

কিছুই বুঝতে না পেরে বোকা হয়ে ভাতিজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ফগ।

চাচাকে জ্ঞান দান করার চেষ্টা করল বব, 'চাচা, বাকাবুয়ার প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার নাম শোননি? ডাভহিলে ক্যাম্প করেছে। আমরাও ওখানে তাঁবু ফেলেছি, প্রিন্সের তাঁবুর পাশেই। এ হলো তার বোন প্রিন্সেস্ টেং-টেং-টেংরিকাউয়া। আর এ হলো ওর খালাত ভাই ভেং-ভেং···' কিছুতেই মনে করতে না পেরে চুপ হয়ে গেল বব।

অবাক হয়ে ফারিহার দিকে তাকিয়ে আছে ফগ।

তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়ের হুডটা আরও খানিকটা টেনে দিল ফারিহা, যাতে ফগ চিনতে না পারে। মুসা আর রবিনও ওদের মুখ ঢাকল।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ফগ। কিশোরের দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, 'ঝামেলা!'

বব বলল, 'এর মধ্যে ঝামেলা দেখলে কোথায়, চাচা? কিশোর পাশার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে এরা। আসতে পারে না?'

'বাচাল হয়েছিস! ওদের সঙ্গে তোদের দেখা হলো কি করে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল ফগ।

'আপনার ভিন ভাতিজা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' কিশোর বলল, 'সেখানেই দেখা। ববকে খুব পছন্দ করেছে প্রিন্সেস টেংরিকাউয়া। তার স্টেট আমব্রেলা বহনের দায়িত্ব দিয়েছে। বব খুব ভাল ছেলে তো, সবাই ওকে পছন্দ করে, আপনি বাদে।'

কিশোরের কথা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল ফগের। কিন্তু বিদেশী মেহমানের সামনে চিৎকার করতে গিয়েও করল না। জ্বলন্ত চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। 'ও সত্যি সত্যি প্রিন্সেস?'

'ফগং টকং পুটপাট ভুটভাট হাউকাউ!' ফারিহা বলল।

'কি বলল?' জিজ্ঞেস করল ফগ।

'জানতে চাইল আপনি সত্যি পুলিশম্যান কিনা,' জবাব দিল কিশোর। 'প্রিন্সেসের সন্দেহ হচ্ছে। কি বলব তাকে?'

ফগের চোখের আগুন আরও বেড়ে গেল।

'পিটিং ফিটিং ঘ্যাট!' আবার বলল ফারিহা।

'মানে?' কিশোরের দিকে তাকাল ফগ।

'আমি সেকথা মুখে আনতে পারব না, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট।'

'কেন? কি বলল?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ফগ।

'আপনার সম্পর্কে একটা মন্তব্য করল। প্রাণ গেলেও আমি সেকথা বলতে পারব না আপনাকে।'

'বলো!' গর্জে উঠল ফগ।

'আরে বলেই ফেলো না, কি হবে?' চাচার সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছে শোনার জন্যে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে যেন ববের।

'আঁ!' কোনমতে বলল জব। মন্তব্যটা সেও শুনতে চায়। আইসক্রীম দিয়ে অনেক কষ্টে ভিজিয়ে ভিজিয়ে টফির আঠা ছাড়িয়ে ছিল। তারপর ভুল করে দুটো টফি একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়েছে। আবার মুখ আটকে গেছে তার।

'অ্যাই, চুপ!' ধমকে উঠল তার চাচা। 'ছাগলের মত আঁ আঁ করছিস কেন? কথা বলতে পারিস না? মুখে কি? ঝামেলা!'

আতঙ্কিত হয়ে মুখ আরও আটকে গেল জবের, বলল, 'আঁ!' সরে গেল চাচার সামনে থেকে।

'ও টফি খাচ্ছে, চাচা,' বব বলল, 'এমন আঠার আঠা, মুখে দিলে আর নিস্তার নেই, সঙ্গে সঙ্গে আটকে যায়।'

'কাল তো সারাদিনই মুখ খুলতে পারেনি,' পাব বলল। 'কিচ্ছু খেতে পারেনি সেজন্যে।'

'ওর মত গাধার এই শাস্তিই হওয়া উচিত।'

ফিক করে হেসে ফেলল ফারিহা। সেটা লক্ষ করে যদি আবার সন্দেহ করে বসে ফগ, সেজন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'টংগা বেংগা ঘোগ! ফগং টকং রোগ!'

'ওই যে ঝামেলা, টংবং করে আবার কি শুরু করল! ওহ্, গড, কি ভয়াবহ ভাষা!' কিশোরের দিকে ফিরল ফগ, 'দেখো, এবার তোমাকে বলতেই হবে ও কি বলল!'

'দেখুন, এটা আরও খারাপ কথা, আমি বলতে পারব না। দয়া করে আমাকে চাপাচাপি করবেন না।'

আবার হেসে ফেলল ফারিহা।

ওর দিকে তাকিয়ে রেগে গেল ফগ। ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন ওর গোল গোল চোখ। টকটকে লাল হয়ে গেছে মুখ। চিৎকার করে উঠল, 'বলতেই হবে তোমাকে!'

আরেক দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'না শুনে যখন ছাড়বেনই না, বলি, ও বলছে লোকটার মুখটা অমন কোলাব্যাঙের মত কেন?'

সবাই হেসে উঠল, জব বাদে। হাসার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না, কেবল আঁ আঁ বেরোল মুখ দিয়ে।

ভয়ানক রাগে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইল ফগ। তারপর একটানে ববের হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিল। মনে হলো ওটা দিয়েই ফারিহাকে বাড়ি মারবে। বাধা দিল বব, 'চাচা, খবদার, ওকাজ করো না! ও একজন রাজকুমারী। ওর বাবা যদি আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে নালিশ করেন, ভয়ানক বিপদে পড়বে তুমি।'

মহাউত্তেজনা চলছে বুঝতে পেরে টিটুও উত্তেজিত হয়ে উঠল। মজা থেকে বঞ্চিত হতে চাইল না সে। আবার গিয়ে ফগের পায়ের কাছে ঘুরে ঘুরে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

লাথি মারল ফগ। লাগাতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'কুত্তাটার নামে নালিশ করব আমি! ওকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব!'

কিন্তু বিন্দুমাত্র জেলের ভয় করল না টিটু, অস্থির করে তুলল ফগকে।

ফগ বুঝল, এখানে থাকলে আরও অপদস্থ হতে হবে তাকে। লাফ দিয়ে সাইকেলে চেপে বসল। সবাইকেই দেখে নেবে এমন একটা ভঙ্গি দিয়ে, টিটুকে শেষবারের মত একটা ব্যর্থ লাথি হাঁকিয়ে দ্রুত সরে পড়ল ওখান থেকে।

গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টা শোনা গেল। ঘড়ি দেখল বব। 'বাপরে, বারোটা বাজে! আর তো থাকতে পারছি না আমরা। ক্যাম্পে যেতে হবে। আমাদের পাশে যারা বাস করে, ক্যারাভানে, তাদের সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বলে দিয়েছে, ঠিক সাড়ে বারোটায় ফিরতে না পারলে খাবার পাব না।'

কিশোরের হাতে ছাতাটা তুলে দিল সে। খুব ভদ্রতার সঙ্গে মাথা নুইয়ে ফারিহাকে অভিবাদন করে বলল, 'আরও থাকতে পারলে খুশি হতাম। খুব আনন্দে কেটেছে সময়টা। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে বলব, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। চলি। আবার দেখা হবে। গুড-বাই।'

দুই ভাইকে নিয়ে তাড়াহুড়া করে রওনা হয়ে গেল বব।

হাসতে হাসতে রবিন বলল, 'উফ্, বাঁচা গেল! আর কিছুক্ষণ কথা বলতে না পারলে দম ফেটে মরে যেতাম!'

ফারিহা বলল, 'তবে যাই বলো, সময়টা কেটেছে দারুণ! কল্পনাই করিনি এতটা মজা হবে!'

আরও একটা ব্যাপার কল্পনা করতে পারল না ওরা এই মুহূর্তে, কি ভয়ানক চমক অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

চার

দুদিন পর সকালে নাস্তার টেবিলে রাশেদ পাশাকে চা ঢেলে দিচ্ছেন মেরিচাচী। টেবিলে কয়েকটা পত্রিকা পড়ে আছে, গ্রীনহিলসের স্থানীয় পত্রিকাটা টেনে নিল কিশোর। হেডলাইনটার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। কালো বড় বড় অক্ষরগুলো যেন জুলজুল করে চেয়ে আছে ওর দিকে:

প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া নিরুদ্দেশ
রাতের বেলা ক্যাম্প থেকে হারিয়ে গেছে
ভিনদেশী রাজকুমার

নিজেদের বাড়িতে নাস্তার টেবিলে বসে প্রায় একই সময়ে খবরটা রবিনেরও চোখে পড়ল।

খবরের কাগজে বিশেষ আগ্রহ নেই মুসার। কেবল খেলার পাতাটা দেখে

নাস্তা খাওয়ার পর আর কোন কাজ না থাকায় পত্রিকাটা টেনে নিল সে। হেডলাইনের ওপর চোখ পড়ল। অন্য দুজনের মত সেও এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। তাড়াতাড়ি ফারিহাকে ডেকে দেখাল খবরটা।

প্রিন্সের নিরুদ্দেশের খবরে আরও একজন খুব আগ্রহী হলো। ফগর‍্যাম্পারকট। সকালের কাগজে সেও দেখেছে খবরটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই হেডকোয়ার্টার থেকে মেসেজ এল তার কাছে, প্রিন্সের ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে।

ভাবতে লাগল ফগ–রাজকুমারের বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ওর সঙ্গে কথা বললে কোন সূত্র মিলতে পারে। তবে সবার আগে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

হেডকোয়ার্টারে ফোন করল সে।

ডিউটি অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'চীফ ব্যস্ত। তাঁকে তোমার কি দরকার, ফগর‍্যাম্পারকট?'

'ঝামেলা! প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কিছু বলব।'

'ধরে থাকো।'

কয়েক সেকেন্ড পর ক্যাপ্টেনের ভারি গলা ভেসে এল, 'কি ব্যাপার, ফগর‍্যাম্পারকট? আমি খুব ব্যস্ত।'

চীফের গলা শুনলেই কি জানি কি হয়ে যায় ফগের, ঘাবড়ে যায়, কথা আটকে যায়। 'ঝামেলা, স্যার, প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার কথা বলছিলাম···ওর বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, প্রিন্সেস টেটাংকাউয়া না কি যেন নাম। এই নিরুদ্দেশের ব্যাপারে সে হয়তো কিছু জানতে পারে।'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর ভেসে এল ক্যাপ্টেনের বিস্মিত স্বর, 'বোন? এই প্রথম শুনলাম।'

ক্যাপ্টেনকে বিস্মিত করতে পেরে গর্বে পেট ফুলে উঠল ফগের। 'হ্যাঁ, স্যার, দুদিন আগে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে। সঙ্গে তার দুই ভাইও ছিল, একজন খালাত, আরেকজন মামাত।'

আবার এক মুহূর্ত নীরবতা। 'ফগর‍্যাম্পারকট, সত্যি তোমার দেখা হয়েছে প্রিন্সেসের সঙ্গে?'

ফগের মুখে হাসি ফুটল। মনে হতে লাগল, এইবার আর তার নিশ্চিত প্রমোশন ঠেকায় কে। ওই বিটলে ছেলেমেয়েগুলোও শত্রুতা করে আর কিছু করতে পারবে না। ক্যাপ্টেনের কাছে তার কদর বেড়ে যাবে। বলল, 'নিশ্চয় হয়েছে, স্যার, আপনার সঙ্গে কি মিছে কথা বলব। আপনি কি স্যার আমাকে প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার বোনের ব্যাপারে কিছু তথ্য জোগাড় করে দিতে পারেন?'

'দেখছি। তুমি ধরে রাখো। অবাক কথা শোনালে, ফগ। এই প্রিন্সেস আর তার দুই খালাত-মামাত ভাইয়ের ব্যাপারে হেডকোয়ার্টারে কোন রিপোর্ট এল না কেন?'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ফগ। এই প্রথমবার নিজেকে

বেশ কেউকেটা মনে হতে লাগল। এমন এক খবর শুনিয়েছে, ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে পর্যন্ত অবাক করে ছেড়েছে। হঠাৎ কিশোর পাশার কথা মনে পড়তে নিজের অজান্তে চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল তার। ক্যাপ্টেন যখন শুনবেন কিশোর পাশার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল প্রিন্সেস, ওই মোটকা ছেলেটার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তিনি, গুরুত্ব কমে যাবে ফগের। আপাতত কিশোরের কথাটা ক্যাপ্টেনের কাছে গোপন রাখবে কিনা ভাবতে লাগল সে।

ভাবনায় এতই ডুবে গিয়েছিল ফগ, ইন্সপেক্টরের কথা যেন কানে বোম ফাটাল, 'ফগ, আছো?'

ভীষণ চমকে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফগ, 'ঝামেলা! ইয়েস, স্যার!'

'হ্যাঁ, শোনো, প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার বোনের কথা এখানে কেউ জানে না, তার দুই ভাইয়ের ব্যাপারেও কেউ কিছু বলতে পারল না। তোমার সাথে যেহেতু দেখাটা হয়েই গেছে, তুমিই খোঁজখবর নাও। তা কিভাবে দেখা হলো?'

'আমার ভাতিজা উইলিয়াম ববর‍্যাম্পারকটের কথা মনে আছে আপনার, স্যার? স্কুল ক্যাম্পে সেও তাঁবু ফেলেছে। ও ছিল প্রিন্সেসের সঙ্গে, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে,' কায়দা করে কিশোরের কথাটা এড়িয়ে গেল ফগ, ওকে কোন রকম কৃতিত্বই দিতে চায় না।

'বব!' ছেলেটার কথা খুব ভাল করেই মনে আছে ক্যাপ্টেনের। কিন্তু বাকাবুয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে কিভাবে মিশল বোকা ছেলেটা? ফগ সত্যি প্রিন্সেসকে দেখেছে, না অন্য কিছু? জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিন্সেসের সঙ্গে ববের খাতির হলো কি করে?'

'তা জানি না, স্যার। ছাতা বহন করার দায়িত্ব দিয়েছে ওকে রাজকুমারী, ওদের দেশের স্টেট আমব্রেলা।'

আবার দীর্ঘ নীরবতার পর ইন্সপেক্টর বললেন, 'শোনো, ফগ, পুরো ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে ঠেকছে আমার কাছে। এক কাজ করো, তুমি ওই প্রিন্সেসের খোঁজখবর নাও। তার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করো, এদেশে কেন এসেছে, কার কাছে এসেছে। যাও, এখুনি গিয়ে দেখা করো।'

'কোথায় উঠেছে ও?'

থমকে গেল ফগ। 'ঝামেলা! তাতো জিজ্ঞেস করিনি, স্যার! অসুবিধে নেই, ববকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারব।'

'করোগে তাহলে।'

'এখুনি যাচ্ছি, স্যার। থ্যাংক ইউ।' লাইন কেটে দিল ফগ। ইউনিফর্ম পরাই আছে। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ববের কাছে জিজ্ঞেস করবে বললেও ওখানে গেল না ফগ। প্রথম রওনা হলো কিশোরদের বাড়িতে। ও জানে, প্রিন্সেসের খোঁজ কোথাও পাওয়া গেলে কিশোরের কাছেই পাওয়া যাবে। ওদের বাড়িতে পৌঁছে সদর দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে দিল পপি।

গম্ভীর হয়ে ভারিক্কি চালে জিজ্ঞেস করল ফগ, 'কিশোর পাশা আছে?'

'নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'বলতে পারব না।'

'ঝামেলা!'

ফগের গলা শুনে এসে পপির পেছনে উঁকি দিলেন মেরিচাচী, ভাবলেন কোন গোলমালে জড়িয়েছে কিশোর। 'ও, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনি। কিশোরকে কি দরকার?'

'তাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিল, ম্যাডাম, প্রিন্সেস টেং-টেং-টেটাংকাউয়ার ব্যাপারে। তা আপনি কি বলতে পারেন আমাকে, রাজকুমারী কোথায় উঠেছে?'

বিস্ময় ফুটল মেরিচাচীর চোখে। 'টেটাংকাউয়া? কই, তার নামও তো শুনিনি কখনও।'

'নিরুদ্দেশ হয়েছে যে প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া, তার বোন।'

এটাও কোন গুরুত্ব বহন করে না মেরিচাচীর কাছে। সকাল বেলা পত্রিকায় হেডলাইন দেখেছেন বটে, তবে খবরটা কোন আগ্রহ জাগায়নি। তাঁর মনে হয়েছে, প্রিন্স হোক আর যাই হোক, অন্য সব কিশোরদের মতই সেও একজন কিশোর, রাজকীয় আদব-কায়দার ধাক্কা সামলাতে না পেরে কিছুদিন শান্তিতে থাকার জন্যে পালিয়েছে। ফিরে আসবে কয়েকদিন পরেই।

'দুঃখিত, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আমি কোন সাহায্য করতে পারছি না। কিশোরও পারবে বলে মনে হয় না। মাত্র দুদিন আগে এসেছি আমরা। এত তাড়াতাড়ি প্রিন্স আর তার বোনের সঙ্গে ওর ভাব হওয়ার কথা নয়। হলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত।'

'আপনি শিওর, প্রিন্সেসকে চায়ের দাওয়াত বা ওরকম কিছুতে আমন্ত্রণ জানাননি? হয়তো ভুলে গেছেন।'

পুলিশম্যানটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভাবলেন মেরিচাচী। রেগে গেলেন। 'দুদিন আগে একজন রাজকুমারীকে দাওয়াত করে খাওয়ালাম, আর এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছি? এটা কোন কথা হলো? আপনি এখন যেতে পারেন, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। গুড মর্নিং।'

ফগের মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করল ফগ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দরজাটার দিকে। আজকাল পুলিশকে দুচোখে দেখতে পারে না লোকে। সহায়তা করা দূরে থাক, সুযোগ পেলেই দুর্ব্যবহার করে বসে। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিঁড়ি থেকে নেমে এল সে। খিঁচড়ে গেল মেজাজ। হতচ্ছাড়া ওই মোটকা ছেলেটাকে এখন খুঁজে বের করা, সে আরেক ঝামেলা। কোথায় আছে এখন ও? ওর বিটলে বন্ধুগুলোর সঙ্গে?

রবিনদের বাড়িতে চলল ফগ।

ওদের কাজের মেয়ে বলল, 'রবিন নেই। বোধহয় কিশোরদের বাড়ি গেছে। ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন।'

'গিয়েছিলাম, নেই ওখানে।'

'তাহলে মুসাদের বাড়িতে গেছে।' দরজা লাগিয়ে দিল মেয়েটা।

মনে মনে রেগে গেল ফগ। ফকির পেয়েছে নাকি তাকে? মুখের ওপর এভাবে দরজা লাগিয়ে দেয়। মুসাদের বাড়ি রওনা হলো সে। ওখানে না থাকলে আজ আর কিশোরকে খুঁজে পাওয়ার আশা কম।

সকাল বেলাতেই রোদ বেশ কড়া, তবে যতটা না গরম তারচেয়ে বেশি গরম লাগছে ফগের। মুখচোখ লাল হয়ে গেল তার। ঘামতে ঘামতে এসে নামল মুসাদের বাড়ির গেটে। ভয়ে ভয়ে তাকাল এদিক ওদিক, বলা যায় না কোনখানে ঘাপটি মেরে আছে কিশোরের শয়তান কুকুরটা, ওর উপস্থিতি টের পেলেই ঘাউ ঘাউ করে ছুটে আসবে কামড়ানোর জন্যে।

তবে এল না টিটু। ফগের সাড়া পেয়ে মৃদু খউ করে উঠেছিল একবার, ওকে চুপ করে থাকতে বলেছে কিশোর। বাগানের এককোণে ছাউনির ওধারে বসে আছে ওরা। ফগকে ঢুকতে দেখেছে।

পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে উঁকি দিয়ে ভালমত দেখে এল ফারিহা। বলল, 'ঘেমে লাল। কিশোর, প্রিন্সেস টেংরিকাউয়ার খোঁজ নিতে আসেনি তো ও?'

'অসম্ভব না। প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া নিখোঁজ হয়েছে তো, ভাবছে ওর বোনের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নেবে। চলো, কেটে পড়ি। প্রিন্সেসকে খুঁজে মরুক।'

পিছু দেয়াল ডিঙিয়ে, বাগান ঘুরে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। তারপর দে ছুট।

ফগ ওদিকে কুকুরটার সাড়া না পেয়ে আশ্বস্ত হলো। এগিয়ে এসে থামল সদর দরজার সামনে। জোরে টিপে ধরল বেলপুশ।

খুলে দিলেন মিসেস আমান।

তাঁকে সালাম জানিয়ে কিশোর আছে কিনা জিজ্ঞেস করল ফগ।

'সবগুলোই আছে,' মিসেস আমান বললেন। 'দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।' গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'মুসা! এই মুসা, শুনে যা!'

সাড়া নেই।

'গেল কোথায়? এক মিনিট আগেও তো চেঁচাতে শুনলাম।'

ফগকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে ছাউনির কাছ থেকে ঘুরে এলেন মিসেস আমান। 'একটাও নেই। বোধহয় কিশোরদের বাড়িতে চলে গেছে।'

'কোনদিক দিয়ে গেল? দেখলাম না তো!'

'কি করে দেখবেন। স্বয়ং ইবিলসও ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। কোন দিক দিয়ে আসে কোন দিকে দিয়ে যায়···সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, কোন সাহায্য করতে পারলাম না আপনাকে। আমি যাই, জরুরী কাজ আছে।'

দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মিসেস আমান।

'ঝামেলা!' বন্ধ পাল্লাটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল ফগ, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাবল, চাকিরটা ছেড়েই দেবে নাকি! পুলিশের চাকরিতে আর আগের মত ইজ্জত নেই।

পাঁচ

সে সকালে প্রিন্সের নিরুদ্দেশের খবর শুনে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠল আরও একজন। ফগের ভাতিজা বব। পত্রিকা পড়ে খবরটা জানেনি সে, তার জানার ধরনটা একটু বিচিত্র। প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই প্রিন্সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে, বলার জন্যে যে তার বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু একটিবারের জন্যেও প্রিন্সের দেখা পেল না সে।

হাল ছাড়ল না বব। সেদিন সকালে মরিয়া হয়ে পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে প্রিন্সের ক্যাম্পের সীমানায় ঢুকে পড়ল সে।

মাথা তুলতেই চোখে পড়ল দুজন পুলিশ। দুদিক থেকে এসে চেপে ধরল তাকে ওরা।

ঘাড় চেপে ধরল একজন, 'এখানে কি?'

'আহ্, ছাড়ুন ছাড়ুন, লাগছে তো!' ককিয়ে উঠল বব। 'প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম!'

'প্রিন্স নেই। গায়েব।'

বুঝতে পারল না বব। অবাক হয়ে বলল, 'গায়েব! কি করে হলো? কখন?'

'রাতের বেলা,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকিয়ে আছে পুলিশম্যান। 'কিছু শুনেছ? পাশের ওই তাঁবুটা তোমার, না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কিছু তো শুনিনি। ওর বোন কিছু জানে?'

'বোন! বোন এল কোত্থেকে আবার?'

'ও, জানেন না। বোন একটা আছে। কয়েক দিন আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

'তাই?' ব্যঙ্গ করে হাসল লোকটা। 'আবার বলে বসো না রানীমাতার সঙ্গে চা খেয়েছ, ডিনার খেয়েছ স্বয়ং রাজার সঙ্গে।'

'না, তা বলব না। তবে রাজকুমারীর সঙ্গে যে আইসক্রীম খেয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'গুল মারার আর জায়গা পাও না!' বলে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ববকে পাতাবাহারের বেড়ার দিকে ঠেলে দিল লোকটা। 'খবরদার, আবার যদি এদিকে আসো মজা টের পাবে। ভাগো!'

বেড়ার ফোকর গলে আবার এপাশে চলে এল বব। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই মনে এল কিশোরের কথা। প্রিন্সের নিরুদ্দেশের খবরটা ওকে জানানো দরকার। একটিবারের জন্যেও ওর মাথায় এল না যে, খবরটা পত্রিকায় ছাপা হয়ে যেতে পারে।

তাঁবুর বাইরে এসে বসে পড়ল বব। পুলিশ তার কথা বিশ্বাস না করে তাড়িয়ে দেয়ায় অপমান বোধ করছে। জব বা পাবকে জানাল না কিছু। অবশ্য কথা বলার মত অবস্থাও নেই ওদের। অকারণেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে পাবের, মুখ গোমড়া করে বসে আছে। জবের মুখ টফিতে বন্ধ।

কিশোরের কাছে যাওয়ার জন্যে পাশের ক্যারাভান থেকে একটা সাইকেল ধার করতে চলল বব। ওখানে এসে কাউকে দেখল না। চোখে পড়ল বেড়ার গায়ে একটা সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখা আছে। অনেক চেষ্টা করে অবশেষে সাইকেলের মালিককে খুঁজে বের করল সে। ওর চেয়ে দু'এক বছরের বড় একটা ছেলে।

বব বলল, 'ভাই, তোমার সাইকেলটা আমাকে দেবে কিছুক্ষণের জন্যে?'

'আধ ডলার লাগবে,' মুখ ভারি করে রেখে বলল ছেলেটা।

'এত্তো! আরেকটু কম নিলে হয় না?'

'না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল ছেলেটা।

অগত্যা আধডলার খসাতেই হলো ববকে। মনে মনে ছেলেটাকে দশটা গাল দিয়ে ওর সাইকেলটায় চেপে বসল। মোড়ের কাছে আসতেই দেখল সাইকেল চালিয়ে আসছে তার চাচা। এই সাতসকালে চাচার সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি নয় মোটেও বব, তাড়াতাড়ি সাইকেল ঘুরিয়ে দিল আরেকদিকে।

ফগ দেখল সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা মোটা ছেলে মোড়ের আড়ালে চলে যাচ্ছে। কেমন যেন একটা চোর চোর ভাব। প্রথমেই মনে হলো তার, নিশ্চয় কিশোর, ছদ্মবেশে আছে, তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে।

রেগে গেল ফগ। আজ ওর শয়তানি বের করব আমি–ভেবে, জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে সেদিকে ছুটল।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল বব। দেখল ওর চাচা ধাওয়া করে আসছে। আতঙ্কিত হয়ে গায়ের জোরে প্যাডাল ঘোরাতে লাগল সে।

'অ্যাই, অ্যাই!' ডাকল ফগ।

চাচার কর্কশ কণ্ঠ শুনে আরও ঘাবড়ে গেল বব। বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে ঘুরিয়ে দিল সাইকেলের হ্যাণ্ডেল। যেদিকে যায় যাক, সোজা রাস্তায় অন্তত আর যাবে না।

রাস্তা থেকে নেমে সরু একটা পায়েচলা পথ দেখে সেটাতে উঠে এল সে। সামনে পড়ল একটা গোলাবাড়ি। গেট খোলা। সোজা তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভড়কে গিয়ে কঁক কঁক চিৎকার করে এদিক ওদিক ছুটে পালাল কয়েকটা মুরগী।

একটা গোলাঘরের খোলা দরজা চোখে পড়ল ববের। আর কোন উপায় না দেখে তার মধ্যেই ঢুকে পড়ল। ভেতরে অন্ধকার। খড়ের গাদায় এসে ঠোকর খেল সাইকেলের চাকা। কাত হয়ে পড়ে গেল সে। ওঠার চেষ্টা করল না। গাদায়

ঠেস দিয়ে বসে বসে হাঁপাতে লাগল।

চাচার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি রব। গোলাঘরে ঢুকে পড়ল ফগ। তবে খড়ের গাদায় ঠোকর খেল না তার সাইকেল। লাফ দিয়ে নামল। গর্জে উঠল, 'এবার মাথা থেকে পরচুলাটা খোলো। আজ আর ফাঁকিতে পড়ছি না আমি। আর হ্যাঁ, প্রিন্সেস টেটাংকাউয়ার ব্যাপারেও যা যা জানো সব খুলে বলো।'

বোকা হয়ে চাচার দিকে তাকিয়ে রইল বব। কি বলছে? সে পরচুলা পরবে কেন? ঘরটা তো এত অন্ধকার নয় যে তার চাচা ওকে চিনতে পারছে না!

তবে প্রথমে আলো থেকে অন্ধকারে ঢুকে পড়ায় সত্যিই চিনতে পারেনি ফগ, তারপর আলো চোখে সয়ে আসার পর ববকে দেখে ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো তার কোলাব্যাঙের মত গোল গোল চোখ।

'ঝামেলা! তুই এখানে কি করছিস?' গর্জে উঠল ফগ।

'আমি কি ইচ্ছে করে এসেছি নাকি; তুমিই তো তাড়া করে আনলে।'

ভাতিজার দিকে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠল ফগ, 'তুই পালালি কেন?'

'আমি পালাইনি, তুমি তাড়া করেছ।'

'তুই পালাচ্ছিলি, সেজন্যে তাড়া করেছি।'

'তুমি আমাকে তাড়া করেছ, না পালিয়ে কি করব।'

'তুই না পালালে কি তাড়া করতাম? ওঠ। হাঁদার মত বসে থাকা লাগবে না আর।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বব। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে চাচার দিকে। এরপর কি করবে ফগ, কে জানে!

'ওই মোটকা ছেলেটাকে দেখেছিস আজ?' কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল ফগ।

'না।'

'প্রিন্সেসকে দেখেছিস?'

'না।'

'তাহলে কি দেখেছিস?'

'কিছুই না।' আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করে ফেলল বব, 'প্রিন্সেসের পিছু নিয়েছ নাকি তুমি, চাচা?'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল ফগ, 'ও কোথায় থাকে জানিস?'

'কিশোরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছ না কেন? রাজকুমারী ওর বন্ধু, আমার নয়। ওরই জানা থাকার কথা...'

'অনেক জায়গায় খুঁজেছি। নেই। তুই কিছু জানিস?'

'কি করে জানব, আমার সঙ্গে তো দেখাই হয়নি,' হেসে ফেলল বব।

'হাসছিস কেন?'

মুখ আগের মত করে ফেলল বব।

'হাসলি কেন, জলদি বল!' গর্জে উঠল ফগ।

জবাব দিল না বব।

'বললি না?'

'কি বলব?'

'হাসলি কেন?'

'এমনি?'

'ঝামেলা! এমনি কেউ হাসে?'

চুপ করে রইল বব।

'দেখ, বব, যদি মনে করে থাকিস এবারও কিশোর পাশার সঙ্গে যোগ দিয়ে কিছু একটা করবি, আমাকে বোকা বানাবি, তাহলে ভুল করছিস। কোনমতে যদি খালি জানতে পারি, ওই মোটকা ছেলেটার সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে, ঘাড় ধরে বের করে দেব গ্রীনহিলস থেকে। বুঝলি? হ্যাঁ, এবার বল, হেসেছিস কেন?'

'তুমি কিশোরকে খুঁজে পাওনি বলে।'

'গাধা আর কাকে বলে! কিশোরকে পাইনি, তাতে হাসার কি হলো?'

'ইচ্ছে করেই লুকিয়েছে ও। ওকে খুঁজে মরছ তুমি, এটা ভেবে নিশ্চয় খুব মজা পাচ্ছে ও। হাসাহাসি করছে সবাই মিলে।'

'আর তুইও সেজন্যে হাসছিস! নিজের চাচাকে নিয়ে হাসি! দেখাব মজা! আগে ওকে খুঁজে বের করি, তারপর তোর ব্যবস্থা আমি করব। ঝামেলা!' বলে লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটা গাট্টাও খেতে হয়নি বলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বব। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেও সাইকেলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল গোলাঘর থেকে। রওনা হলো কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে।

তার মনে হলো, চাচা যখন খুঁজে পায়নি, নিশ্চয় বাড়িতে নেই কিশোর। ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট না করে আগে মুসাদের বাড়িতে যাওয়া যাক।

ছাউনিতে ফিরে এসেছে ওরা, ববকে দেখে পালাল না কেউ। উত্তেজিত হয়ে তার অ্যাডভেঞ্চারের কথা সবিস্তারে জানাল বব। ওরা প্রিন্সের নিরুদ্দেশের খবরটা আগে থেকেই জানে দেখে হতাশ হলো খুব।

খানিকক্ষণ গুম মেরে থেকে জিজ্ঞেস করল বব, 'প্রিন্সেস কোথায়, কিশোর?'

ববকে আর বোকা বানিয়ে লাভ নেই, অনেক মজা করা হয়েছে, ভেবে সত্যি কথাটাই বলল কিশোর, 'প্রিন্সেস টেংরিকাউয়া বলে কেউ নেই, বব। ফারিহাকে প্রিন্সেস আর মুসা ও রবিনকে তার ভাই সাজিয়ে আমরা তোমার সঙ্গে মজা করেছিলাম।'

উঠে এসে ববের নাকে নাক ঘষে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'হারেং হারেং! হুক্কা-হুয়া!'

একলাফে পিছিয়ে গেল বব। হাঁ করে কিছুক্ষণ এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। আচমকা হেসে উঠল হো হো করে।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। তার ভয় হলো, প্রচণ্ড মানসিক আঘাত সইতে না পেরে পাগল হয়ে গেল না তো বব! জিজ্ঞেস

করল, 'হাসছ কেন এমন করে?'

'হাসব না,' হাসতে হাসতে বলল বব, 'চাচাকে কি বোকাটাই না বানিয়েছ তোমরা! হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

নিজে যে বোকা বনেছে সেটা কিছু না, চাচার কথা নিয়ে হাসছে। তার হাসিটা সংক্রামিত হলো সবার মাঝে। কিছুই না বুঝে টিটুও খুফ খুফ শুরু করে দিল।

কিশোর বলল, 'আমার ধারণা, ক্যাপ্টেনকে প্রিন্সেসের কথা সব বলেছে তোমার চাচা। আমরা যে রসিকতা করেছি, এটা তাঁকে আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া দরকার। নইলে প্রিন্সকে খুঁজতে গিয়ে বিপথে পরিচালিত হতে পারে পুলিশ বাহিনী। সেটা ঠিক হবে না।'

ছয়

ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করল কিশোর। সব কথা খুলে বলল। শুনে রাগ করলেন তিনি, বললেন, 'কাজটা ঠিক করনি তোমরা। পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে। ফগের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে নিশ্চয় এতক্ষণে একজন ভুয়া প্রিন্সেসকে খুঁজতে গিয়ে।'

'কিন্তু দোষটা আমাদের নয়, স্যার,' কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর, 'পুরো ব্যাপারটাই কাকতালীয়। আমরা মজা করার জন্যে ছদ্মবেশ নিয়েছি, বেআইনী কিছু করিনি। ফগর‍্যাম্প্যারকট ধরতে পারেনি, সেটা তার দোষ, আমাদের নয়। তবু ঘটনাটার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা।'

'যাই হোক, যা ঘটে গেছে তো গেছে। পারলে ফগকে সরি বলে তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করো। দেখো, প্রিন্সকে খুঁজে বের করার কাজে তাকে কোন সাহায্য করতে পারো কিনা।'

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে ছাউনিতে ঢুকল কিশোর। সব কথা জানাল বন্ধুদের। এই সময় গেটে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ হলো। উঁকি দিয়ে দেখে এসে মুসা বলল, 'বব, তোমার চাচা।'

কুঁকড়ে গেল বব, 'নিশ্চয় কিশোরকে খুঁজতে এসেছে। খবরদার, আমার কথা বোলো না! আমি আর তার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

বেরিয়ে গেল কিশোর। ক্যাপ্টেনের কথামত পুরো ঘটনাটা জানিয়ে 'সরি'ও বলল। কিন্তু একটু নরমও হলো না ফগ। উল্টো আরও রেগে গিয়ে যা তা বলতে লাগল কিশোরকে। নিজের বোকামি সে কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না।

ফগ চলে গেলে ছাউনিতে ফিরে এল কিশোর।

'চাচা কি বলল?' জানতে চাইল বব।

সব বলল কিশোর।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে আচমকা পকেট থেকে একটা নোটবুক টেনে বের করল বব, 'চাচাকে নিয়ে একটা নতুন কবিতা লিখেছি। দাঁড়াও, শোনাচ্ছি তোমাদের।'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'তোমার কবিতা লেখার শখটা আর গেল না। থাক শুনতে হবে না। গুরুজনদের নিয়ে খারাপ কথা শোনার রুচি হচ্ছে না আর।'

হতাশ হয়ে নোটবুকটা আবার পকেটে ভরে রাখল বব।

ফারিহা বলল, 'কিশোর, প্রিন্স ঘুটাংকাউয়াকে কি খুঁজতে বেরোব আমরা?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে একবার চিমটি কাটল কিশোর, 'ক্যাপ্টেন তো বললেন, ফগকে তদন্তে সাহায্য করতে। তারমানে প্রকারান্তরে প্রিন্সকে খোঁজার কথাই বলেছেন তিনি।'

'তারমানে আরেকটা রহস্য এসে হাজির হয়েছে আমাদের দোরগোড়ায়!' বলল রবিন।

'রহস্য কিনা জানি না। এমনও হতে পারে ক্যাম্পে থাকতে ভাল না লাগায় কাউকে না জানিয়ে কোথাও চলে গেছে প্রিন্স, কদিন পরেই ফিরে আসবে।'

'হ্যাঁ, সেটা হতে পারে,' একমত হলো রবিন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আজকে থেকেই তদন্ত শুরু করতে চাও?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

দুপুরে খাওয়ার জন্যে বাড়ি ফিরল কিশোর। খেতে খেতে পত্রিকাগুলো ভাল করে ঘেঁটে দেখল প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার নিখোঁজের ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা।

রাতে ক্যাম্পের একটা গানের পার্টিতে যোগ দিয়েছিল প্রিন্স। নাচাকুদা করে, প্রচুর কোকাকোলা আর কাবাব খেয়ে আরও তিনটে ছেলের সঙ্গে তাঁবুতে রওনা হয়েছিল। একই তাঁবুতে থাকে ওরা।

প্রিন্সের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে ছেলেগুলোও কিছু বলতে পারেনি। এত বেশি খেয়েছিল আর নাচানাচি করে এত বেশি ক্লান্ত হয়েছিল যে তাঁবুতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখে প্রিন্স নেই।

খাওয়া সেরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। চলে এল মুসাদের বাড়িতে। রবিন এল কিছুক্ষণ পর। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ওরা ডাভহিলের উদ্দেশে। টিটুও চলল ওদের সঙ্গে, কিশোরের সাইকেলের বাস্কেটে চেপে।

পাহাড়ের কোলে বিশাল এক মাঠের মধ্যে ক্যাম্প করা হয়েছে। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। প্রচুর গাছপালা আছে। তাঁবুতে গিজগিজ করছে এলাকাটা। ধোঁয়া উড়ছে একজায়গায়, আগুন জ্বেলে রান্না করা হচ্ছে ওখানে।

একটা বেড়ার গায়ে সাইকেলগুলো ঠেস দিয়ে রাখল গোয়েন্দারা।

একটা ছেলেকে আসতে দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল মুসা, জিজ্ঞেস করল,

'পলমল হাউসের তাঁবু কোনদিকে?'

হাত তুলে দেখিয়ে দিল ছেলেটা, 'নদীর ধারে ওই যে শেষ তাঁবুগুলো দেখছ, ওগুলো।'

পলমল হাউস একটা স্কুলের নাম। মুসার এক খালাত ভাই ওতে পড়ে। নাম বকর।

বন্ধুদের নিয়ে সেদিকে এগোল মুসা। তাঁবুগুলোর কাছাকাছি এসে একটা ছেলেকে বকরের কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে সে, এমন সময় পেছন থেকে বলে উঠল বকর নিজেই, 'আরি, মুসা, তুই!'

ফিরে তাকাল সবাই। মুসার চেয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা, ওর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, ওরই মত হাসিখুশি একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।

হেসে এগিয়ে গেল মুসা, 'বকরভাই, তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম। এরা আমার বন্ধু।'

পরিচয় করিয়ে দিল মুসা।

কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বকর বলল, 'তুমিই তা হলে কিশোর পাশা। মুসার মুখে তোমার কথা এত শুনেছি, চেহারাটাই মুখস্থ হয়ে গেছে। পুলিশের সঙ্গে নাকি তোমার খুব খাতির।'

অস্বস্তি বোধ করল কিশোর। 'তা কিছুটা আছে। মাঝে মাঝে পুলিশকে সাহায্য করি তো।'

মুসার দিকে তাকাল বকর, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এলি কি এমনি, না কোন কাজ আছে।'

'তেমন কিছু না। প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার নিরুদ্দেশের কথা পত্রিকায় পড়লাম তো,' জবাব দিল কিশোর, 'ইন্টারেস্টিং মনে হলো। একটু খোঁজখবর নিতে এলাম। মুসা বলল তুমি আছো এখানে, ভাবলাম, তোমাকেই জিজ্ঞেস করব।'

'ওই ছাগলটার খোঁজ নিয়ে আর কি হবে! ওর ফড়ফড়ানির জ্বালায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। সব কিছুতে নাক গলানো চাই। গেছে ভাল হয়েছে। তা এসো না, এসেছ যখন আমাদের তাঁবুটা দেখেই যাও।'

বড় একটা তাঁবুতে ওদেরকে নিয়ে এল বকর।

সরু, লম্বা একটা কাঠের টেবিল বসানো রয়েছে তাঁবুর মাঝখানে। তাতে নানা রকম খাবার সাজানো–জ্যাম স্যান্ডউইচ, পটেড মিট স্যান্ডউইচ, বনরুটি, ফালি করা ফ্রুট কেক, জগভর্তি লেমোনেড।

খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল মুসার, 'বাহ্, সুখেই আছো দেখি!'

'তোর তো খাবার দেখলেই জিভে জল। বসে পড়,' হেসে বলল বকর। 'এ হপ্তায় ক্যাটারিঙের ভার পড়েছে আমার ওপর–হেড বাবুর্চি হয়েছি। চায়ের এখনও দেরি আছে, তবু আগেভাগেই সাজিয়ে ফেললাম। তাড়াহুড়ো করার চেয়ে সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে কাজ সারা ভাল।'

লোভনীয় খাবার। কিন্তু বকরের আমন্ত্রণে সারা দিতে পারল না কেউ। এমনকি মুসাও দ্বিধা করতে লাগল। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ভরপেট খেয়েছে ওরা। শেষে বকর প্রস্তাব দিল, প্লেটে করে খাবার নিয়ে নদীর দিকে চলে যাবে। নদীর পারে বসে গল্প করবে। যখন খিদে পাবে তখন খাবে।

'তুমি না থাকলে যারা খেতে আসবে তাদের অসুবিধে হবে না?'

'না। ওরা যার যার খাবার তুলে নিয়ে খেয়ে নেবে।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো সবার। প্লেটভর্তি খাবার নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নদীর দিকে চলল।

'এটাই ভাল হলো,' বলল বকর, 'হই-হট্টগোল নেই। শান্তিতে বসে আরাম করে খেতে পারব। তারপর কিশোর, তোমার কথা কিছু বলো। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভাল লাগছে। তোমার সম্পর্কে যে কত কথা বলেছে মুসা। সেসব কথা আমি আবার আমার বন্ধুদের বলেছি।'

কিশোরের সঙ্গে বকবক করতে লাগল বকর।

নদীর তাজা বাতাসে পেট খালি হতে সময় লাগল না। তা ছাড়া সামনে লোভনীয় খাবার থাকায় যেন খিদেটা আরও আগেই পেয়ে গেল। খাওয়া শুরু করল ওরা। দেখতে দেখতে শেষ করে ফেলল।

মুসা বলল, 'এখানে শুধু শুধু বসে থাকতে আর ভাল্লাগছে না। চলো, প্রিন্সের তাঁবুটা দেখে আসি।'

বকর বলল, 'ওখানে আর দেখার কি আছে। আমার এখানেই ভাল লাগছে, কিশোরের সঙ্গে গল্প করতে।'

'আমার লাগছে না,' মুসা বলল। 'আমি বরং তাঁবু দেখতে যাই।'

রবিন বলল, 'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

কিশোর বলল, 'ঠিক আছে, যাও তোমরা, আমরা আছি এখানে।'

ফারিহারও বসে থাকতে ভাল লাগল না। টিটুকে নিয়ে ছুটাছুটি করে খেলা জুড়ে দিল।

মাঠের ভেতর দিয়ে এগোল রবিন আর মুসা। প্রচুর ছেলেমেয়ে ঘোরাফেরা করছে এদিক ওদিক। কেউ ওদের দিকে বিশেষ নজর দিল না।

প্রিন্সের তাঁবুর কাছে এসে দেখা গেল তিনটে ছেলে বাইরে বসে স্যান্ডউইচ চিবুচ্ছে। তিনজনই মুসার বয়েসী।

'অন্য তাঁবুগুলোর চেয়ে অনেক ভাল এটা,' রবিন বলল।

'হবেই। রাজকুমারের তাঁবু, পয়সা আছে, ভালটাই কিনেছে।'

কথাগুলো কানে যেতেই বলে উঠল একটা ছেলে, 'প্রিন্স না ছাই, যেমন নাম, তেমনি বিদঘুটে তার স্বভাব।'

এগিয়ে গেল মুসা, 'প্রিন্সকে দেখতে পারো না মনে হচ্ছে?'

'পারার মত জীব হলে তো পারবে,' মুখ ভেংচে বলল আরেকটা লাল-চুল ছেলে।

'আস্ত বজ্জাত,' সুর মেলাল তৃতীয় ছেলেটা। 'প্রিন্স হয়েছে তো মাথা কিনে নিয়েছে সবার। কুমারগিরি ফলাতে আসে সবার সঙ্গে, যেন আমরাও তার বাবার চাকর। যাকে দেখে তার সঙ্গেই দুর্ব্যবহার। ভাষাটা শুনলে আরও রাগ লাগে। খ্যাচাং ফ্যাচাং করে কি সব আবল-তাবল বকে, ওটা নাকি ওদের ভাষা, কিচ্ছু বোঝা যায় না। তবে ইংরেজিও জানে। কি করে শিখল, গড নোজ।'

'কোন স্কুলে পড়ে?'

'ইস্কুল-টিস্কুলে যায় না। বাড়িতে শিক্ষক রেখে পড়ে। প্রচুর টাকা খরচ করে লেখাপড়ার পেছনে। দামী দামী সব কাপড়-চোপড়। কিন্তু ধোয়াটোয়ার মধ্যে নেই, ভীষণ নোংরা। গোসল করার কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে। তেত্রিশ মাইল দূরে থাকতে চায় নদী থেকে। গায়ে পাঁঠার গন্ধ! ও নাকি আবার প্রিন্স!'

'অনেক বিদেশীই ওরকম, নোংরা,' বলল প্রথম ছেলেটা। 'আমাদের স্কুলে দুটো ছেলে আছে। একটা তো দাঁতও মাজতে চায় না। দশ হাত দূর থেকে মুখের গন্ধ পাওয়া যায়। আরেকটার মাথায় উকুন, সারাক্ষণই চুলকায়, তাও মাথা ধোবে না। কোন জঙ্গল থেকে যে উঠে আসে এগুলো!'

'প্রিন্সকে কি কিডন্যাপ করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কি মনে হয় তোমাদের?'

'করলে করুক, আমাদের কি,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল লাল-চুল ছেলেটা। 'বরং আর না ছাড়ুক, আমাদের ওপর উৎপাত বন্ধ হবে। নেহায়েত থাকার আর জায়গা পেলাম না, টিচারও থাকতে বলল, তাই, নইলে ওর তাঁবুতে কে থাকে। দেখোগে না, এত সুন্দর পিপিং ব্যাগটার কি করেছে। অবাক লাগে আমার, একজন প্রিন্স অমন স্বভাবের হয় কি করে! আচার-আচরণে মনে হয়েছে ফকিরের বাচ্চা!'

ব্যাগটা দেখার কৌতূহল হলো মুসার। রবিনকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। পেছন থেকে লাল-চুল ছেলেটা প্রিন্সের পিপিং ব্যাগ দেখিয়ে দিল।

এমন ব্যাগ আর দেখেনি মুসা। অনেক বড়। পুরোটায় ঝলমলে সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা। কিন্তু ময়লা করে ফেলেছে।

'ইচ্ছে করলে ঢুকেও দেখতে পারো,' ছেলেটা বলল। 'আমি একবার ঢুকেছি। এত আরাম, মনে হলো আমি যেন মাটিতে নেই, মেঘের ভেতর দিয়ে ভেসে চলেছি। বড়লোক হওয়ার অনেক সুবিধে।'

কেমন লাগে দেখার জন্যে ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়ল মুসা। দারুণ আরাম, ভুল বলেনি ছেলেটা। ওর মনে হলো চোখ মুদলেই ঘুম এসে যাবে। মুচড়ে মুচড়ে আরেকটু নীচের দিকে নামিয়ে দিল শরীরটাকে। আঙুলে লাগল শক্ত কি যেন। বের করে আনল ওটা।

একটা বোতাম। খুব সুন্দর। নীল রঙের, কিনারটায় সোনালি রঙ।

'এটা ওর পায়জামার বোতাম,' ছেলেটা বলল। 'কি যে সব বোতাম ওর পোশাকের, দেখলে বুঝতে।'

'স্যুভনির হিসেবে রেখে দিতে পারি এটা, কি বলো?' এমন ভঙ্গি করল মুসা, যেন ছেলেটার মত নিল, তারপর আলগোছে ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।'

'তা রাখো, কিছুই মনে করবে না কাউয়া। একটা বোতাম খোয়া গেলে পায়জামাটাই ছেঁড়া তেনার মত ফেলে দেবে সে, নতুন আরেকটা বের করে নেবে।'

'এই বোতামটা যে ছিঁড়েছে পায়জামা থেকে দেখতে পায়নি?' জানতে চাইল রবিন।

'জানি না। বদলানোর সময় পায়নি হয়তো। সেজন্যেই সবাই ভাবছে ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। নিজের ইচ্ছেয় পালালে পায়জামা পরে যেত না, অন্য পোশাক পরে যেত।'

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল মুসা আর রবিন।

বেরোতেই একটা চিৎকার কানে এল, 'মুসা, রবিন, তোমরা! এসো এসো, আমাদের তাঁবুটাও দেখে যাও!'

ঘুরে তাকিয়ে দেখল দুজনে, বেড়ার ওপাশ থেকে ডাকছে বব।

সাত

'এই যে বব,' রবিন বলল। ভুলেই গিয়েছিল প্রিন্সের তাঁবুর কাছে তাঁবু ফেলেছে ববেরা তিন ভাই।

লাল-চুলো ছেলেটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিকে এগোল মুসা আর রবিন। বেড়া পার হয়ে চলে এল অন্যপাশে। তাঁবুর সামনে বসে আছে ববের দুই ভাই পাব আর জব। মুসাদের দেখে খুশি হলো ওরা।

তাঁবু দেখানোর জন্যে মুসা আর রবিনকে ভেতরে ডেকে আনল বব। এইমাত্র যে তাঁবুটা দেখে এসেছে দুই গোয়েন্দা, তার তুলনায় এটা একেবারেই নগণ্য। কিন্তু ববেরা তিন ভাই এটা নিয়েই খুব গর্বিত।

একটা পিপিং ব্যাগও নেই ওদের। কয়েকটা পুরানো কম্বল গোল করে পাকিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে এককোণে একটা পুরানো তেরপলের ওপর। তৈজস বলতে আছে তিনটে মগ, তিনটে পুরানো ছুরি, তিনটে চামচ, দুটো কাঁটা চামচ, তিনটে ম্যাকিনটশ ক্যাপ, তিনটে এনামেলের বাসন, আরও টুকিটাকি কিছু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস।

সবই আছে তিনটে করে, দুটো কাঁটা চামচ কেন জিজ্ঞেস করায় বব জানাল পাবেরটা ও গোসল করার সময় হারিয়ে এসেছে। গোসল করার সময় কাঁটা চামচ নিয়ে গিয়েছিল কেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, কিন্তু ববের কথার তোড়ে ভুলেই গেল।

'সুন্দর ক্যাম্প হয়েছে, তাই না?' বব বলল। 'মাঠের ধারের একটা বাড়ির টেপ থেকে খাবার পানি জোগাড় করি আমরা। আমাদের কিছু বলে না বাড়ির মালিক, যেহেতু আমরা ছাত্র। কিন্তু ক্যারাভানের বাসিন্দাদের ঢুকতে দেয় না। তাই আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে একটা ক্যারাভানের জিপসি পরিবার, আমরা ওদের পানি এনে দেব, বিনিময়ে ওরা আমাদের কিছু খাবার দেবে। চমৎকার ব্যবস্থা, তাই না?'

আশেপাশে বেশ কিছু ক্যারাভান দেখা গেল। ছোটখাটো তাঁবু আছে দু'তিনটা। ববদের তাঁবুর পাশের ক্যারাভানটা খালি। দমকা বাতাসে ভেতর থেকে ফড়ফড় করে উড়ে এসে পড়ল কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ।

'ওটার বাসিন্দারা চলে গেছে,' বব বলল। 'এক মহিলা থাকত, দুটো বাচ্চা আছে তার, ছেলে।'

'আঁ!' টফি চুষতে চুষতে এই প্রথম কথা বলল জব।

'এ ভাবে আঁ-আঁ করে কেন শুধু?' মুসার প্রশ্ন। 'আর কোন কথা জানে না?'

'টফি মুখে থাকলে বলবে কিভাবে,' বব বলল। 'বাড়িতে এত খেতে পারে না, আম্মা ধরে পেটায়। এখানে তো পেটানোর কেউ নেই, মনের সুখে টফি চোষে, আর আঁ-আঁ করে।'

'আঁ!' বলে মুখের টফিটা তাড়াতাড়ি করে গিলতে গিয়ে গলায় আটকে ফেলল জব। হাঁসের মত গলা টেনে টেনে অনেক কষ্টে বের করে আনল সেটা। গেল আবার মুখে আটকে। পেটে চালান করা আর হলো না।

'মনে হচ্ছে ও কিছু বলতে চায়,' জবের দিকে তাকাল রবিন। 'কিছু বলবে, জব?'

'আঁ!

'কি?'

কথা বলতে পারল না জব। ক্যারাভানটা দেখিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করল। কিছুই বুঝতে পারল না রবিন। ববের দিকে তাকাল, 'কি বলছে ও?'

'কি আর বলবে, হয়তো যমজ দুটোর কথা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গিয়ে বসে থাকত ক্যারাভানে, বাচ্চা দুটোর কাছে। শিশুদের সাংঘাতিক পছন্দ করে ও।'

এ খবরটা বিস্মিত করল মুসা আর রবিনকে।

'জব শিশু পছন্দ করে!' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল বব, 'বেশি বলো না, এখুনি হয়তো বাচ্চাগুলোর শোকে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করবে।'

'আঁ!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল জব।

'এটাকে নিয়ে আর পারা যায় না!' রেগে গেল বব। 'টফি ছাড়া যদি একটা মুহূর্ত থাকতে পারে। দাঁড়া, আম্মাকে গিয়ে সব বলব। পিঠের চামড়া সব না তুলিয়েছি তো কি বললাম।'

এই হুমকিতে ভয় তো পেলই না, রেগে গেল জব। গটমট ওখান থেকে সরে গেল।

খুশিই হলো মুসা। জব আর ওর এই টফি চোষা সহ্য করতে পারছিল না। বিরক্তিকর।

'আজ সকালে বাচ্চা দুটো চলে যাওয়ার পর থেকেই জবের মন খারাপ,' পাব বলল। 'তখন থেকে আরও বেশি করে টফি খাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে বাচ্চা দুটোকে দেখতে গিয়েছিল, অন্য দিনের মত, কিন্তু ওদের মা কি জানি কেন ভয়ানক খেপে গিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমন চিৎকার শুরু করল মহিলা, বাচ্চা দুটোও ভয় পেয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল।'

'কেন এমন করল বুঝলাম না,' বব বলল। 'রোজ তো বরং খুশি হয়। জবের হাতে ছেড়ে দেয় ওদের। মাঠের মধ্যে গ্রাম ঠেলে নিয়ে বেড়িয়েছে জব ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তখন কিছু বলেনি, কিন্তু আজ যে কেন এরকম খেপে উঠল!'

এসব আলোচনা ভাল লাগল না মুসা বা রবিনের। কার বাচ্চা নিয়ে কে ঝগড়া করল কি হবে এসব শুনে?

প্রিন্সের প্রসঙ্গে এল রবিন, 'সন্দেহ করা হচ্ছে ঘুটাংকাউয়াকে নাকি কিডন্যাপ করা হয়েছে। কাল রাতে কিছু টের পেয়েছ তোমরা?'

'টের পাব কোত্থেকে। রাতে কি আর জেগে থাকি, মরার মত ঘুমাই। প্রিন্সের তাঁবু তো অনেক দূরে, আমাদেরকে কেউ তুলে নিয়ে গেলেও টের পেতাম না।'

তা বটে। র‍্যাম্পারকটরা ঘুমানোর ওস্তাদ। ওদের চাচা ফগর‍্যাম্পারকটেরও একই অবস্থা। ও যখন নাক ডাকায়, কানের কাছে ঢাক পেটালেও টের পাবে না।

'প্রিন্সকে তো নিশ্চয় দেখেছ, তাই না,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, সেদিনই তো বললাম। অদ্ভুত ভাবে মোরগের মত গলা টান করে কথা বলে। চেহারাটা অত খারাপ না, তবে প্রচুর বদস্বভাব আছে। কাউকে অপছন্দ হলে ছোট মানুষের মত জিভ দেখিয়ে ভেঙচি কাটে।'

'ভেঙচি কাটে?'

'আমাদের দেখলেই কাটত। সেদিন বেড়া ফাঁক করে উঁকি দিয়েছিলাম আমরা তিন ভাই। ওর চোখে পড়ে গেলাম। আর যায় কোথায়, বাঁদরের মত মুখ ভেঙচানো শুরু করল। রাজকুমার হতে পারে, তবে শিক্ষাটিক্ষা তেমন ভাল পায়নি। নাম্বার ওয়ান অভদ্র। আচরণে রাজকুমারের চেয়ে ফকিরের বাচ্চাই মনে হয় বেশি, ভেসে বেড়ানো জিপসি ছেলেদের সঙ্গে অনেক মিল। ওর ছাতাটাও দেখার মত। বিশাল। মাঝখানটা নীল, কিনারটা সোনালি। একদিন মাথায় দিয়েছিল, দিয়ে রাখতে পারল না, এমন সব কাণ্ড শুরু করল, মনে হলো এ ছাতা মাথায় দেয়ার তার অভ্যেস নেই। ছেলেরা হাসাহাসি শুরু করল, লজ্জা পেয়ে শেষে বন্ধ করে দিল সে। আর কখনও দেয়ার চেষ্টা করেনি।'

বেড়ার ওপাশ থেকে শোনা গেল কিশোরের গলা, 'অ্যাই মুসা, এত দেরি করছ তোমরা। আমি তো ভাবলাম না জানি কি।'

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, 'বেড়ার ভেতর দিয়ে আসা যাবে? কাপড় ছিঁড়বে না তো?'

'না, ছিঁড়বে না,' বব বলল, 'এদিক দিয়ে এসো।' বেড়ার কয়েকটা ডালপাতা সরিয়ে ফাঁক করে ধরল সে।

এপাশে এসে মুসাকে বলল কিশোর, 'তোমার ভাইটা খুব ভাল। আমাকে ছাড়তেই চায় না। বলে, কথা বলতে নাকি খুব ভাল লাগছে।'

'প্রিন্সের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে ওর কাছ থেকে?'

'নাহ্। ওর একটাই কথা, প্রিন্সকে ওর ভাল লাগেনি।'

'তোমাদের কি খবর?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'এই তো, কথা বলছি ববের সঙ্গে,' মুসা বলল, 'ওরাও কিছু বলতে পারল না। প্রিন্স যে রাতে নিখোঁজ হয়েছে সেরাতে নাকি মরার মত ঘুমাচ্ছিল ওরা। কিছু শোনেনি।'

'আঁ!' পেছন থেকে বলে উঠল জব।

ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, জোরে জোরে নড়ছে ওর চোয়াল দুটো।

রেগে গেল বব। 'আবার এসেছিস! যা, ভাগ এখান থেকে! টফি মুখে নিয়ে আর যদি আসিস আঁ-আঁ করতে, কান ছিঁড়ে দেব।'

সরে গেল জব।

পকেট থেকে নীল-সোনালি বোতামটা বের করল মুসা। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'ঘুটাংকাউয়ার পিপিং ব্যাগের ভেতর পেয়েছি।'

বোতামটা হাতে নিয়ে দেখল কিশোর। মুসাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'রেখে দাও। তবে এত সামান্য সূত্র দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

বোতামটা আবার পকেটে রাখতে রাখতে মুসা বলল, 'ও নাকি পায়জামা পরেই উধাও হয়েছে।'

'কে বলল?'

'একটা ছেলে। প্রিন্সের তাঁবুতে থাকে।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

'পায়জামা পরে উধাও হওয়ার মধ্যে অদ্ভুতের কি দেখলে?' রবিন বলল, 'হয়তো তাড়াহুড়ো ছিল ওর, কাপড় পরার সময় পায়নি। কিংবা কাপড় পরতে গিয়ে শব্দ হলে অন্য ছেলেগুলো জেগে যেতে পারে, এ ভয়ে পরেনি।'

'উঁহু, এটা কোন কথা হলো না। জেগে যাওয়ার ভয় থাকলে কাপড় হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, বাইরে গিয়ে পরতে কোন অসুবিধে ছিল না। রাতের বেলা শুধু পায়জামা পরে বেরোনোটা অস্বাভাবিক লাগছে না তোমাদের কাছে? তাও একজন প্রিন্সের জন্যে?'

'তবে কি তাঁবু থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কাপড় পরার সময় দেয়নি?'

'না, তাও না। পিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে কাউকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে টেনে

বের করা সহজ ব্যাপার নয়। আর করতে গেলে চিৎকার করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু টুঁ শব্দও করল না কেন? করলে তাঁবুর তিনটে ছেলের কেউ না কেউ শুনতে পেতই, যত ঘুমই থাক।'

'তা হলে নিল কি করে?' ফারিহার প্রশ্ন।

'নেয়নি, সে ইচ্ছে করেই গেছে। তাকে বেরিয়ে যেতে কেউ সাহায্য করেছে,' কিশোর বলল। 'রাজকীয় আদব-কায়দা আর নানারকম বন্ধনের মধ্যে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে গিয়েছিল হয়তো ওর, পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কত রকমের লোভ আছে এবয়েসী ছেলেদের জন্যে—মেলা দেখা, বনেবাদাড়ে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো, জিপসিদের মত ক্যারাভানে বাস করা, আরও কত কিছু। এমন হতে পারে, লোভ দেখিয়ে গেটের বাইরে বের করা হয়েছে ওকে, তারপর কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তি,' মাথা দোলাল মুসা।

আট

'অনেকক্ষণ তো থাকলাম,' কিশোর বলল, 'চলো, বাড়ি যাই এবার।'

বব আর পাবকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলো ওরা। জবকে চোখে পড়ল না। ধমক খেয়ে সেই যে বিদেয়ে হয়েছে, আর আসেনি।

বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা সাইকেলগুলো নিয়ে বাড়ি চলল ওরা। কিছুদূর একসঙ্গে যাওয়ার পর মোড় নিয়ে যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

ঘরে ঢোকার পর মনে হলো কিশোরের, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাটা ঠিক হয়নি। সময় কাটানোর জন্যে ছদ্মবেশ নেয়া প্র্যাকটিস করতে লাগল সে।

দরজায় টোকা পড়ল। অবাক হলো সে। এ সময় আবার কে এল?

দরজা খুলে দিতে দেখল বব আর জব দাঁড়িয়ে আছে।

হাসিটা মুছে গেল ববের, যখন দেখল একজন বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে বয়েসের ভারে, বড় বড় দাড়ি, সাদা হয়ে যাওয়া ভুরু, পুরো মাথাটায় টাক, কেবল ঘাড়ের কাছে ঝুলে রয়েছে কয়েক গুচ্ছ সাদা চুল। গায়ে ঢোলা পুরানো কোট, পকেটগুলো বেশির ভাগই ছেঁড়া। প্যাটটা আরও পুরানো।

'ইয়ে···আ-আমি বব···কিশোর পাশা আছে?'

'তোতলাচ্ছ কেন? কি হয়েছে তোমার?' বুড়ো মানুষের গলায় বলল কিশোর। 'শুনতে পাইনি। আবার বলো।'

আরেকটু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল বব, 'কিশোর পাশা আছে?'

'চিৎকার করছ কেন? আস্তে বললে কি শুনি না নাকি? এই কিশোর পাশাটা কে?'

বোকা হয়ে গেল বব। কি জবাব দেবে? আমতা আমতা করে বলল, 'কে আবার, একটা ছেলে।'

'আমাকে কি ছেলের মত লাগছে?'

'আ-আপনাকে তো ব-ব-বলছি না…'

'তো কাকে বলছ?'

'দেখুন, কিশোর পাশা থাকলে বলুন, না থাকলে বলে দিন, আমরা চলে যাচ্ছি…'

পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরে শ্লেষ্মা মোছার ভঙ্গি করল কিশোর। এত জোরে খোঁওত করে উঠল, ভয় পেয়ে দৌড় মারতে গেল জব। ধরে ফেলল ওকে বব।

হেসে উঠল কিশোর।

হাসি শুনে চিনে ফেলল তাকে বব। 'ও মা, কিশোর, তুমি, আমি তো ভেবেছি…মাথাটাকে টেকো করলে কি করে ওভাবে?'

'ও কিছু না, পরচুলা। তা হঠাৎ এখন কি মনে করে?'

'জব তোমাকে কিছু বলতে চায়।'

'কি বলবে, ও তো শুধু আঁ-আঁ করে।'

'এখন আর করবে না।'

'এসো, ভেতরে এসো।'

দুই ভাই ঢোকার পর দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর। বসতে দিল ওদের। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বলো এবার।'

'সারা বিকেল থেকেই তোমাদের কিছু বলার চেষ্টা করছিল জব। মুখে টফি থাকায় পারেনি। অনেক কষ্টে সেটাকে নামিয়েছে, তারপর আর মুখে দেয়নি। এখন কথা বলতে পারে।'

'আসলেই কি পারে?' সন্দেহ গেল না কিশোরের।

'আঁ!' জবাব দিল জব। খঁত খঁত করে গলা পরিষ্কার করল। 'আঁ! পারি। ওদের চিৎকার করতে শুনেছি।'

'কাদের?'

'আঁ! ওদের।'

'আঁ-আঁ করা মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে ওর।'

'আঁ!' আবার গলা পরিষ্কার করল জব।

রেগে গেল বব, 'আবার এরকম করলে দেব কষে এক থাপ্পড়! ভাল করে বল।'

ববের দিকে তাকাল কিশোর। 'ও আসলেই কি কিছু বলতে পারবে?'

'তা পারবে। না পারলে টফির টিন কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দেব। চাচার কাছে ধরে নিয়ে যাব।'

এসব হুমকিতে ঘাবড়ে গেল জব, আঁ-আঁও আর বেরোল না মুখ দিয়ে।

কোনমতে ওকে কথা বলাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে শেষে বব বলল, 'দাঁড়াও, আমিই বলি, আমাকে যা বলেছে। অদ্ভুত কাণ্ড, কিশোর, শুনলে বিশ্বাস করতে চাইবে না।'

'বলোই না আগে, শুনি।'

জবের শিশু-প্রীতির কথা সবিস্তারে বলল বব। ক্যারাভানের মহিলা আর তার দুই বাচ্চার কথা জানিয়ে বলল, 'রোজই ওদের সঙ্গে খেলা করতে যেত জব। আজ সকালে যেতেই তেড়ে এল মহিলা। ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। শাসিয়ে বলল, আর যদি যেতে দেখে কান ছিঁড়ে দেবে।'

'হঠাৎ এমন রেগে গেল কেন? বাচ্চাগুলোকে টফির নেশা ধরানোর চেষ্টা করেছে নাকি জব?'

'না।'

'তাহলে?'

'কেন ওরকম করল আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। জব যা দেখেছে, সেটা শোনো এবার। প্রামটা টেনে নিয়ে গেল ক্যারাভানের পেছনে, যাতে নজর রাখতে পারে। সমানে চিৎকার করছে ওতে বসা বাচ্চা দুটো।'

'আঁ!' জবের মুখ দেখে মনে হলো বাচ্চাগুলোর দুঃখে কেঁদে ফেলবে।

'চুপ!' ধমক লাগাল বব। কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'মহিলা একটু চোখের আড়াল হতেই কেন কাঁদছে দেখতে গেল জব। ওর নাকি মনে হয়েছে বিশাল প্রামটায় আরও কেউ আছে।'

সোজা হয়ে বসল কিশোর। সতর্ক হয়ে গেছে। 'আরও কেউ মানে?'

'কালো চুলওয়ালা একটা মাথা দেখেছে নাকি। ভাল করে দেখার আগেই মহিলা ফিরে এসেছে, জবকে দেখে তেড়ে এসেছে আবার। ধরে কান মুচড়ে দিয়েছে। এই দেখো না, এখনও লাল হয়ে আছে।'

উত্তেজনায় আঁ-আঁ ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল জব, 'প্রামের মধ্যে প্রিন্স লুকিয়ে ছিল, আমি দেখেছি···' বলেই কথা আটকে গেল আবার, চাপাচাপি করতে গিয়ে শুধু গোঁ গোঁ বেরোল মুখ দিয়ে, কথা আর বেরোল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে মাথা দোলাল কিশোর, 'হুঁ, তাহলে এই ব্যাপার! রাতের বেলা বেরিয়ে গিয়ে প্রামে লুকিয়ে ছিল প্রিন্স। সকালে গায়ের ওপর কাপড় ফেলে ওকে ঢেকে দিয়েছিল মহিলা, ওপরে বাচ্চাদের বসিয়ে রেখেছিল যাতে কারও চোখে না পড়ে। বেকায়াদা ভাবে বসে আরাম না পাওয়াতে চিৎকার করছিল বাচ্চাগুলো। দম নেয়ার জন্যে মাথাটা বের করে রেখেছিল প্রিন্স, জবের চোখে পড়ে যায়।'

'আঁ!' মাথা ঝাঁকাল জব।

'তারপর প্রাম ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে যায় মহিলা,' কিশোর বলল, 'কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারেনি। কিন্তু এরকম কেন করল প্রিন্স? মহিলারই বা কি লাভ?'

'রহস্য পেয়ে গেলে, তাই না কিশোর? ভাগ্যিস মুখ খুলতে পেরেছিল জব।

সারাটা বিকেলই এ কথা আমাদের বলার চেষ্টা করেছে সে।'

'ভাল হয়েছে মুখে টফি থাকায়, অন্য কাউকে বলতে পারেনি। এখন ওকে সাবধান করে দাও, আর কাউকে যেন না বলে।'

'না, বলবে না। বেশি কথা বলে না ও। আম্মা বলে, ওর জিভে নাকি কি একটা দোষ আছে, এমনিতেই ঠিকমত কথা বলতে পারে না, তারওপর টফি মুখে দিয়ে...'

'এক কাজ করো, তোমার চাচাকে গিয়ে সব কথা বলে দাও। তাকে কোন কথা গোপন করাটা ঠিক হবে না। এমনিতেই ক্যাপ্টেন রেগে আছেন আমাদের ওপর।'

'আমি বলব!' হাত নাড়ল বব, 'অসম্ভব! আমাকে মাপ করো, ভাই। কি থেকে কি বলে ফেলব, এমন গাট্টা মারবে কানের ওপর, আগামী এক মাস হয়তো শুনতেই পাব না!'

'কিন্তু না জানালে আরও খেপে যাবে। পরে একসময় সে জানতে পারবেই। আগে বলনি বলে তখন আরও বেশি মারবে।'

নয়

কিশোর ঠিকই বলেছে। অগত্যা কি আর করবে। জবকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বব। এখন মনে হচ্ছে ওর, ঘটনাটার কথা না জানলেই যেন ভাল হত। চাচার মুখোমুখি হতে হতো না আর।

রান্নাঘরে বসে ছিল ফগ, গেট খোলার শব্দে দরজায় বেরিয়ে এল। বব আর জবকে দেখেই গর্জে উঠল, 'ঝামেলা! এই সন্ধেবেলা বেরিয়েছিস কেন?'

ভয় পেয়ে ঘুরে দৌড় মারল জব। দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আনল বব।

আরও জোরে গর্জে উঠল ফগ, 'পালাচ্ছিল কেন হাঁদাটা? আয়, কান ধরে নিয়ে আয়, চাবকে পিঠের চামড়া তুলি।'

থরথর করে কাঁপতে লাগল বেচারা জব।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

ভয়ে ভয়ে বলল বব, 'চাচা, একটা কথা বলতে এসেছি তোমাকে, জরুরী কথা।'

'কি কথা?'

'প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া...'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দুই ভাতিজার দিকে তাকিয়ে রইল ফগ। হাত নেড়ে ডাকল, 'আয়।'

ভেতরে ঢুকল বব আর জব। মুখোমুখি বসল ফগ। 'হ্যাঁ, বল এবার কি কথা?'

চুপ করে রইল জব। এমনকি আঁ-ও করল না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে আরেকটা ধমক খেলেই চোখ উল্টে দিয়ে পড়ে যাবে।

হড়হড় করে বলে ফেলল বব, 'চাচা, জব দেখেছে ওদেরকে। প্রামে করে প্রিন্স ঘুটাংকাউয়াকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। একটা বেবি-প্রামে লুকিয়েছিল ও, ওর ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছিল দুটো বাচ্চাকে।'

ববের কথা একবিন্দু বিশ্বাস করল না ফগ। উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'ঝামেলা! কোত্থেকে এক আজগুবি গল্প শোনাতে এসেছে। এসব গাঁজাখুরি কথা আমাকে না বলে মোটকা ছেলেটাকে গিয়ে বললি না কেন? ঘুরে মরুকগে যেখানে খুশি।'

ভয়ে ভয়ে বলল বব, 'ওকেই তো আগে বলেছি। সে বলল তোমাকে বলতে।'

'তা তো বলবেই। এসব গাঁজা কি আর বিশ্বাস করে; এত বোকা নয় ও। আমাকে বলতে বলেছে যাতে আমি গিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলি, আর ধমক খাই। একবারেই অনেক শিক্ষা হয়েছে, এত সহজে আর বোকা বানাতে পারবে না আমাকে।' খেঁকিয়ে উঠল হঠাৎ, 'আর ওর কথা শুনে আমাকে এসেছিস বোকা বানাতে, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে ফেলব, শয়তান কোথাকার! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!'

ববের মনে হলো রাগে পেট ফুলতে ফুলতে চাচার বেল্টটাই ছিঁড়ে যাবে। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আগেই উঠে পড়েছে জব। জিভ নড়াতে না পারলেও পা নড়ানোয় বড় ভাইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র সে। সোজা দরজার দিকে দৌড় দিল।

ঘর থেকে লাফিয়ে নেমে গেটের দিকে ভোঁ দৌড় দিল দুজনে।

'পালা, জব, পালা!' ছুটতে ছুটতে বলল বব। 'সোজা ক্যাম্পে। চাচা সাইকেল নিয়ে তাড়া করলে সোজা জঙ্গলে ঢুকে যাবি!'

তবে অনেক দূর আসার পরও পেছনে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল না। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছোটার গতি কমিয়ে দিল দুই ভাই।

ক্যাম্পে ফেরার পর সব শুনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগল পাব, বার বার বলতে লাগল—ভাগ্যিস সে ওদের সঙ্গে যায়নি।

বব বলল, সে কল্পনাই করতে পারেনি, ওদের কথা এভাবে উড়িয়ে দেবে চাচা। তাহলে যেত না। তবে একটা সান্ত্বনা আছে, কিশোর তার কথা বিশ্বাস করেছে।

কিশোরও তখন এই কথাটা নিয়েই ভাবছে। প্রামের গদি দুটো তুলে নিচে জায়গা করে দেয়া হয়েছে। তাতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়েছে প্রিন্স। তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ওপরে বাচ্চা দুটোকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর প্রাম ঠেলে নিয়ে মহিলা বেরিয়ে গেছে ক্যাম্প এলাকা থেকে। বুদ্ধিটা চমৎকার।

কিন্তু প্রিন্স এভাবে পালাতে রাজি হলো কেন?

এটাই আসল রহস্য। এর জবাব পাওয়া গেলেই অনেক প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে। কিন্তু ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা করতে না পেরে শেষে ভাবল, ভাবনাটা মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। হয়তো পেয়ে যাবে জবাব। অনেক সময় ঘুমের মধ্যেই ধাঁধার সমাধান করে দেয় মগজ।

কিন্তু পরদিন সকালেও প্রশ্নটার কোন জবাব দিল না কিশোরের মগজ। জবাব পাওয়ার জন্যে আরও তথ্য দরকার।

আশা করল, ফগ এসে হাজির হবে।

কিন্তু এল না ফগ। এমনকি একটা টেলিফোনও করল না।

হয়তো বিশ্বাস করেনি ববের কথা। না করুক। দরকার হয় ওরা নিজেরাই এ রহস্যের সমাধান করবে।

প্রথমে রবিনকে ফোন করল কিশোর। সাড়ে নটার মধ্যে মুসাদের বাড়িতে হাজির থাকতে বলল। তারপর করল মুসাকে। ওকে আর ফারিহাকে কোথাও বেরোতে নিষেধ করল, ছাউনিতে থাকতে বলল। বলল, সে আর রবিন আসছে।

সাড়ে নটার আগেই ছাউনিতে মিলিত হলো ওরা।

আগের দিন বব আর জব এসে যা যা বলে গেছে, সব খুলে বলল কিশোর। শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে।

'প্রামে লুকিয়ে রেখেছিল!' রবিন বলল, 'নিশ্চয় আগে থেকেই মহিলাকে চেনে প্রিন্স। ওর তাঁবুর কাছে ক্যারাভানে মহিলার বাস করারও কোন উদ্দেশ্য ছিল।'

'হয়তো প্রিন্সের নার্স ছিল মহিলা,' ফারিহা বলল, 'ছোটবেলায় দেখাশোনা করেছে। ক্যাম্পে থাকতে প্রিন্সের ভাল লাগছিল না বলে ওকে বের করে নিয়ে গেছে।'

'এটা হতে পারে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু জট পাকিয়ে দিয়েছে বাচ্চা দুটো। ওরকম বাচ্চা সহ কোন মহিলাকে প্রিন্সের নার্স রাখা হয়েছে, এটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।'

'হয়তো আগে ছিল না। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে বিয়ে করেছে মহিলা, বাচ্চা হয়েছে।'

'আন্দাজে কথা বলে লাভ নেই। তথ্য খোঁজা দরকার। জানতে হবে, মহিলাটি কে? ক্যাম্পে কখন এসেছে, প্রিন্সের সঙ্গে সঙ্গে, নাকি আগে? ক্যারাভানটা কার, বাচ্চাগুলো কার–নিজের, নাকি ভাড়া করে আনা। ডাবল-প্রামটা ইচ্ছে করে আনা হয়েছিল কিনা মানুষ পাচার করার উদ্দেশ্যে। অনেক প্রশ্ন এসে যাচ্ছে।'

'এসব জানতে হলে তদন্তে নামতে হবে আমাদের,' রবিন বলল।

'প্রয়োজন হলে নামব,' কিশোর বলল। 'আজকের কাগজ দেখেছ?'

'চোখ বুলিয়েছি। তোমার ফোন পাওয়ার পর এত উত্তেজিত ছিলাম, পড়ায় মন বসাতে পারিনি।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা খুলে বিছাল কিশোর। 'এই দেখো, প্রিন্স

আর তার দেশের কথা বিস্তারিত লেখা হয়েছে।'

পড়ার কষ্ট করতে গেল না মুসা, 'মুখেই বলো।'

'বাকাবুয়া বড় দেশ নয়,' কিশোর বলল। 'সাগরের মাঝখানে অনেক বড় একটা দ্বীপ। আমেরিকান নেভির জন্যে দ্বীপটা ব্যবহার করা খুব জরুরী, সেজন্যে বাকাবুয়ার রাজার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে হয়েছে। রাজাও খুব খুশি, কারণ মোটা টাকা পায় নেভির কাছ থেকে। বর্তমান রাজার সঙ্গে ঝগড়া আছে তার চাচাত ভাইয়ের। ওই লোকটা রাজাকে সরিয়ে দিয়ে রাজা হতে চায়। প্রিন্সকে সুশিক্ষার জন্যে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন রাজা। এমন হতে পারে, রাজাকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যেই কিডন্যাপ করা হয়েছে ঘুটাংকাউয়াকে।'

'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সেই পুরাতন কাহিনী,' মন্তব্য করল রবিন। 'রাজকুমারের জন্যে কি মুক্তিপণ হাঁকবে বলে মনে হয়?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'টাকার জন্যে একাজ করেনি। প্রিন্সকে আটকে রেখে রাজাকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করতে চাইবে হয়তো। কিন্তু যেভাবে গায়েব হয়েছে প্রিন্স, সেটাকে কিডন্যাপ বলা চলে না। নিজের ইচ্ছেয় রাতের বেলা পালিয়ে গিয়ে গ্রামে লুকিয়ে থেকেছে ও, ওকে পাচার করতে সাহায্য করেছে মহিলাকে। এটার কি জবাব?'

'হতে পারে কিডন্যাপারদের উদ্দেশ্য আগেই টের পেয়ে গেছে প্রিন্স, মহিলাকে বিশ্বাস করে, তাই গিয়ে সব কথা জানিয়েছে। শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রিন্সকে গোপনে বের করে নিয়ে গেছে মহিলা, লুকিয়ে ফেলেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ঠিকই বলেছ, এটা কিন্তু হতে পারে।'

মুসা বলল, 'ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করো।'

'ভেবেছি সেকথাও। কিন্তু সাহস পাচ্ছি না, ভাবলেই মনে হয় আমাদের ওপর এখনও রেগে আছেন তিনি। তা ছাড়া কাল রাতে ববকে পাঠিয়েছি ফগের কাছে, ফগই ফোন করবে ক্যাপ্টেনকে, আমাদের করার দরকার নেই। কারও সঙ্গে যদি কথা বলার প্রয়োজন মনে করেন ক্যাপ্টেন, তাহলে জবের সঙ্গে করবেন। কারণ গ্রামের মধ্যে প্রিন্সকে জব দেখেছে, আমরা কেউ নই।'

ফগের নাম কানে যেতেই কান খাড়া করে ফেলল টিটু। গম্ভীর স্বরে বলল, 'ঘুফ!'

হেসে ফেলল মুসা, 'এ ব্যাটা শুনেই নিশ্চয় পায়ে কামড়ানোর কথা ভাবছে।'

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর ফারিহা বলল, 'একটা অদ্ভুত রহস্য! কোনখান থেকে যে তদন্ত শুরু করব, তাও বুঝতে পারছি না।'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কয়েকবার কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'শুরু করলে মহিলাকে দিয়েই করতে হবে। সে কে, সেটা জানতে হবে আগে। তার ঠিকানা খুঁজে বের করতে হবে। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রয়োজন পড়লে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করতে হবে তার কাছ থেকে। প্রিন্সকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কেন রেখেছে, জানতে হবে।'

'কি করে খুঁজে বের করব মহিলাকে?' মুসার প্রশ্ন। 'সূত্র কোথায়?'

'ক্যাম্পে গিয়ে ক্যারাভানটা কার, খোঁজ নেব আগে। মহিলাকে কেউ চেনে কিনা, অন্য ক্যারাভানের বাসিন্দাদের জিজ্ঞেস করব।' সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর, 'সাইকেল রেডি আছে?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকাল সবাই, টিটু বাদে। ওর সাইকেল নেই, কিশোরের বাস্কেট ভরসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দল বেঁধে রওনা হলো ক্যাম্পের উদ্দেশে।

দশ

আবার ওদেরকে আসতে দেখে খুব খুশি হলো বব, জব আর পাব। সেই একই ভাবে চোয়াল নড়ছে জবের।

'খুশি হলে কি হবে,' জবকে বলল কিশোর, 'তোমার সঙ্গে তো আর কথা বলা যাবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই কেবল আঁ-আঁ করবে। বেশি টফি খেলে কি হয় জানো? ভয়ানক অসুখ। হাসপাতালে যাওয়া লাগে। ইয়া বড় বড় সুই দিয়ে ইঞ্জেকশন দেবে ডাক্তাররা, গাল কাটবে, জিভ কাটবে, চেঁচালেও শুনবে না।'

চোয়াল নাড়া বন্ধ করে দিয়েছে জব।

কিশোর বুঝল, ওর ভয় দেখানোতে কাজ হচ্ছে। বলল, 'তারপর ঢোকাবে মোটা নল। নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে একেবারে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। এই যে তোমার মুখে টফি আটকে যায়, কথা বলতে পারো না, এটাই অসুখের লক্ষণ, সবে শুরু। আর কিছুদিনের মধ্যেই হাসপাতালে পাঠানো লাগবে তোমাকে।'

'আঁ!' ভয় দেখা যাচ্ছে জবের চোখে।

'টফি এমনিতেই খারাপ জিনিস, তার ওপর খাচ্ছ মেলার পচা টফি। খুব তাড়াতাড়িই জিভ পচা শুরু হবে তোমার। বাঁচতে চাইলে জলদি মুখ থেকে ফেলো।'

করুণ দৃষ্টিতে তাকাল জব, 'আঁ!'

বব বলল, 'ওকে বলে লাভ নেই, কিশোর, ইচ্ছে করলেও ফেলতে পারবে না। মুখে টফি আটকে গেছে।'

'কি জঘন্য জিনিসরে বাবা! মুখে এভাবে আটকায় কি করে তাই তো বুঝি না!' মুসা বলল।

'ঈশ্বরই জানে কি দিয়েছে ব্যাটারা এর মধ্যে!' বব বলল। 'আমি একটু মুখে দিয়ে টেস্ট করতে গিয়েছিলাম, ঘ্যাট করে গেল জিভ আর টাকরায় আটকে, থু-থু করে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বেঁচেছি।'

'আর ও তো একটা দুটো মুখে দেয় না,' ববের সুরে সুর মেলাল পাব, 'মুঠো

মুঠো করে দেয়। গলে গিয়ে দলা পাকিয়ে যায়, তারপর আর না পারে বের করতে, না পারে মুখ হাঁ করতে। তার ওপর রয়েছে জিভে দোষ।'

'তা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু ওর মুখ খোলানো দরকার, যেভাবেই হোক। ওকে দিয়ে কথা বলানো এখন আমাদের জন্যে খুব জরুরী। জব, এদিকে এসো। চোয়াল নড়ানো বন্ধ করো। আমি তোমাকে প্রশ্ন করব। জবাবটা হ্যাঁ হলে মাথা ঝাঁকাবে, না হলে এদিক ওদিক নাড়বে, বুঝতে পেরেছ?'

'আঁ!' এত জোরে মাথা ঝাঁকাল জব, গলার মধ্যে একগাদা রস ঢুকে গিয়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

ওর পিঠে জোরে জোরে থাপ্পড় দিয়ে আবার বাতাস চলাচল স্বাভাবিক করে দিল বব।

কপালে হাত দিল মুসা। বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না।

'বেশি জোরে মাথা ঝাঁকাবে না,' কিশোর বলল। 'এবার বলো, মহিলার নাম জানো তুমি?'

'আঁ!' মাথা ঝাঁকাল জব।

'প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছ?'

'আঁ!' মাথা ঝাঁকাল জব।

'আঁ বলার দরকার নেই, শুনলে বিরক্ত লাগে। শুধু মাথা নাড়ো, কিংবা ঝাঁকাও। হ্যাঁ, বলো, প্রামটা ঠেলে নিয়ে কোনদিকে গেছে মহিলা দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জব।

'মহিলা চলে যাওয়ার পর একটা লোক লরি নিয়ে এসে ক্যারাভানের সমস্ত মালপত্র তুলে নিয়ে গেছে,' অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল পাব।

'নাম কি লোকটার?' জানতে চাইল কিশোর।

'জানি না।'

'মহিলা কিংবা বাচ্চা দুটোর নাম?'

'তাও জানি না।'

'ওগোলোম-বোগোলোম!' বলে উঠল জব।

'আরি, আঠা অনেকটা কেটেছে মনে হয়!' কিশোর বলল। 'কি বলছ?'

'বিদেশী ভাষা,' হেসে বলল বব। 'ফারিহার মত।'

আবার কথা বলার চেষ্টা করল জব, বেরোল শুধু, 'ওগোলোম-বোগোলোম-রোগোলোম!'

'লিখে দে। দাঁড়া, কাগজ নিয়ে আসি,' বলে দৌড়ে গিয়ে কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে এল বব।

বড় হাতের অক্ষরে গোটা গোটা করে দুটো নাম লিখল জব: বেট ও ফিডেল। তারপর হাত বাঁকা করে শিশু কোলে নেয়ার ভঙ্গি করে দেখাল।

'কি বোঝাতে চাইছে ও?' রবিনের প্রশ্ন। 'বাচ্চা দুটোর নাম লিখেছে নাকি?'

'আঁ!' বলল জব। 'ওগুলোম-বোগোলোম!'

নাম দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'এতে কোন সাহায্য হবে কিনা বুঝতে পারছি না। যাই হোক, বব, দেখো এরপর আর যেন টফি মুখে দিতে না পারে ও।' মুসার দিকে তাকাল। 'চলো।'

'কোথায়?'

'ক্যারাভানের মালিককে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করব মহিলার নাম-ঠিকানা জানে কিনা।'

'আমি আসি?' ববের চোখে অনুনয়।

'তুমি আসবে কি করে, তোমার তো সাইকেল নেই। তা ছাড়া তুমি এলে জব আর পাবও আসতে চাইবে। এতবড় দল নিয়ে কাউকে খুঁজতে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'হুঁ!' ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল বব।

ওকে হতাশ করে দুঃখই লাগল কিশোরের, কিন্তু উপায় নেই।

ডাভহিলে বাস করে একজন এজেন্ট, যে ক্যারাভান ভাড়া নেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তার বাড়ি খুঁজে বের করল ওরা। পাহাড়ের গোড়ায় ছোট মাঠের ধারে আরেকটা বড় ক্যারাভানের মধ্যে লোকটার বাড়ি এবং অফিস।

'কে কথা বলতে যাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তুমিই যাও,' ফারিহা বলল। 'এসব তুমিই ভাল পারো।'

অন্য দুজন বিনাবাক্যব্যয়ে সমর্থন করল ওকে।

ক্যারাভানের গেট দিয়ে ঢুকে দরজায় টোকা দিল কিশোর।

খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণ। ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট।

'কি চাই?'

'আমি একজন মহিলাকে খুঁজছি। স্কুলের ক্যাম্প করা হয়েছে যে মাঠে, সেখানকার একটা ক্যারাভান ভাড়া নিয়েছিল। আপনি কি তার নাম-ঠিকানা আমাকে দিতে পারেন? খুব উপকার হবে। আমি আসার আগেই ক্যারাভান ছেড়ে চলে গেছে।'

'সে তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার। সময় লাগবে। এখন সম্ভব না।'

ক্যারাভানের একপাশের দেয়ালে লেখা রয়েছে: হেমিল ব্রুকসন ক্যারাভান কোম্পানি।

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল কিশোর, 'বেশ, তাহলে মিস্টার হেমিল ব্রুকসনের কাছেই যাই বরং, তাঁকেই জিজ্ঞেস করব,' ঘুরে দাঁড়াল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন লোকটার শরীরে। চিৎকার করে উঠল, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমি কি বলেছি নাকি পারব না। মিস্টার হেমিলকে যে চেনো আগে বলনি কেন? দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি ঠিকানাটা।'

'জলদি করুন! আমার সময় কম।'

'এক মিনিট,' ঝড়ের বেগে আবার ভেতরে ঢুকে গেল তরুণ।

মুচকি হাসল কিশোর। মিস্টার হেমিল নিশ্চয় ভয়ঙ্কর মেজাজী মানুষ, যাকে বাঘের মত ভয় পায় লোকটা। পাল্লার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, বিশাল এক ফাইল খুলে দ্রুতগতিতে পাতা ওল্টাচ্ছে সে। একটা পাতায় এসে স্থির হয়ে গেল হাত। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুল ক্যাম্পের কোন ক্যারাভানটা?'

'নাম তো দেখলাম ইয়েলো লীফ। সবচেয়ে ছোটটা,' জবাব দিল কিশোর।

একটা তালিকায় আঙুল রেখে দ্রুত নিচের দিকে নামিয়ে আনতে লাগল এজেন্ট। একজায়গায় থমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। মিসেস লিয়ার, আঠারো নম্বর ওয়ারেন রোড, ক্যালিটো।' কিশোরের দিকে ফিরল, 'ক্যালিটো এখান থেকে বেশি দূরে না। এই মাইল দুয়েক।'

'চিনি।' পকেট থেকে নোটবুক বের করে ঠিকানা লিখে নিয়ে বলল কিশোর, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'মিস্টার হেমিলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?' উদ্বিগ্ন মনে হলো এজেন্টকে।

'না, তার আর দরকার নেই।'

এজেন্টের চোখে স্বস্তি দেখতে পেল কিশোর। নেমে এল ক্যারাভান থেকে। হাসিমুখে বন্ধুদের জানাল, 'ঠিকানা পেয়েছি।'

ক্যালিটো রওনা হলো ওরা। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ওখানে গেলে পাওয়া যাবে তো মিসেস লিয়ারকে? প্রিন্স কি তার বাড়িতেই রয়েছে?

ক্যালিটোতে আসতে সময় লাগল না। একজন পথিককে জিজ্ঞেস করতেই ওয়ারেন রোডটা দেখিয়ে দিল। পুরো রাস্তাটাই নোংরা, আশেপাশের বাড়িঘরগুলো আরও নোংরা, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ১৮ নম্বরের। জানালার পর্দাগুলো মলিন। সদর দরজার রঙ চটে বিবর্ণ হয়ে গেছে বহুকাল আগে।

বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর, 'এবারও কি আমিই যাব?'

'যাও!' সমস্বরে চিৎকার করে উঠল অন্য তিনজন।

'বেশ, টিটুকে রাখো।'

দরজায় টোকা দিল কিশোর। খুলে দিল এক মহিলা। আলুথালু বেশ, অগোছাল চুল। তাকিয়ে রইল কিশোরের দিকে।

খুব মোলায়েম ভদ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনি কি মিসেস লিয়ার?'

'না। ওই নামে কেউ এখানে থাকে না।'

একটা ধাক্কা খেল কিশোর। 'তবে কি চলে গেছে?'

'এখানে কোনকালে ওই নামে কেউ থাকত না। সতেরো বছর ধরে আমি আছি এ বাড়িতে, আমার স্বামী আর বুড়ো মায়ের সঙ্গে। এ বাড়িতে তো নয়ই, মিসেস লিয়ার নামে কেউ এই গলিতেও থাকে না।'

'আশ্চর্য!' নোটবুকের পাতার দিকে তাকাল কিশোর। 'এটাই তো আঠারো নম্বর ওয়ারেন রোড, তাই না?'

'হ্যাঁ। এক কাজ করো না কেন, পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নাও। ওরা হয়তো বলতে পারবে মিসেস লিয়ার নামে কেউ ক্যালিটোতে আছে কিনা।'

'থ্যাংকিউ। বিরক্ত করলাম।' দরজার কাছ থেকে সরে এল কিশোর, বন্ধুরা যেখানে অপেক্ষা করছে। মহিলার সঙ্গে কি কথা হয়েছে, জানাল।

দল বেঁধে পোস্ট অফিসে এল ওরা। এবারও কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেল কিশোর। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'একটা ঠিকানা দরকার আমার। ভুল ঠিকানা জেনে এসেছি। সেজন্যে খুঁজে পাচ্ছি না মহিলাকে। আপনি কি বলতে পারেন, মিসেস লিয়ার কোথায় বাস করেন?'

বড় একটা ডিরেক্টরি কিশোরের দিকে ঠেলে দিল ক্লার্ক, 'বের করে নাও।'

আগ্রহের সঙ্গে বইটা টেনে নিল কিশোর। লিয়ার পেল মোট তিনজন। সব কটাই লিখে নিল সে। ডিরেক্টরিটা আবার ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ঠিকানাগুলো বন্ধুদের দেখিয়ে বলল, 'বলো তো কোনটা হতে পারে? কাকে খুঁজছি আমরা?'

পড়ার পর একটু ভেবে বলল রবিন, 'লেডি লিয়ার হতে পারে না। প্রাসাদ ছেড়ে ক্যারাভান ভাড়া করে থাকতে যাবেন না তিনি।'

'আমারও তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'এই যে আরেকজন, মিস লিয়ার। মিস, তারমানে স্বামী নেই, বাচ্চা থাকতে পারে না। বাকি রইল এই যে এইটা, মিসেস কোরিন লিয়ার। চলো, তার সঙ্গেই দেখা করে আসি।'

এগারো

কিন্তু এখানেও হতাশ হতে হলো ওদের। মিসেস কোরিন লিয়ারের বয়েস তিরাশি, মা নন, তিনি এখন দিদিমা। ছেলেরা অনেক বড় হয়ে গেছে। তা ছাড়া কোনকালে যমজ বাচ্চা হয়নি তাঁর।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এসে একটা আইসক্রীম শপে ঢুকল গোয়েন্দারা। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে ডাবল আইসক্রীমের অর্ডার দিল কিশোর।

কি করে খুঁজে বের করা যায় মহিলাকে, সেটা নিয়ে আলোচনা চলল। ক্যারাভান ভাড়া করার সময় সে যে ভুল ঠিকানা দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই ওদের। নামটাও হয়তো ঠিক দেয়নি, বানিয়ে বলে দিয়েছে।

ফারিহা বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? যমজ বাচ্চা আছে কার কার খোঁজ নিতে পারি।'

হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল মুসা, 'দশ বছর লাগবে তাতে।'

রেগে গেল ফারিহা, 'তাহলে তুমিই একটা বুদ্ধি বাতলাও!'

'আমি পারব না,' পকেট থেকে বোতামটা বের করে টেবিলে রেখে ঘোরাতে শুরু করল মুসা। 'আমার কাছে এই একটা সূত্রই আছে।'

'তাহলে লণ্ড্রিগুলোতে গিয়ে খোঁজ নাও,' হেসে রসিকতা করল রবিন।

'ধোপাকে জিজ্ঞেস করে দেখো বোতাম ছাড়া কোন নীল-সোনালি রঙের পায়জামা ধোয়ার জন্যে দিয়েছে কিনা।'

'দরকার হলে সেটাও করতে পারি, কিন্তু যমজ বাচ্চা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।'

'আরেক কাজ করতে পারি!' জ্বলজ্বল করে উঠল ফারিহার চোখ। 'খালা বলছিল সেদিন, কোথায় নাকি একটা বেবি-শো হচ্ছে। সেখানে গিয়ে দেখতে পারি বাচ্চা দুটো আছে কিনা।'

'গেলে তুমি যাও,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'আমি ওর মধ্যে নেই। বেবি-শো, বাপরে বাপ, যে চিৎকার করে, পাগল বানিয়ে ছেড়ে দেবে!'

'তা ঠিক। বাচ্চার চেয়ে মাগুলো আরও বেশি চিৎকার করে।'

আইসক্রীম খাওয়া শেষ করে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ধীরগতিতে সাইকেল চালিয়ে রাস্তা ধরে চলল। পথের মোড়ে আসতেই একটা পোস্টার চোখে পড়ল রবিনের। চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, দেখো, কি লিখেছে!'

সবাই দেখল। বেনবারে মেলা হচ্ছে, সেখানে বেবি-শোও হবে, যমজ শিশুদের, বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

হেসে উঠল কিশোর, 'বাহ্, মেঘ না চাইতেই জল।'

বোঝা গেল, এই শো-টার কথাই আলোচনা করছিলেন মিসেস আমান।

শঙ্কিত হয়ে উঠল মুসা, 'বেবি-শো দেখার মতলব করছ না তো?'

'উপায় কি? গোয়েন্দাগিরি করতে হলে এত বাছবিচার চলে না। যেখানে সূত্র পাওয়ার আশা আছে, সেখানেই যেতে হবে।'

'চিনব কি করে কোন বাচ্চা দুটোকে খুঁজছি?' রবিনের প্রশ্ন।

'ববকে নিয়ে নেব সঙ্গে,' ঝটপট উত্তর দিল ফারিহা। 'আর বুদ্ধিটা কাজে লেগে যাওয়ায় খুশি সে।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ববকে নিতে হবে। কিন্তু পাব আর জব বাদ। এতজনকে নিলে ঝামেলা হয়ে যাবে।'

বাড়ি ফেরার পথে আলোচনা করল ওরা, কিভাবে মেলায় যাবে। আগামী কাল হচ্ছে বেবি-শো। ঠিক হলো, দুপুর দুটোয় মুসাদের বাড়িতে মিলিত হবে সবাই। সেখান থেকে মেলায় রওনা হবে। ববের জন্যে একটা সাইকেলের ব্যবস্থা করা দরকার। রবিন বলল, ওর বাবার সাইকেলটা গ্যারেজে পড়ে আছে। সেটা এনে দিতে পারবে।

ববকে খবর দিতে যাবে কে? মুসা বলল, সে যেতে রাজি আছে। সুতরাং গ্রীনহিলসে ফিরে সবাই যার যার বাড়ির দিকে চলে গেল, মুসা চলল স্কুল ক্যাম্পের মাঠে।

খবর শুনে বব তো আনন্দে আত্মহারা। বলল, ঠিক সময়ে হাজির হয়ে যাবে, এক মিনিট এদিক ওদিক হবে না।

পরদিন সেজেগুজে মুসাদের বাড়ি রওনা হলো বব। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে

গেলে চাচার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঘুরপথ ধরল সে। নদীর ধার দিয়ে গিয়ে ফেরিতে করে নদী পার হয়ে তারপর আবার গ্রামে ঢুকবে। সেখান থেকে মুসাদের বাড়ি বেশি দূরে না।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয় এই প্রবাদটা প্রমাণ করে দিয়েই যেন নদীর ধার ধরে কিছুদূর এগোতেই পড়বি তো পড় একেবারে ফগর‍্যাম্পারকটের সামনে। কাতর হয়ে প্রার্থনা শুরু করল বব, ধরণী দ্বি-ধা হও, আমি ঢুকে যাই। কিন্তু তার অনুনয়ে কর্ণপাত করল না ধরণী, ফাঁকও হলো না, তাকে লুকাতেও দিল না।

ভাতিজার সামনে এসে লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নামল ফগ, 'ঝামেলা! যারতার সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে আজ! এই, কোথায় যাচ্ছিস?'

'কোথাও না!' ভয়ে ভয়ে বলল বব।

'মিছে কথা বললে ধরে চাবকাব। যাচ্ছিস তো বটেই। যেভাব হন হন করে হাঁটছিলি, বোঝাই যাচ্ছিল, তাড়া আছে।'

ভারি একটা থাবা কাঁধ চেপে ধরল ববের। কি আর করে বেচারা। মিন মিন করে বলল, 'মুসাদের বাড়িতে।'

'এদিক দিয়ে কেন?'

'তোমার ভয়ে,' সত্যি কথাটাই বলল বব।

ভুরু কুঁচকে একটা সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল ফগ। সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা গোঁফের নিচে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, 'ঝামেলা! ভাল, গুরুজনকে ভয় পাওয়া ভাল। মুসাদের বাড়িতে কেন?'

'ওদের সঙ্গে মেলায় যাব, বেনবারের মেলায়।'

আবার ভুরু কুঁচকে গেল ফগের, 'ওখানে কি? মোটকা ছেলেটা আবার কিছু খুঁড়ে বের করেনি তো?'

'করলেই বা কি। তোমাকে বললে তো তুমি বিশ্বাস করো না, উল্টে মারতে আসো।'

'গাঁজাখুরি গল্প বললে আসব না!' ধমকে উঠল ফগ। ছেড়ে দিল ভাতিজাকে।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না বব। ছাড়া পেয়েই দৌড় দিল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ফগ।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা আগেই বেরিয়েছিল বব, সুতরাং চাচা ওকে দেরি করিয়ে দিলেও সময়মতই মুসাদের বাড়িতে পৌঁছতে পারল সে। সবার সঙ্গে মেলায় রওনা হলো। রবিনের বাবার সাইকেলটা বেশি উঁচু—বড়দের সাইকেল, চালাতে কষ্ট হলো ববের। বাধ্য হয়ে শেষে মুসার সাইকেলটা ওকে দিয়ে বড়টা নিল সে। তার পা সবার চেয়ে লম্বা, অসুবিধে হলো না।

গাঁয়ের পথ ধরে মাইলখানেক যাওয়ার পর বাঁ দিক থেকে আসা পথটায় আরেকজন সাইকেল আরোহীকে দেখা গেল। ইউনিফর্ম পরা মোটা লোকটাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলল ওরা, ফগর‍্যাম্পারকট! সেও কি মেলায় যাচ্ছে নাকি?

ফগের সঙ্গে যে নদীর পারে দেখা হয়েছে, এ কথা জানিয়েছে বব। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মেলায় যাচ্ছি যে, বলেছ নাকি তোমার চাচাকে?'

লাল হয়ে গেল বব, 'না বলে উপায় ছিল না। চড় মারত।'

'হুঁ, তারমানে আমাদেরই পিছু নিয়েছে।'

'নিক না,' রবিন বলল, 'ও তো আর বুঝতে পারবে না আমরা কি দেখতে যাচ্ছি। মেলায় সব কিছুই দেখব। কিছু সন্দেহ করতে পারবে না ফগ।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ফগকে দেখে খানিকটা মজা করার লোভ সামলাতে পারল না মুসা। বড় সাইকেলের বাস্কেটটাও বড় বলে তাতে তুলে নিয়েছে টিটুকে। ওকে নামিয়ে দিল রাস্তায়। ফিসফিস করে বলল, 'ফগকে ধর!'

না বললেও ধরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে টিটু, আর পেয়েছে নির্দেশ, সে কি আর অপেক্ষা করে। খেক খেক করতে করতে দৌড়ে গেল ফগের দিকে। ওর কাছে পৌঁছে লাফ দিয়ে দিয়ে পায়ে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

ওকে লাথি মেরে সরাতে গিয়ে ফগের হাতের হ্যাণ্ডেল গেল ঘুরে, তাল সামলাতে না পেরে পাশের খাদে পড়ে গেল সাইকেল নিয়ে। মহানন্দে নাচতে নাচতে খাদের দিকে এগোল টিটু। ডাক দিল মুসা, 'অ্যাই টিটু, আর না, আয়!'

কিন্তু আসতে চাইল না টিটু।

কিশোর ডাকল তখন, 'আয় বলছি! জলদি!'

আসল মজাটাই মাটি করে দিল, এমন একটা ভঙ্গি করল টিটু। আদেশ আর অমান্য করতে পারল না। ফগের দিকে তাকিয়ে ভ্যাক ভ্যাক করে দুটো হাঁক ছেড়ে তড়বড় করে দৌড়ে আসতে লাগল মুসার দিকে।

হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে তখন গোয়েন্দারা। ববেরও পেট ফেটে যাচ্ছে হাসিতে, কিন্তু ভয়ে হাসতে পারছে না। চাচা দেখে ফেললে পিটুনিগুলো ওর একলাই খেতে হবে।

বারো

এমন আহামরি কোন মেলা নয় ওটা। ছোট একটা মাঠে কয়েকটা তাঁবু টানিয়ে কয়েকটা শো-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে–যেমন ফাওয়ার-শো, ফ্রুট-শো, জ্যাম-শো এবং বেবি-শো। আর আছে কিছু খাবারের দোকান। ছোট এক তাঁবুতে বসে লোকের ভাগ্য গণনা করছে এক গণক।

মেলাটা শুরু হয়েছে তিন দিন আগে, তবে ফুল, ফল আর শিশুদের দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে শুধু আজকে।

'ভাগ্যিস পোস্টারটা চোখে পড়েছিল রবিনের,' ফারিহা বলল।

নানা আকারের প্রাম ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটা তাঁবুর দিকে, তাতেই বোঝা গেল বেবি-শোটা হচ্ছে কোনখানে।

'ওই দেখো,' কিশোরের হাত খামচে ধরল রবিন, 'ডাবল প্রাম! আরে, বব গেল কোথায়?'

আশেপাশে কোথাও ববকে দেখা গেল না।

একটা হাতির দিকে তাকিয়ে তখন বব ভাবছিল, চড়বে ওটাতে। আরেকবার চক্কর দিয়ে এলেই উঠে বসবে। কিন্তু ওটা সরে যেতেই দেখা গেল ওপাশে তার চাচা, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। দেখে ফেললেই কি না কি করে বসে এই ভয়ে চোখের পলকে গণকের তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল বব।

'চলো, এগোই,' কিশোর বলল, 'কোথায় আর যাবে, পেসাব করতে গেছে হয়তো। আসবে।'

বেবি-শোর তাঁবুতে ঢুকল ওরা।

চার জোড়া যমজ শিশু এসেছে।

ওরা যাদের খুঁজছে, তাদের নাম জানা আছে, সুতরাং মায়েদেরকে জিজ্ঞেস করবে ঠিক করল কিশোর। এগিয়ে গেল একটা প্রামের দিকে। ওটাতে দুটো শিশুই ছেলে। না, এটা না। তার পরেরটাতে দুটোই মেয়ে। এটাও না। ডাবল প্রামটা কই? ওই তো। হ্যাঁ, এটাতে একটা ছেলে একটা মেয়ে। মাকে জিজ্ঞেস করতে গর্বের সঙ্গে নাম বলল; বেটনি এবং ফিউডোর।

চট করে বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর। পুরোপুরি না হলেও নামে বেশ মিল আছে! প্রামটাও ডাবল। তবে কি এরাই? কিন্তু ববটা গেল কোথায়? অস্থির হয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। এখনও আসছে না কেন ও?

হুড়মুড় করে এসে তাঁবুতে ঢুকল বব।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ...' বলতে গিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল কিশোর। ববের আসতে দেরি করার কারণটা বুঝে গেল।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ফগর‍্যাম্পারকট।

ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকল সে। কুঁচকে রেখেছে ভুরু। চেঁচাতে শুরু করেছে একটা বাচ্চা। চিৎকারটা যেন সংক্রামিত করল অন্যদের মাঝে। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল আরও একটা বাচ্চা, তারপর আরেকটা। ওদের থামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে মায়েরাও চেঁচানো শুরু করল।

ভীষণ বিরক্তিতে মুখচোখ কুঁচকে ফেলল ফগ। কানে আঙুল দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একটা প্রামের সামনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। কয়েকজন মহিলা জটলা করছে একধারে, তাদের পেছনে সরে গেল গোয়েন্দারা, ফগ যাতে দেখতে না পায়। এক এক করে সব কটা প্রাম দেখে বেরিয়ে গেল সে।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়েছিল দু'চারজন মহিলা। পুলিশের আগমন পছন্দ হচ্ছিল না ওদের। বেরিয়ে যেতেই চেহারা স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার।

ডাবল প্রামটার সামনে ববকে টেনে নিয়ে এল কিশোর। জিজ্ঞেস করল,

'দেখো তো, এরাই নাকি?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল বব। বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল। 'চিনতে পারছি না! সবগুলো বাচ্চাকে একরকম লাগছে আমার কাছে!'

'তোমাকে এনে তাহলে লাভটা কি হলো?' রেগে উঠল মুসা। 'মাঝখান থেকে ফগর‍্যাম্পারকটের ঝামেলা!'

মুখ কাঁচুমাচু করে ফেলল বব।

হাত তুলল কিশোর, 'থাক- মুসা, ওকে ধমকানোর দরকার নেই। চেনা আসলেই কঠিন।'

বেবি-শোতে এসে কাজ হলো না। ভুল হয়ে গেছে, ভাবল কিশোর। ববকে না এনে বরং জবকে আনা উচিত ছিল।

কি আর করা। হতাশ হয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ওরা। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল এখানে ওখানে। এর মধ্যে কয়েকবার ফগকে নজরে পড়ল ওদের। ববের সব আনন্দ মাটি হয়ে গেছে। চাচার ভয়ে কিছুই করতে পারল না সে। কোন খেলাতে অংশ গ্রহণ করতে পারল না।

গোয়েন্দারাও তেমন মজার কিছু খুঁজে পেল না। বিরক্ত হয়ে শেষে মুসা বলল, 'চলো, যাইগে। বাড়িতেও তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার, মা বলে দিয়েছে।'

ফেরার পথে শর্টকাটে যাওয়ার জন্যে মাঠের ভেতরের কোণাকুণি পথ ধরল ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পর চোখে পড়ল ক্যারাভানগুলো। মেলার লোকদের থাকার জায়গা। প্রায় গাদাগাদি করে রয়েছে একখানে। দড়িতে শুকাতে দেয়া হয়েছে ভেজা কাপড়। অলস দৃষ্টিতে সেগুলোর দিকে তাকাল মুসা। হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল।

আরেকটু হলেই তার গায়ের ওপর এসে পড়েছিল কিশোর। 'কি হলো?'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। নীরবে হাত তুলে দেখাল।

কিশোরেরও চোখে পড়ল জিনিসটা। কয়েকটা ব্লাউজ শুকাতে দেয়া হয়েছে দড়িতে। একটা ব্লাউজের বোতামগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মুসার। তার পকেটে যে বোতামটা আছে, প্রিন্স ঘুটাংকাউয়ার পিপিং ব্যাগে পেয়েছিল, অবিকল সেরকম।

সাইকেল রেখে এগিয়ে গেল মুসা। পকেট থেকে বোতামটা বের করে মিলিয়ে দেখল। কোন তফাৎ নেই।

পাশের ক্যারাভানটার দিকে তাকাল সে। সবুজ রঙ করা, চাকাগুলো হলুদ। কাপড় শুকাতে দিয়েছে যে সে নিশ্চয় ওই ক্যারাভানেই বাস করে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বাকি সবাই। তাড়াতাড়ি ওদের কাছে ফিরে এল মুসা। উত্তেজিত হয়ে বলল, 'অবিকল একরকম বোতাম!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'বুঝতে পেরেছি। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে পায়জামা নষ্ট করে ফেলেছে, কিন্তু বোতামগুলোর মায়া ছাড়তে পারেনি, ব্লাউজে লাগিয়ে

নিয়েছে। ভেবেছে কারও চোখে পড়বে না।'

'মানেটা কি দাঁড়াল?' রবিনের প্রশ্ন।

'মানেটা দাঁড়াল এই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'আশেপাশেই কোনখানে আছে প্রিন্স। ওই ক্যারাভানটাতেও থাকতে পারে। দেখা দরকার।'

'এখন?' ঘড়ি দেখল মুসা, 'কিন্তু এখন তো সময় নেই। ছটার আগে ফিরতে বলে দিয়েছে মা। ঠিক ছটায় আমাকে আর ফারিহাকে নিয়ে কোথায় বেরোবে। দেরি করতে পারব না।'

'কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই,' এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'বাড়ি গিয়ে ছদ্মবেশ নিয়ে আবার আসব আমি।'

'আমিও আসব তোমার সঙ্গে,' বব বলল।

'না। এসব কাজে লোক যত কম হয়, তত ভাল। তোমাদের কারও আসার দরকার নেই, আমি আসব শুধু, একা।'

তেরো

বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকল কিশোর। আবার যখন বেরিয়ে এল, চেনা যাচ্ছে না ওকে। নোংরা, দাঁত উঁচু, কুৎসিত চেহারার এক মাঝবয়েসী ফেরিওয়ালা যেন চলেছে রাস্তা ধরে। সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসানো ঝাঁকাটায় রয়েছে নানা রকম টোটকা ওষুধের শিশি-বোতল, ঠাণ্ডা লাগা থেকে আঁচিল সারানোর উপযোগী সব ধরনের ওষুধ রয়েছে সেগুলোতে।

বেনবারে ফিরে চলেছে সে।

পথে কোন বাধা না থাকায় সময় বেশি লাগল না। আবার মেলায় ঢুকল সে। ক্যারাভানটায় কে থাকে সেটা আগে জেনে নেয়া দরকার। সন্ধ্যার আগে আগে এখন ভিড় অনেক বেড়েছে। স্টল মালিক আর নানা রকম খেলার সরঞ্জাম পেতে বসেছে যারা, সবাই ব্যস্ত। কার সঙ্গে কথা বলা যায়?

মেরি-গো-রাউণ্ড নিয়ে যে লোকটা এসেছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এক কিশোরকে। বোঝা গেল, মালিকের ছেলে সে। তার বাপ ব্যস্ত রয়েছে মেশিনটার কাছে, হাতল চেপে ধরে আছে। ছেলেটার তেমন কোন কাজ নেই, টিকেট দিয়ে টাকা নেয়া ছাড়া। ওর কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। খাতির করে নিতে দেরি হলো না। তারপর বলল, 'দূরের গ্রাম থেকে এসেছি আমি। মেলায় কিছু ওষুধপত্র বেচার ইচ্ছে। কিন্তু রাত কাটানোর জায়গা পাচ্ছি না। এখানে আমার এক আত্মীয়ও এসেছে। ক্যারাভানে করে। নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। ভাবছি, তার ওখানে উঠব। তুমি কোন সাহায্য করতে পারবে, ভাই?'

'ক্যারাভানটার কি রঙ, বলতে পারবে?'

ভান করল কিশোর যেন মনে করার চেষ্টা করছে। ইচ্ছে করে ভুল বলল, 'হলুদ গা, সবুজ চাকা।'

'ও রঙের তো কোন ক্যারাভান নেই, তবে সবুজ গা হলুদ চাকাওয়ালা একটা আছে।'

'তাও হতে পারে। কারা কারা থাকে?'

'এক বুড়ি, মিসেস জুলিয়া কোবরান, আর বিলি। সংসারের কর্তা অ্যালেক্স কোবরান আপাতত নেই ওখানে, কাজে গেছে।'

'না, ওরা আমার আত্মীয় নয়। তবু যাই, দেখি, ওদের সঙ্গে কথা বলে, কোন ব্যবস্থা হয় কিনা। ক্যারাভানগুলো আছে কোনখানে?'

'গেট দিয়ে বেরিয়ে যাও। বাঁয়ে গেলে দেখবে মাঠের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা গেছে, ওটা ধরে কিছুদূর এগোলেই ক্যারাভানগুলো দেখতে পাবে।'

ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিয়ে সরে এল কিশোর। এখানে আর কিছু জানার নেই। মেলা থেকে বেরিয়ে সোজা মাঠের দিকে চলল, ক্যারাভানগুলো যেখানে আছে।

ওর তো জানাই আছে, কোথায় আছে ক্যারাভান। কাছাকাছি আসতে দেখল সবুজটার সামনে পুরানো একটা বেতের চেয়ারে বসে আছে এক বৃদ্ধা। চিৎকার করে বলছে, 'বিলি, এই বিলি? গেল কোথায় হতভাগাটা। আরে এই বিলি! ধরে একদিন এমন বেতান বেতাবো না...' ককাতে লাগল, 'ওফ্, মাগো, কোমরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে! এই ব্যথা আর সারবে না...' কিশোরের ওপর চোখ পড়তে ধমকে উঠল, 'এই, কি চাই! এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?'

'ঘুরঘুর করছি না,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'আমি ওষুধ বেচি।'

'কিসের ওষুধ?'

'যা চান। বাতের ওষুধও দিতে পারি, শরীরের যেখানে যত ব্যথা আছে সব সেরে যাবে।'

'সত্যি! আছে? যাবে তো?'

'একেবারে ধন্বন্তরি। খেয়েই দেখুন না একশিশি।'

একটা বোতল বের করে দিল কিশোর। তাতে লাল রঙের তরল পদার্থ। নানা রঙের শরবত বানিয়ে, কোনটাকে কম মিষ্টি, কোনটাতে বেশি মিষ্টি, কোনটাতে খানিকটা কুইনিন মিশিয়ে ওষুধ বানিয়েছে সে। খেলে কারুরই কোন উপকার হবে না বটে, ক্ষতিও হবে না।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল বৃদ্ধা। জিজ্ঞেস করল, 'কত দাম?'

'দামের কথা ছাড়ুন। খেয়ে দেখুন আগে কাজ হয় কিনা। হলে পরে যা ইচ্ছে দেবেন। আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, সেজন্যেই দিলাম।'

খুশি হলো বৃদ্ধা। 'খুব ভাল মানুষ তো হে তুমি। আজকাল তো মায়াদয়া লোকের একেবারে উঠেই গেছে। বুড়ি হয়েছি তো, আপনজনেরাও আর দেখতে পারে না, দূর দূর ছ্যা ছ্যা করে। বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ক্যারাভানটার দিকে তাকাল কিশোর, 'আর কে কে থাকে আপনার সঙ্গে?'

'জুলিয়া আর আমার ছেলে অ্যালেক্স, আর বিলি।'

'বিলিটা কে?'

'আমি,' লাফ দিয়ে ক্যারাভানের ছাত থেকে নেমে এল এক কিশোর। কোমরে দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?' কিশোরকে বড় মানুষ মনে করেছে সে।

'এই শয়তান, কোথায় ছিলি এতক্ষণ!' ধমক দিয়ে বলল বৃদ্ধা। 'আমি যে ডাকছি, কানে যায় না?'

'ঘুমিয়ে ছিলাম,' বলল বিলি।

'ফের মিছে কথা! বেতিয়ে পিঠ লাল করে দেব! জানালার কাঁচগুলো মুছতে বলেছি, তাই গিয়ে লুকিয়েছিস! এই শয়তানটাকে যে কেন আনতে গেল আমার ছেলে···ওই বউটার পরামর্শে, আর কিছু না। নিজেদেরই জোটে না, আরেকটা উটকো ঝামেলা নিয়ে এসেছে কোত্থেকে।' গজ গজ করতে লাগল বৃদ্ধা।

'এনেছে কি আর সাধে?' মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিল বিলি। 'আমাকে দিয়ে কাজ হয় তোমার ছেলের, সেজন্যে এনেছে।'

ব্যাপারটা বেশ মজার মনে হলো কিশোরের। 'তুমি মিস্টার কোবরানের ছেলে নও?'

'ওর ছেলে হলে কি আর এত বেতমিজ হত নাকি!' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল বৃদ্ধা। 'দেখছ না কেমন মুখে মুখে তর্ক করে। ওর মায়ের আরও এগারোটা ছেলে আছে, এটাকে বিদেয় করতে পেরে বেঁচেছে। একটা তো কমল। হুঁহ্, খাওয়ানোর মুরোদ নেই, খালি বাচ্চা পয়দা করা! আর আমার ছেলেটাও হয়েছে যেমন, নিজেদের ছেলেপুলে হয় না, বউয়ের কথায় সুড়সুড় করে গিয়ে একটা পালক নিয়ে এসেছে।'

ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার বয়েস কতো?'

'এগারো।'

'আরও ভাইবোন আছে?'

'আছে। মোট এগারোজন। শেষ দুটো যমজ।'

কান খাড়া হয়ে গেল কিশোরের।

'যমজ! বয়েস কতো?'

'জানি না। শিশু।'

'তুমি ওদের দেখতে যাও?'

'আমার ঠেকা পড়েছে। আমাকে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে, আমি কেন দেখতে যাব। কয়েক দিন আগে যমজ দুটো এসে থেকেছে আমাদের সঙ্গে, খালার কাছে।'

'এখন কোথায়?'

'ফেরত দিয়ে এসেছে খালা।'

বিলির কাছে মূল্যবান তথ্য আছে, বুঝতে পারল কিশোর। সব কথা আদায়

করতে হবে এর কাছ থেকে। 'এত উসখুস করছ কেন?'

'করবে না,' বৃদ্ধা বলল, 'শয়তানের ডিম! একজায়গায় স্থির থাকতে পারে নাকি!'

'আমি কি করব, আমার খিদে পেয়েছে,' বিলি বলল। 'খাবার পেলেই তো চুপ করে থাকি।'

'আমি খাবার নিয়ে বসে আছি নাকি তোর জন্যে!'

পকেট থেকে কিছু পয়সা বের করে দিল কিশোর। 'নাও, খাবার নিয়ে এসো।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে কিশোরের হাতের পয়সাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। সত্যি সত্যি দিচ্ছে? বিশ্বাস করতে পারছে না।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'কি হলো, নাও।'

প্রায় ছোঁ মেরে পয়সাগুলো নিয়ে দৌড়ে চলে গেল বিলি। পেছন থেকে ডেকে বলল কিশোর, 'আমাদের তিনজনের জন্যে আনবে।'

'তুমি খুব ভাল লোক, বাবা,' কিশোরকে বলল আবার বুড়ি। 'বুঝতে পারছি, আমাদের মতই গরীব। ওষুধ বেচে আর ক'পয়সা পাও, তবে দিলটা অনেক বড় তোমার।'

'চলুন, ক্যারাভানের ভেতর গিয়ে বসি, এখানে ঠাণ্ডা লাগবে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বৃদ্ধাকে সাহায্য করল কিশোর, তাতে আরও খুশি হলো সে। কৃতজ্ঞ হয়ে গেল।

খাবার নিয়ে ফিরে এল বিলি।

প্যাকেট খুলে শুধু একটা স্যান্ডউইচ বের করে নিয়ে বাকি সব খাবার বৃদ্ধা আর বিলিকে দিয়ে দিল কিশোর।

গোগ্রাসে গিলতে শুরু করল বিলি।

আবার আগের প্রসঙ্গ তুলল কিশোর, 'তোমার যমজ ভাইবোনেরা কোথায় থেকেছে, এই ক্যারাভানে? এখানে জায়গা কোথায়।'

'এখানে মাত্র একদিন থেকেছে খালার সঙ্গে, কোনমতে। তারপর চলে গেছে স্কুলের ক্যাম্প করেছে যে মাঠে, সেখানে।'

চিবানো বন্ধ হয়ে গেল কিশোরের। বুঝতে পারছে জুলিয়াকেই খালা ডাকে বিলি। তারমানে ওর ভাইবোনদেরই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্যাম্পের ক্যারাভানে। জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোমার ভাইবোনদের?'

'বেটি আর ফিডেল।'

যা বোঝার বুঝে গেল কিশোর। চুপচাপ খাবার চিবাল কিছুক্ষণ। ভাবল। বিলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে দিয়ে মিস্টার কোবরানের কাজ হয় বললে, কি কাজ হয়? কি করায় ও?'

চুপ করে রইল বিলি। জবাব দিতে দ্বিধা করছে। ওকে রাগিয়ে দিয়ে কথা আদায়ের জন্যে খোঁচা দিয়ে বলল, 'কাঁচ মোছা ছাড়া আর কি করার ক্ষমতা আছে তোমার?'

'নেই মানে! আমি অভিনয় করতে পারি। অ্যালেক্স খালু কানা ফকির সাজে, আমি তার সহকারী হয়ে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াই লোকের কাছে। আমার কান্নাকাটিতে গলে গিয়ে পয়সা দেয় লোকে। খালার সঙ্গে দোকানে যাই। দোকানদারকে ব্যস্ত রাখে খালা, ওই সুযোগে এটা ওটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরে ফেলি আমি।'

'আর কি করো?'

'অনেক কিছুই। যখন যেটা করতে বলে খালা কিংবা খালু। প্রিন্সও সেজেছি।'

এতটা চমকে উঠল কিশোর, গলায় আটকে গেল খাবার। কাশি দিয়ে পরিষ্কার করে নিল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। 'প্রিন্স!'

'কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? চোর হলেও আমি ছেলে খারাপ নই। মিথ্যে কথা বলি না।'

'আমারও তাই ধারণা,' সামলে নিয়েছে কিশোর। 'তা কোন দেশের প্রিন্স সাজলে?'

ওদের কোন কথায় তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না বৃদ্ধা। ছেলে আর ছেলের বউয়ের কুকর্মের কথা বোধহয় অজানা নয় তার। নীরবে খেয়ে চলেছে। ভাল খাবার যে সচরাচর জোটে না, খাওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'কাউকে বলে দেবেন না তো?' ছেলেটা বলল। 'না, মনে হয় না বলবেন। আপনাকে ভাল মানুষই মনে হচ্ছে। পত্রিকায় দেখেননি প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া নিখোঁজ হয়েছে? আমিই সেই প্রিন্স।'

'গুল মারছ না তো? তা কি করে হয়?'

'হয়, খুব ভাল করেই হয়, কারণ সেকাজটা করে এসেছি আমি। ক্যাম্পে গিয়ে কয়েকদিন থেকেছি, অন্য ছেলেদের সামনে যা মুখে আসে তাই বলে বিদেশী ভাষা বলার ভান করেছি, তারপর উধাও হয়ে গেছি একরাতে। সবাই মনে করেছে আমাকে বুঝি কিডন্যাপ করা হয়েছে। মোটেও তা নয়। রাতে চুপচাপ পাতাবাহারের বেড়া ফাঁক করে অন্য পাশে এসে ক্যারাভানে রাত কাটিয়েছি। সকালে উঠে লুকিয়ে পড়েছি গ্রামের ভেতর। আমার ওপর চাদর বিছিয়ে তার ওপর বেট আর ফিডেলকে বসিয়ে দিয়েছে খালা। উফ্, যা জ্বালাতন করেছে বিচ্ছুদুটো! সারাক্ষণ কানের কাছে চিৎকার! একটা আমার গায়ে দুইবার মুতেছে, আরেকটা হেগে দিয়েছে!'

হেসে ফেলল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল ঠেলে থাকা দাঁত।

'আপনার দাঁতগুলো কিন্তু একটুও ভাল না,' বিলি বলল। 'বিচ্ছিরি! খরগোশের দাঁতের চেয়ে খারাপ।'

ছেলেটার এই সহজ-সরল স্বীকারোক্তি ভাল লাগল কিশোরের। বলল, 'কি আর করব, ঈশ্বর যেমন দিয়েছেন।'

চেটেপুটে খেয়ে শেষ করল বিলি।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ভাল লেগেছে?'

মাথা ঝাঁকাল বিলি।

'পেট ভরেছে?'

'আরও খেতে পারব।'

'পারবিই তো, হাভাতে রাক্ষস কোথাকার!' এতক্ষণে কথা বলল বৃদ্ধা।

তার কথায় কান দিল না বিলি। ফেরিওয়ালার আগ্রহটা বুঝে গেছে। বলল, 'ক্যাণ্ডি খাওয়ালে আরও অনেক কথা বলতে পারি।' কিশোরের কাছাকাছি সরে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আসল প্রিন্স কোথায় আছে, তাও জানি আমি। কিন্তু কথা দিতে হবে, আমি যে বলেছি একথা কখনও বলতে পারবেন না আমার খালুকে। মেরে হাড্ডি ভেঙে দেবে তাহলে।'

চোদ্দ

এতটাই অবাক হলো কিশোর পুরো পনেরো সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না, তাকিয়ে রইল বিলির দিকে। ওকে অবাক করে দিতে পেরে আনন্দ পেল বিলি।

বৃদ্ধার দিকে তাকাল কিশোর। খেয়েদেয়ে ঢুলতে আরম্ভ করেছে। ওদের কথায় কান দেয়ার মত অবস্থা নেই। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল কিশোর, 'এই ক্যারাভানে নেই ও, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কোথায়?'

'খালু ভেবেছে, আমি বুঝি কিছু জানি না, কিন্তু জেনে ফেলেছি।'

পকেট থেকে আরও কিছু পয়সা বের করে দিল কিশোর, 'নাও, ক্যাণ্ডি খাওয়ার জন্যে দিলাম। বলো এখন, কোথায় আছে ও?'

'ডেভিলস মার্শ। ডিক ফ্র্যানসিসের সঙ্গে বলার সময় আমি শুনে ফেলেছি।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'জানি না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল কিশোর, 'ঠিক আছে, এবার বলো, তোমাকে প্রিন্স সাজানো হলো কেন? লুকিয়ে বের করেই বা আনা হলো কেন?'

'এই সহজ ব্যাপারটা বুঝলেন না,' হাসল বিলি। 'কেউ একজন চায় আসল প্রিন্সকে সরিয়ে দিতে, যাতে সিংহাসন দখল করতে কোন অসুবিধে না হয় তার। এবার বুঝলেন?'

'না।'

'নাহ্, আপনি বোকা,' কৃত্রিম আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিলি। 'খালু বলছিল, কিডন্যাপ করার সাথে সাথে যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে এদেশ থেকে ওকে বের করে নিয়ে যেতে ঝামেলা হবে। গাড়িতে করে প্রিন্সকে স্কুল ক্যাম্পাসে নেয়ার সময় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে দেয় শোফার। ওখানে প্রিন্সকে নামিয়ে আরেকটা গাড়িতে তোলা হয়। তার জায়গায় প্রিন্স সেজে আমি উঠে বসি। এবার বুঝলেন কিছু?'

হ্যাঁ, এবার বুঝে ফেলল কিশোর। কেউ একজন প্রিন্সকে পথের কাঁটা ভেবে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এদেশ থেকে ওকে নিরাপদ কোথাও পার করে না নেয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাজানি করতে চায়নি, তাই আসল প্রিন্সের জায়গায় নকল প্রিন্সকে পৌঁছে দিয়েছে স্কুল ক্যাম্পাসে। এজন্যে শোফারকে হাত করতে হয়েছে। ক্যাম্পে গিয়ে কিছুদিন প্রিন্সের অভিনয় করেছে বিলি, তারপর সুযোগ এবং সময়মত কেটে পড়েছে। পুলিশকে বোঝাতে চেয়েছে এটাই আসল কিডন্যাপিং।

'দারুণ একখান প্ল্যান করেছে তো তোমার খালু! অনেক টাকা পাবে নিশ্চয়?'

'সে তো বটেই। আমাকেই পাঁচশো ডলার দেবে বলেছে।'

'এত টাকা দিয়ে কি করবে তুমি?'

'স্কুলে ভর্তি হব। লেখাপড়া করব। এসব চুরিদারি, ভিক্ষে করা আর ভাল লাগে না।'

'ভাল কাজ নয়, তাই লাগে না। আচ্ছা, প্রিন্সের অভিনয় করতে কোন অসুবিধে হয়নি তোমার?'

কাশতে আরম্ভ করল বৃদ্ধা। জেগে গেল। কিশোরের দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বিলি বলল, 'তা হয়নি। প্রিন্সের গায়ের রঙের সঙ্গে আমার নাকি মিল আছে, সেজন্যেই আমাকে বেছে নেয়া হয়েছে। বয়েসও এক। তা ছাড়া বিদেশী ভাষা তো আর বলতে হয়নি, হেরেং বেরেং করে যা মুখে এসেছে তাই বলেছি। বিশাল ছাতাটা একবার মাথায় দেয়ার চেষ্টা করেছি। ওই একবারই। আক্কেল হয়ে গেছে আমার। তারপর আর চেষ্টা করিনি।'

'প্রিন্স সাজতে কেমন লেগেছে তোমার?'

'খারাপ না। পায়জামাগুলো পরতে যা আরাম, আর পিপিং ব্যাগটার তো কোন তুলনাই হয় না। ওখান থেকে চলে আসার পর পায়জামাটা নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল খালা, কিন্তু বোতামগুলো এত সুন্দর, নষ্ট করতে মন চাইল না। নিজের একটা ব্লাউজে লাগাল।'

মনে মনে ভাবল কিশোর, ভাগ্যিস লাগিয়েছিল। নইলে এত সহজে খুঁজে বের করতে পারত না মহিলাকে।

'ভয় করেনি? ধরা পড়ে যেতে পারতে।'

'করেছে। তবে খালা বলেছে, অভিনয় নাকি ভালই করেছি আমি। বেশি ভয় পেয়েছি একটা কথা ভেবে, প্রিন্সকে চেনে এমন কেউ যদি চলে আসে দেখা করতে! অবশ্য তৈরি ছিলাম। ওরকম কেউ এলেই দিতাম দৌড়।'

আবার খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'প্রিন্সকে কি এখনও ডেভিল মাঁশেই রাখা হয়েছে?'

'তা বলতে পারব না।'

আর কিছু বলার নেই বিলির, বুঝতে পারল কিশোর। তবে যা জেনেছে, যথেষ্ট, এতটা জানতে পারবে কল্পনাও করেনি। উঠে দাঁড়াল সে। 'ঠিক আছে,

আজ যাই। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, বিলি।'

'যাই' শব্দটা বোধহয় কানে গেল বৃদ্ধার। চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'যাচ্ছ? ভাল লোক তুমি, তোমার কথা মনে থাকবে। তা ওষুধটা কতবার কিভাবে খাব, বললে না তো!'

'ওটা আর খাওয়ার দরকার নেই, বুড়িমা,' বলে বুড়ির হাতের কাছে রাখা বোতলটা তুলে নিল কিশোর। 'এখন মনে হচ্ছে এতে আর কাজ হবে না আপনার। তারচেয়ে বরং এটা রাখুন, ভাল একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ কিনে খাবেন।' পকেট থেকে দশ ডলারের একটা নোট বের করে বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

হাঁ হয়ে গেল বৃদ্ধা। বিশ্বাস করতে পারল না, জেগে রয়েছে, না স্বপ্ন দেখছে তাকে ওই অবস্থায় রেখেই বেরিয়ে এল কিশোর।

দরজায় এসে দাঁড়াল বিলি, 'আমার খালার সঙ্গে দেখা করবেন না?'

'আরেক দিন। আজ সময় নেই।'

অন্ধকার হয়ে এসেছে। সাইকেলে চেপে বাড়ি রওনা হলো কিশোর।

মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠতে উঠতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। গাছপালার ভেতর দিয়ে গেছে পথ। দশহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। তাড়াহুড়া করে বেরিয়েছিল, সাইকেলের ল্যাম্পটা নিতে মনে ছিল না।

গ্রীনহিলসে ঢোকার মুখে রাস্তায় একটা মোড় আছে। সেটার ওপাশে আসতেই পথের ধারের বেঞ্চে বসা বিশাল একটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল, 'ঝামেলা! এই এই, থামো! আলো কোথায় তোমার? জানো না, অন্ধকারে বাতি ছাড়া সাইকেল চালানো বেআইনী?'

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। যতটা না ভয়ে তার চেয়ে কর্কশ চিৎকারে। প্রিন্সের কেসটা নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, আচমকা চিৎকার ভীষণ ভাবে চমকে গেল। রাস্তার ধারে বসে ডিউটি দিচ্ছিল ফগ, বাতিহীন সাইকেল দেখে ডাক দিয়েছে।

এগিয়ে এল ফগ। টর্চের আলো ফেলল কিশোরের মুখে। 'কে তুমি? দেখে তো চোর মনে হচ্ছে! এত দামী সাইকেল পেলে কোথায়?'

সামলে নিয়েছে কিশোর। মনে মনে হাসল। তার বিবর্ণ, প্রায় বাতিল পোশাকের সঙ্গে সাইকেলটা মেলাতে পারছে না ফগ। ওকে দোষ দিতে পারল না।

'চুপ করে আছো কেন? এ এলাকায় তো আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। কণ্ঠস্বর বদলে খসখসে স্বরে বলল, 'সাইকেলটা একটু ধরবেন, জুতোর ফিতে বেঁধে নিই।'

হাত বাড়িয়ে দিল ফগ। ও সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরতে না ধরতেই কিশোর দিল দৌড়।

'ঝামেলা!' চিৎকার করে উঠল ফগ। 'এই থামো, থামো বলছি!'

কিন্তু থামল না কিশোর।

ওর সাইকেলটায় করেই ওকে তাড়া করল ফগ।

রাস্তা থেকে পাশের উঁচুনিচু জমিতে নেমে পড়ল কিশোর। দৌড়াতে লাগল।

এরকম জায়গায় সাইকেল চলবে না। ওটা ফেলে যে তাড়া করবে, সেব্যাপারে মনস্থির করতেও দেরি করে ফেলল ফগ। ততক্ষণে বনের আড়ালে হারিয়ে গেল কিশোর।

পনেরো

সাইকেলটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ফগ। ও নিশ্চিত হয়ে গেছে, এটা চোরাই মাল। কারও সাইকেল চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল ভবঘুরেটা। সে সামনে না পড়লে পালিয়ে যেত।

খুশিমনে গোঁফে তা দিল ফগ। যাক, একটা ক্লাজের কাজ করা গেছে। চোরটাকে ধরতে পারেনি বলে মনের কোণে যদিও একটু আফসোস রয়ে গেছে।

আরাম করে চেয়ারে বসে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে ফগ, এই সময় বাজল ফোন। রিসিভার তুলে নিল সে, 'হালো, ফগর‍্যাম্পারকট।'

'আমি কিশোর পাশা। একটা চুরির রিপোর্ট করব। আমার সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে। যদিও জানি ওটা খুঁজে বের করতে পারবেন না আপনি, চোর ধরারও সাধ্য নেই, তবু রিপোর্ট করার নিয়ম, তাই করছি।'

গোল গোল চোখ বড় হয়ে গেল ফগের। ভাবল, তাই তো বলি, সাইকেলটা চেনা চেনা লাগে কেন! বিমল হাসি ফুটল গোঁফের কোণে। খোঁচা দিয়ে কথা বলার জবাবটা দিল সে, 'আমার কাছে আলাদিনের চেরাগ আছে। এসো আমার বাড়িতে। আমি ফুঁ দেব, আর অমনি উড়ে এসে হাজির হবে তোমার সাইকেল।'

'এটা খুব শস্তা রসিকতা হলো। হাসতে পারলাম না, দুঃখিত।'

'কষ্ট করে একবার এসোই না আমার বাড়িতে, জাদু কাকে বলে দেখিয়ে দেব।'

'সত্যি আসতে বলছেন?'

'বলছি,' লাইন কেটে দিল ফগ। সাইকেল দেখলে কিশোর পাশার চমকে যাওয়া মুখটা কল্পনা করে আপনমনেই হাসল। এই সাফল্যের জন্যে নিজেকে পুরস্কৃত করল আরেক কাপ গরম চা দিয়ে।

আধঘণ্টা পরই সদর দরজার ঘণ্টা বাজল তার।

বাড়ি গিয়ে আগে ছদ্মবেশ খুলেছে কিশোর। তারপর ফোন করেছে ফগকে। চাচা-চাচী ঘরে নেই, কোথাও বেরিয়েছে, তাতে সুবিধে হলো ওর। কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো না। ফোন করার পর ধীরেসুস্থে জামাকাপড় পরল। তারপর

হেঁটে রওনা হলো ফগের বাড়িতে।

হাসিমুখে দরজা খুলে দিল ফগ। নাটকীয় ভঙ্গিতে স্বাগত জানিয়ে কিশোরকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। সাইকেলটা দেখিয়ে বলল, 'কি, বলেছিলাম না, আলাদিনের চেরাগ আছে আমার কাছে?'

অবাক হওয়ার ভান করে বলল কিশোর, 'ও মা, তাই তো! নাহ্, শুধু শুধু আপনাকে এতদিন অপদার্থ বলেছি আমরা। আসলে আপনি দারুণ কাজের লোক।' অপদার্থ বলাতে ফগের গাল লাল হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার একটা উপকার করেছেন আপনি। বিনিময়ে একটা খবর দিতে পারি আপনাকে। প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া কোথায় আছে বলতে পারি। সে এখন আছে ডেভিলস মার্শে, বন্দি।'

কঠিন হয়ে গেল ফগের মুখ, 'থাক, তোমার মুখ থেকে আর প্রিন্সের খবর শুনতে চাই না। আবার কোন ফাঁদে জড়িয়ে অপদস্থ করাবে আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে।'

'না, এবার সত্যি কথাই বলছি, বিশ্বাস করুন।'

'তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করব না।'

'আমার কথা শুনেই দেখুন এবার, ঠকবেন না। আসল প্রিন্সকে কিডন্যাপ করে একটা জিপসি ছেলেকে প্রিন্স সাজিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল স্কুল ক্যাম্পে। পরে সুযোগ বুঝে ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে ছেলেটাকে। বুঝতে পারছেন কিছু?'

'না, পারছি না, পারার চেষ্টাও করব না,' ধমকে উঠল ফগ। 'তোমার সাইকেল পেয়েছ, ঝামেলা না করে এখান থেকে বেরোও। কোন গল্প শুনিয়েই আমাকে আর বোকা বানাতে পারবে না।'

'সাহায্য করতে চাইলাম, শুনলেন না, কি আর করা...'

'তুমি এখন যাও!'

দরজার বাইরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'সাইকেল চোরের কোন খোঁজ পেয়েছেন?'

'না,' গোমড়ামুখে বলল ফগ।

'আপনাকে একটা সূত্র দিতে পারি। জুতোর ফিতে বাঁধার কথা বলে চোরটা আপনার হাতে সাইকেল ধরিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল।'

'ঝামেলা! তুমি জানলে কি করে?'

'আমার কাছেও আলাদিনে জিন আছে। সে-ই খবর দিয়েছে আমাকে,' বলে একলাফে সাইকেলে উঠে সোজা ছুটে গেল গেটের দিকে।

এতক্ষণে বুঝল ফগ-কিশোর পাশাই ভবঘুরের ছদ্মবেশ নিয়েছিল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। দু'আঙুলে টিপে ধরল কপাল। আবার তাকে মস্ত এক ফাঁকি দিয়ে গেল অসম্ভব ধূর্ত ছেলেটা! ক্যাপ্টেনের কাছে বলে না দিলেই হয়!

কয়েক মিনিট পর আবার বাজল ফোন। কটমট করে রিসিভারের দিকে

তাকাল সে। ভাবল, রাতটা পার করার সময়টুকুও দিতে চায় না কিশোর, বাড়ি পৌঁছেই টিটকারি মারার জন্যে ফোন করেছে।

থাবা দিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ফগ।

'কে, ফগর‍্যাম্পারকট? হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি। জরুরী মেসেজ আছে। আমরা খবর পেয়েছি, স্কুল থেকে যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সে আসল প্রিন্স নয়, অন্য কেউ। আসল প্রিন্সের ছবি দেখানো হয়েছে স্কুল ক্যাম্পের অনেককে, ওরা বলছে তাঁবুতে যে ছেলেটা ছিল তার সঙ্গে ছবির ছেলেটার চেহারার অনেক অমিল। তোমাকে আরও ভালমত খোঁজ নিতে বলেছেন ক্যাপ্টেন।'

রিসিভার কানে চেপে ধরে রেখেছে ফগ। নামাতেও ভুলে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে।

'ফগর‍্যাম্পারকট, আমার কথা শুনছ?' ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।

'অ্যাঁ! ঝামেলা! হ্যাঁ, শুনছি!' বাস্তবে ফিরে এল ফগ। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোঁজ নিয়ে আমি ক্যাপ্টেনকে রিপোর্ট করব।"

'ও-কে,' লাইন কেটে দিল অফিসার।

খুব ধীরে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল ফগ। ববের কথা সেদিন বিশ্বাস না করায় মনে মনে এখন গালাগাল করতে লাগল নিজেকে। তারমানে সত্যিই বলেছিল বব। প্রামে করে পার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নকল প্রিন্সকে।

কিশোরের কথা মনে পড়ল। খানিক আগে সেও একই কথা বলে গেছে। সেই সঙ্গে আরও একটা কথা বলেছে, আসল প্রিন্সকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ডেভিলস মার্শে।

কথাটা কি বিশ্বাস করবে? নাকি আবার ধোঁকা খাবে? মনস্থির করতে পারল না সে। একবার ভাবছে যাবে, আবার ভাবছে যাবে না। এরকম করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। হঠাৎ মনস্থির করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। না, যাবে। গিয়ে বোকা বনলে অসুবিধে নেই। রাতে রাতেই ফিরে আসতে পারবে। কিশোর পাশা জানতেই পারবে না যে সে গিয়েছিল। কারণ যদি সত্যি কথা বলে গিয়ে থাকে কিশোর, আর সেটা জানতে পারেন ক্যাপ্টেন, এবং জানেন খবর পাওয়ার পরও অবিশ্বাস করে যায়নি ফগ, তাহলে প্রমোশন তো দূরের কথা, এবার চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে।

ফগ ঠিক করল, ইউনিফর্ম পরে যাবে না। তাতে অনেকের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বলা যায় না, কিডন্যাপাররাও দেখলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যাবে সিভিল ড্রেস নিয়ে এবং ছদ্মবেশে।

ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশ নিল ফগ। বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। বাস স্টপেজে যখন পৌঁছল ডেভিলস মার্শের দিকে যাওয়ার শেষ বাসটা তখন ছাড়ি ছাড়ি করছে। রাতের বাস, সব সীটই প্রায় খালি। পেছনের দিকে আলো যেখানে কম, সেখানে একটা সীটে বসে পড়ল সে।

বাস ছাড়ল। টিকেট কাটতে এসে যখন শুনল কণ্ডাক্টর, ফগ ডেভিলস মার্শে যেতে চায়, রীতিমত অবাক হলো সে। 'এত রাতে ডেভিলস মার্শে যাবেন?'

ফগও ইচ্ছে করেই জায়গার নামটা বলেছে বাহাদুরি দেখানোর জন্যে। বলল, 'কেন, অসুবিধে কি?'

'না, অসুবিধে নেই, জায়গাটার বদনাম আছে কিনা। সাংঘাতিক এক জলাভূমি। দেখেন না, নামই রেখেছে শয়তানের জলাভূমি।'

'ওসব বোকা আর ভীরু লোকে রাখে। আমি ওখানেই যাব। এলাকা যত নির্জন আর দুর্গম হয়, বেড়ানোর ততই মজা।'

আর কিছু বলল না কণ্ডাক্টর। ওর মনে হলো, লোকটা পাগল। টিকেট দিয়ে চলে গেল।

প্রায় নির্জন এক বাস স্টপেজে ফগকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বাস। এতরাতে এরকম পোশাক পরা যাত্রীকে বাস থেকে নামতে দেখে এগিয়ে এল বাসস্ট্যাণ্ডের একমাত্র অ্যাটেনডেন্ট। শেষ বাসটাও চলে গেছে, এবার বাড়ি যাবে সে।

'আপনি কোথায় যাবেন?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল অ্যাটেনডেন্ট।

'ডেভিলস মার্শ,' জবাব দিল ফগ।

'বলেন কি! এত রাতে?'

'কেন, বাড়িঘর নেই নাকি ওদিকে?'

'আছে, দুটো। জলার মধ্যে নয়, উঁচু জায়গায়। একটা খামারবাড়ি আছে, আর আরেকটা বড় বাড়ি, কোন এক বিদেশী নাকি বাস করে ওখানে, আমি যাইনি কখনও। ভয়ানক ওই জলাভূমিকে আমার ভীষণ ভয়।'

'সেজন্যেই তো যাব,' হেসে বলল ফগ, 'রাতের বেলায়ই তো দেখতে মজা কতটা ভয়ঙ্কর ওই জলাভূমি। তা কোনদিকে যেতে হবে?'

হাত তুলে দেখিয়ে দিল অ্যাটেনডেন্ট। রওনা হয়ে গেল ফগ। সেদিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। আগন্তুকের পোশাক-আশাক আর আচরণ কোনটাই ভাল লাগেনি ওর। স্বাভাবিক লোক বলে মনে হলো না ওকে। হয় বদ্ধ পাগল, নয়তো ক্রিমিন্যাল। খুনীও হতে পারে, সেজন্যেই গিয়ে জলাভূমিতে লুকিয়ে থাকতে চাইছে।

ষোলো

গভীর রাত পর্যন্ত ম্যাপ সামনে নিয়ে কাটাল কিশোর। ডেভিলস মার্শের কোথায় প্রিন্সকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, অনুমানের চেষ্টা করল।

জলাভূমির ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটা উঁচু জায়গা চিহ্নিত করল পেন্সিল

দিয়ে। দুটো বাড়ি আছে, সেগুলো ঘিরেও গোল দাগ দিল। একটা বাড়ি জলাভূমির কিনারে, আরেকটা মাঝখানে।

কিভাবে যাবে ওখানে, রাজকুমারকে খুঁজবে, এসব চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমাতে গেল অনেক রাতে। সকালে বন্ধুদের জানাবে সব কথা।

সকালে নাস্তা করতে বসেছে এই সময় বাজল টেলিফোন। পপি এসে জানাল, কিশোরের ফোন। ক্যাপ্টেন রবার্টসন করেছেন।

কাগজ পড়ছিলেন রাশেদ পাশা, মুখ তুলে তাকালেন, 'আবার কোন ঝামেলায় জড়িয়েছিস নাকি?'

'ঝামেলা নয়, প্রিন্স ঘুটাংকাউয়াকে খুঁজছি,' জবাব দিয়ে তাড়াহুড়া করে উঠে চলে গেল কিশোর।

'কিশোর,' রিসিভারে ভেসে এল ক্যাপ্টেন রবার্টসনের গলা, 'ফগর‍্যাম্পারকটকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি কোন খবর জানো?'

'তাই নাকি!' অবাক হলো কিশোর। 'কাল রাতেও তো আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'সকালে ফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। জবাব না পেয়ে একজন লোক পাঠিয়েছি, কি হয়েছে দেখে আসার জন্যে। সে গিয়ে দেখেছে ফগ বাড়িতে নেই, ইউনিফর্ম পরে বেরোয়নি, সেগুলো পড়ে আছে।'

'রাজকুমারের মত পায়জামা পরেই নিখোঁজ হয়নি তো?'

'জানি না। তবে ফগকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, একথা ভাবতে পারছি না। অবাক লাগছে আমার কাছে। তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ?'

'না, স্যার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, যদি কোন খবর পাও, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

ওপাশ থেকে লাইন কেটে গেল। হাতের রিসিভারটার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আস্তে করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে। ভাবতে লাগল, ফগ নিরুদ্দেশ! রাতে আমি আসার পর কোন এক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে। আমি যখন গেছি, তখন তো ইউনিফর্ম পরাই ছিল। খোলার পর নিরুদ্দেশ হয়েছে। কি পরে বেরিয়েছে সে?

অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। নাস্তা যে শেষ করে আসেনি, সেটাও ভুলে গেছে। সাইকেল নিয়ে রওনা হলো রবিনদের বাড়িতে।

এত সকালে কিশোরকে দেখে অবাক হলো রবিন। ব্যাপার কি, জানতে চাইল।

কিশোর বলল, 'এখন বলার সময় নেই। জলদি মুসাদের বাড়িতে চলো, ওখানে সব বলব। অনেক কথা।'

মুসাদের ছাউনিতে বসল সবাই। গোগ্রাসে গিলতে লাগল কিশোরের কথা। আগের সন্ধ্যায় কিশোর কি কি করে এসেছে, একে একে বলল সে। সাইকেল

ফেলে গিয়ে কিভাবে ফগকে ঠকিয়েছে, একথায় আসতেই হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল সবাই। সবশেষে কিশোর বলল, 'খানিক আগে ক্যাপ্টেন ফোন করেছিলেন। ফগকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ওকেও কিডন্যাপ করল না তো কেউ?' রবিনের প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'কিন্তু ওকে কিডন্যাপ করবে কে? কাল রাতে সাইকেলটা আনতে গেলাম যখন, তখন তো দেখলাম ঢিলেঢালা ভঙ্গি। কোথাও বেরোনোর মত তো মনে হলো না।'

'ডেভিলস মার্শে চলে যায়নি তো?' ফারিহা বলল। 'প্রিন্স ওখানে থাকতে পারে, একথা তুমি বলেছ ওকে।'

পিঠ সোজা হয়ে গেল কিশোরের। তাই তো! 'ফারিহা, তুমি ঠিক বলেছ! এই সহজ কথাটা ভাবলাম না কেন? ঠিক, ওখানেই গেছে সে! ইউনিফর্ম খুলে রেখে ছদ্মবেশে গেছে, বাসে করে, যাতে কেউ তাকে পুলিশ বলে চিনতে না পারে।'

'আমাদের কি করা উচিত এখন?' মুসা জানতে চাইল।

ভেবে বলল কিশোর, 'এখুনি ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে লাভ হবে না। একেবারে নিশ্চিত না হয়ে শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে ফগকে খোঁজার জন্যে সার্চ পার্টি পাঠাবেন না তিনি। আমাদের যেতে হবে।'

'আমরা সবাই যাব?' উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা।

'যাব।'

'কোথায় যাচ্ছ সবাই?' দরজায় উঁকি দিল বব।

'তুমিও এসে গেছ,' কিশোর বলল, 'এসো এসো। খবর শুনেছ নাকি?'

'কিসের খবর?'

'তোমার চাচাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কোথায় গেছে?'

'মনে হচ্ছে ডেভিলস মার্শে। সেখানেই যাচ্ছি আমরা।'

'কেন?'

'সব কথা বলার সময় নেই এখন। তুমি যেতে চাও?'

'চাই মানে! তোমরা নরকে গেলে সেখানেও যেতে রাজি! কখন যাবে? এখুনি?'

'যখনই যাই, তুমি একা যাবে, জব আর পাবকে নিতে পারব না। ওরা গেলেই ঝামেলা বাধাবে।'

'আমি একাই এসেছি। ক্যাম্পে ফেলে এসেছি ওদের।'

বাসে করে যেতে হবে। সুতরাং সাইকেলগুলো মুসাদের ছাউনিতে রেখে বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাস স্টেশনে যাওয়ার পথে একটা খাবারের দোকান থেকে স্যান্ডউইচ আর অন্যান্য খাবার কিনে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাস ছাড়ল।

'ডেভিলস মার্শে নেমে খোঁজ নিতে হবে কাল রাতে ফগকে বা ওরকম চেহারার কাউকে দেখেছে কিনা কেউ,' কিশোর বলল।

ডেভিলস মার্শ স্টেশনে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বাস। এই দিনের বেলাতেও স্ট্যাণ্ডটা নির্জন। শুধু ওরাই নেমেছে, আর কোন যাত্রী নেই। একজন মাত্র অ্যাটেনডেন্ট বসে আছে খুদে অফিসের ডেস্কের ওপাশে। কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

এগিয়ে গেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'জলাভূমিতে যাওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে?'

'পিকনিক করতে এসেছ?' জানতে চাইল অ্যাটেনডেন্ট।

'হ্যাঁ। শুনেছি, ওখানে নাকি প্রচুর পাখি আর ফুল আছে। দেখতে যাব। জায়গাটা নাকি খুব খারাপ?'

'রাস্তা ধরে গেলে কোন ভয় নেই। তবে আশেপাশের জলায় নামার চেষ্টা কোরো না। মুহূর্তে কোমর পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। কোথায় চোরাকাদা আছে বোঝার উপায় নেই।'

'ওদিকে যায় না নাকি লোকজন?'

'পারতপক্ষে না। মাঝেমধ্যে দু'একটা পাগল চলে আসে কোত্থেকে জানি, তারাই যায়। তোমাদেরকে পাগল বলছি না, তোমরা তো পিকনিক করতে এসেছ।'

'দু'চারদিনের মধ্যে কোন পাগল এসেছিল নাকি?'

'কাল রাতেই তো একজন গেল। পেট মোটা, মুখটা কোলাব্যাঙের মত। কত ভয় দেখালাম, রাতের বেলা যাবেন না, তাও গেল। কপাল খারাপ হলে এতক্ষণে হয়তো ডুবে আছে কোন চোরাকাদার তলায়।'

আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের, কাল রাতে ফগ এখানেই এসেছে। জলাভূমিতে গেছে। অ্যাটেনডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে দলবল নিয়ে রাস্তায় নামল সে।

সতেরো

এক আজব জায়গা এই জলাভূমি। ঘন সবুজ একধরনের ঘাস জন্মে আছে কাদাপানিতে। পাখি আর ফুল তো আছে, মাছিও আছে প্রচুর, খুব বিরক্ত করছে। শরীরের যেখানেই খোলা পাচ্ছে, এসে বসছে, কামড়ে দিচ্ছে। বেশি অসহ্য হয়ে উঠল বব। চটাস চটাস করে চাটি মারছে আর ঝিড়বিড় করে গালাগাল করছে।

'ওই যে দেখো, একটা বাড়ি,' হঠাৎ বলল কিশোর। 'ওই যে উঁচু জায়গাটায়, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে, দেখতে পাচ্ছ?'

'বাঁচলাম,' মুসা বলল। 'এই একঘেয়ে ঘাস দেখতে দেখতে চোখ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আর কোন দিন যে গাছপালার মুখ দেখতে পাব, ভাবিনি।'

সরু পথ চলে গেছে ছোটখাটো একটা বনের দিকে। তার ভেতরেই রয়েছে বাড়িটা।

'সাবধানে হাঁটো, কোন শব্দ করবে না,' সতর্ক করল কিশোর। 'বব, তোমার এই চড়-চাপড় বন্ধ করতে না পারলে ফিরে যাও।'

পথের মাথায় এসে বনের ভেতর ঢুকতে যাবে ওরা, এই সময় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুজন লোক। ভীষণভাবে চমকে দিল ওদের। কালো চোখ মেলে ওদের দেখতে লাগল।

'হাল্লো,' সামলে নিয়ে বলল কিশোর, 'এমন করে বেরিয়েছেন, চমকে দিয়েছেন আমাদের।'

'এখানে এসেছ কেন?' কথা বলল একজন, কথায় কেমন বিদেশী টান। 'শোননি, জলাভূমিটা খুব খারাপ। ছোটদের আসা বারণ।'

'পিকনিক করতে বেরিয়েছি।'

'ভাল করনি এখানে এসে। ফিরে যাও।'

'এখানে বসলে কি কোন অসুবিধে আছে?'

'আছে। এটা ব্যাক্তিগত জায়গা। অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারবে না।'

'ভেতর দিয়ে যদি না যাই? ঘুরে যাই ওপাশে?'

'রাস্তা নেই। যদি মরতে চাও, তাহলে যেতে পারো জলাভূমির ওপর দিয়ে।'

কিছুক্ষণ থেকেই ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসছিল। জোরাল হলো সেটা। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মুসা বলল, 'হেলিকপ্টার! জলাভূমিতে কপ্টার নামে নাকি?'

বিদেশী দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলল লোক দুজন। হেলিকপ্টারটাকে দেখছে। যে লোকটা কিশোরের সঙ্গে কথা বলছিল, সে ওর বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'যাও, ভাগো, এখানে ঢুকতে পারবে না।'

সরে এল কিশোর। কয়েক গজ পিছিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গীদের বলল, 'দাঁড়াও।'

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়ালে যে?'

'এটা তো আর ব্যাক্তিগত জায়গা নয়। এখান থেকে আমাদের সরাতে পারবেন না আপনারা।'

দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা। সেই বিচিত্র ভাষায় দ্বিতীয় লোকটার সাথে আলাপ করল কি যেন। হাত নেড়ে ডাকল, 'ওপাশে যাবে তো। বেশ, এসো, পার করে দিচ্ছি।'

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল কিশোর। দল বেঁধে লোক দুজনের সঙ্গে চলল ওরা।

মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে হেলিকপ্টার। এই উঁচু জায়গাটাতেই নামবে মনে

হচ্ছে। আশেপাশে জলা ছাড়া আর কোন শক্ত জায়গা নেই।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। কেন নামবে কপ্টারটা? প্রিন্সকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে? যে লোকগুলোর সঙ্গে চলেছে ওরা, বোঝা যাচ্ছে ওরা দারোয়ান গোছের কিছু, ওদের ব্যাক্তিগত জায়গায় কেউ যাতে ঢুকতে না পারে সেজন্যে পাহারা দিচ্ছিল।

বড় একটা খামার দেখা গেল। প্রচুর শুয়োর আর মুরগী চড়ে বেড়াচ্ছে বিশাল আঙিনায়। একটা পুকুরে অনেক হাঁস দেখা গেল। তার ওপাশে ঘোড়ার আস্তাবল। অনেক বড় একটা বাড়ি আছে। চিমনি দেখেই বোঝা গেল, অনেক পুরানো, কয়েকশো বছর আগেরও হতে পারে।

একজন লোক গোয়েন্দাদের আগে আগে রইল, আরেকজন পেছনে। একটা দরজার দিকে এগোল সামনের লোকটা।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যেখানেই নিই,' আচমকা কর্কশ হয়ে উঠল লোকটার কণ্ঠ, 'চুপচাপ এসো। ভাল চাইলে কোন কথা বলবে না।'

দরজা দিয়ে ঢুকে, সরু একটা লম্বা করিডর পার হয়ে, পুরানো একটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে এল ওদেরকে লোকটা। একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

'কি করছেন?' চিৎকার করে বলল কিশোর।

'বড় অসময়ে এসে পড়েছ। দুদিন থাকতে হবে এখানে,' বাইরে থেকে জবাব দিল লোকটা। 'ফিরে যেতে বলেছিলাম, যাওনি, এখন থাকো আটকে।'

দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকগুলো।

চোখে আলো সয়ে এলে ভাল করে তাকাল কিশোর। ছোট একটা ঘর। ওক কাঠের দেয়াল। আসবাবপত্র কিছু নেই। একপাশে একটা দেয়াল আলমারি আছে। ভেতরটা খালি। আরেক পাশে ছোট একটা জানালা। ওটার কাছে এসে নিচে উঁকি দিল সে। অনেক নিচে মাটি, লাফিয়ে নামলে হাত-পা ভেঙে মরতে হবে।

'কিশোর, কি হবে এখন?' ভয়ে ককিয়ে উঠল বব।

'যাই হয় হবে। আমার ধারণা এবাড়িতেই কোনখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে প্রিন্সকে। হেলিকপ্টার এসেছে ওকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। একবার তুলে নিয়ে যেতে পারলে ওকে আবার খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে।'

ফারিহা বলল, 'আমাদের মেরে ফেলবে না তো!'

'মনে হয় না। কোন কারণ নেই। ফগ আর প্রিন্সকে যে খুঁজতে এসেছি আমরা, একথা ওরা জানে না। ভেবেছে পিকনিক করতে আসা কয়েকটা ছেলেমেয়ে।'

'বেরোব কি করে এখান থেকে?'

কান পেতে আছে মুসা। কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বলল, 'হেলিকপ্টারটা নামছে এখন।'

'ফগকে কি এবাড়িতেই কোথাও আটকে রাখা হয়েছে?' রবিন বলল, 'নাকি আসেইনি এখানে?'

'এসেছে, অ্যাটেনডেন্ট কি বলল শুনলে না।' দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ঠেলেঠুলে পরীক্ষা করতে লাগল। পুরানো, কিন্তু কাঠ এখনও শক্ত। ভাঙা সম্ভব না। চাবির ফুটোয় চোখ রাখল। আলো আসার কথা ওপাশ থেকে, আসছে না, এর একটাই মানে, চাবিটা ফুটোতে ঢুকিয়ে রেখে চলে গেছে লোকগুলো। 'একটা খবরের কাগজ থাকলে কাজ হতো। বড় একটা কাগজ হলেই হতো।'

'কি করতে?' রবিনের প্রশ্ন।

'তালা খোলার চেষ্টা করতাম।'

'কমিকের বই হলে চলবে?' বব জানতে চাইল।

'পাবে কোথায়?'

'আছে,' পকেট থেকে ভাঁজ করে রাখা একটা পাতলা বই বের করে দিল বব।

'দাও দাও!' ববের হাত থেকে বইটা নিয়ে মাঝখানের পাতা দুটো ছড়িয়ে মেঝেতে চিত করে রাখল কিশোর। সাবধানে সেটা ঠেলে দিল দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে। কি করতে চাইছে সে বুঝে ফেলল মুসা, রবিন আর ফারিহা। একাজ আরও বহুবার করেছে কিশোর, জানা আছে ওদের।

কেবল বব কিছু বুঝতে পারল না। 'কি করছ?'

'তালা খুলছি।' পকেট থেকে ছোট একটা চামড়ার বটুয়া বের করল কিশোর। সেটা থেকে বের করল ছোট ছোট কিছু যন্ত্রপাতি আর এক বাণ্ডিল তার। তারের একটা মাথা টেনে বের করে সোজা করল। ঢুকিয়ে দিল চাবির ফুটোয়। ঠেলা দিল আস্তে করে। টুক করে মৃদু একটা শব্দ হলো। নিচে পড়েছে চাবিটা, বইয়ের ওপর। খুব সাবধানে বইটা টেনে ভেতরে নিয়ে এল সে। হাসি ফুটল মুখে। চাবিটাও এসেছে।

হাঁ হয়ে গেছে বব। চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন কোটর থেকে। বিড়বিড় করে বলল, 'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!'

'চুপ! কথা বলো না! কেউ শুনে ফেলবে!'

চাবি হাতে পেয়ে গেছে। দরজার তালা খুলে বেরিয়ে যাওয়া এখন কোন ব্যাপারই না।

'শোনো,' নিচু স্বরে বলল কিশোর, 'সবার একসঙ্গে বেরোনো ঠিক হবে না। চোখে পড়ে যেতে পারি। তোমরা থাকো, আমি গিয়ে চট করে দেখে আসি টেলিফোন কোথায় আছে। পেলে ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করে আসব।'

'আমি আসব?' মুসা বলল।

'না। বাইরে থেকে আবার তালা দিয়ে যাচ্ছি, কেউ এসে দেখলে যাতে বুঝতে না পারে দরজাটা খোলা হয়েছে।'

'সাবধানে থেকো।'

বেরিয়ে এল কিশোর। পা টিপে টিপে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। কাউকে চোখে পড়ল না। ওদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি লোকগুলো, ঘরে রেখে তালা আটকে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে। পাহারা রাখার আর প্রয়োজন বোধ করেনি।

নিচে নেমে প্রথম যে দরজাটা পড়ল, সেটাতেই উঁকি দিল সে। প্রচুর আসবাবপত্রে বোঝাই ঘর। কিন্তু টেলিফোন নেই। পাশপাশি আরও দুটো ঘর। তৃতীয় ঘরটাতে উঁকি দিয়ে টেলিফোন চোখে পড়ল তার। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ।

নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দরজাটা আটকে দিল। তুলে নিল রিসিভার। দুরুদুর করছে বুক। ঠিক আছে তো? নাকি লাইন কাটা?

না, ঠিকই আছে। আধ মিনিটের মধ্যেই যোগাযোগ করে ফেলল পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে। ক্যাপ্টেন রবার্টসন অফিসে থাকলেই হয় এখন।

হ্যাঁ, পাওয়া গেল তাঁকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

আঠারো

কথা শেষ করে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। আগের মতই নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সবচেয়ে ভাল হয় এখন ফিরে গিয়ে আবার বন্ধুদের সঙ্গে চুপ করে বসে থাকা, পুলিশের অপেক্ষা করা। কিন্তু সেটা করতে মন চাইল না ওর। একটু ঘুরেফিরে দেখার ইচ্ছে। প্রিন্সকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, দেখতে চায়।

প্যাসেজ ধরে চলে এল বাড়ির অন্য প্রান্তে। একটা দরজা দেখতে পেল, বন্ধ। ঠেলা দিল, খুলল না। ভেতরে কাউকে বন্দি করে রাখলেই সাধারণত দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। ঘরের পাশের জানালটা দেখল। পাল্লা লাগানো। বাইরে থেকে তক্তা লাগিয়ে পেরেক মেরে দেয়া হয়েছে যাতে কোনমতেই ভেতর থেকে খোলা না যায়। সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো তার, নিশ্চয় কাউকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ভেতরে।

হেলিকপ্টারটা ল্যাণ্ড করেছে। রোটরের জোরাল ঝিরঝিরে শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সিঁড়িতে কথার আওয়াজ শোনা গেল। চট করে দরজার একটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সে।

লোকগুলো চলে যাওয়ার পর বেরোল পর্দার আড়াল থেকে। চলে এল বন্ধ দরজাটার সামনে। তালায় চাবি লাগানো রয়েছে এ ঘরেরও। খুলে ফেলল কিশোর। পাল্লা খুলে ভেতরে উঁকি দিতেই দেখল বিছানায় বসে আছে বিলির বয়েসী এক কিশোর। চামড়ার রঙ তামাটে।

মুখ তুলে তাকাল ছেলেটা। কালো চোখে বিস্ময়।

'তুমি প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

বেশি কথা বলার সময় নেই। কিশোর বলল, 'এসো আমার সঙ্গে। জলদি করো।'

বিছানা থেকে নেমে এল প্রিন্স। হড়হড় করে ইংরেজি আর দুর্বোধ্য বিদেশী শব্দ মিশিয়ে একগাদা প্রশ্ন করল।

'চুপ!' কিশোর বলল। 'সবাইকে ডেকে আনতে চাও! বাঁচতে চাইলে কথা বলো না, এসো আমার সঙ্গে।'

প্রিন্সকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবার আগের মত করে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে রেখে দিল কিশোর। দৌড়ে চলল সিঁড়ির দিকে। গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ দেখছে কিনা।

কেউ নেই।

প্রিন্সকে সহ ওপরতলার সেই ঘরটার কাছে উঠে এল কিশোর, যেখান থেকে খানিক আগে বেরিয়ে গেছে। দরজা খুলে ভেতরে ঠেলে দিল প্রিন্সকে। নিজেও ঢুকে পড়ে দরজা লাগিয়ে দিল আবার।

অবাক হয়ে প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই।

অবশেষে কথা বলল ফারিহা, 'ও-ই প্রিন্স ঘুটাংকাউয়া?'

'হ্যাঁ,' মুচকি হাসল কিশোর, 'তোমার ভাই। একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। খুঁজে বের করে এনেছি। ক্যাপ্টেনকেও ফোন করে এসেছি। পুলিশ আসছে।'

'আমার চাচাকে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল বব।

'না। তাকে অবশ্য খুঁজিওনি। পুলিশ আসুক, তারাই খুঁজে বের করবে।'

'যদি থেকে থাকে এবাড়িতে,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ, যদি থাকে। চোরাকাঁদার নিচে হারিয়ে না যায়।'

হই-চই শুরু হলো নিচে। চিৎকার করে কথা বলছে অনেকে, দরজা খোলা আর লাগানোর ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ হচ্ছে।

'কি হলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয়,' কিশোর বলল, 'প্রিন্স যে ঘরে নেই এটা জেনে ফেলেছে ওরা। ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'আর ওদের হাতে পড়তে চাই না আমি!' ভয়ে ভয়ে বলল প্রিন্স। 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!'

দেয়াল আলমারির দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর, 'যাও, ঢুকে পড়ো এর মধ্যে। ওখানে খোঁজার কথা কল্পনাও করবে না ওরা।'

ছুটন্ত পায়ের শব্দ এসে থামল বন্ধ দরজার সামনে। চিৎকার করে বলল একজন, 'চাবিটা তো তালায়ই লাগিয়ে গিয়েছিলাম! গেল কোথায়?'

'দেখো, ছেলেমেয়েগুলো কোন শয়তানি করেছে কিনা,' বলল আরেকটা কণ্ঠ।

জোরে জোরে থাবা দিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'অ্যাই, তোমরা আছো ভেতরে?'

'থাকব না তো কোথায় যাব!' রাগ দেখিয়ে বলল কিশোর। 'অহেতুক আমাদের ধরে এনে আটকে রেখেছেন। দাঁড়ান, বেরিয়েই আগে থানায় যাব। পুলিশে রিপোর্ট করব।'

'চাবিটা কি করেছ?'

'কোথায় রেখেছিলেন?' নিরীহ গলায় জানতে চাইল কিশোর।

'তালার ফুটোয়!'

'তা আমরা কি করে জানব? আমরা তো ভেতরেই রয়েছি।'

তা বটে!

আরেকটা হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল। এই সময় নিচ থেকে চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'জলদি পালাও! পুলিশ!'

প্রায় বিশ মিনিট ধরে নানা রকম হই-হট্টগোলের পর ভারি জুতোর শব্দ এসে থামল দরজার সামনে। একটা ভরাট কণ্ঠ ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, তোমরা আছো এখানে?'

আনন্দে চিৎকার করে উঠল ছেলেমেয়েরা। ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কণ্ঠ।

'আছি, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। ভেতর থেকে চাবি দিয়ে তালা খুলে দিল দরজার।

বাইরের আঙিনায় তিনটে হেলিকপ্টার। ছড়িয়ে পড়েছে অস্ত্রধারী পুলিশ। অপরাধীদের কেউ পালাতে পারল না। সবাইকে ধরা হলো।

আঙিনায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে গোয়েন্দারা। প্রিন্সও রয়েছে ওদের সঙ্গে। এই সময় একটা দেয়ালের ওপাশ থেকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে বেরিয়ে এল ফগ। বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাকে খুঁজে বের করে মুক্তি দিয়েছে একজন পুলিশ অফিসার।

কাছে এসে ক্যাপ্টেনকে স্যালুট করল ফগ।

'কোন খবর না দিয়ে এভাবে বেরোলে কেন?' ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'আমাকে একটা ফোন করে এলেই পারতে।'

'ঝামেলা!' গাল চুলকাল ফগ। 'স্যার, ভাবলাম, আবার বোধহয় মিছে কথা বলছে মোটকা···ইয়ে, কিশোর পাশা, তাই···'

'গাধা কোথাকার! কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে বুঝতে পারো না বলেই তো অপদস্থ হও!

'ইয়েস স্যার!'

'সারা শরীরে এত কাদা কেন? শুয়োরের মত গড়াগড়ি করেছিলে নাকি?'

'ঝামেলা!···না, স্যার! রাতের শেষ বাসটা ধরলাম। খুব অন্ধকার ছিল। টর্চ আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, স্যার। রাস্তাটাও খুব সরু। পার হয়ে চলে এসেছি, আর কয়েক পা গেলেই শেষ, এই সময় পা ফসকাল। হড়াৎ করে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল কাদায়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করলাম। গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুজন লোক, ওরাই টেনেটুনে তুলে আনল। কেন এসেছি জিজ্ঞেস করতে লাগল। পুলিশের গুপ্তচর কিনা জিজ্ঞেস করার সময় চড়চাপড় মারল কয়েকটা। গ্যাঁট মেরে রইলাম। একটা কথা বের করতে পারল না আমার মুখ থেকে। দিনের বেলা ব্যবস্থা করবে, বলে, আমাকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল শুয়োরের খোঁয়াড়ে। কি বলব, স্যার, ঝামেলা, এত পাজি শুয়োর আমি জীবনে দেখিনি। আমাকে দেখে যেন মজা পেয়ে গেল। থেকে থেকে এসে খামাখাই গুঁতো মারে পেটে। সারাটা রাত ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে থেকেছি, দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি।'

হা হা করে হেসে উঠল মুসা। তার হাসি দেখে অন্য গোয়েন্দারাও হাসি চেপে রাখতে পারল না আর। ববও হাসতে লাগল।

চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাল ফগ। পারলে তখনই ঠাস করে চড় মারে। ক্যাপ্টেনের ভয়ে পারল না।

ক্যাপ্টেনেরও পেট ফেটে হাসি আসছে। সেটা চাপা দেয়ার জন্যে ধমকে উঠলেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও, ভাল করে গা ধুয়ে এসো। বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে।'

'ইয়েস, স্যার, ঝামেলা!' বলে খটাস করে স্যালুট ঠুকল ফগ। ঘুরে রওনা হয়ে গেল হাঁসের পুকুরটার দিকে।

***

সাপের বাসা

রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১

('রোমহর্ষক' সিরিজের 'নিরুদ্দেশ' বইটির পরিবর্তিত রূপ 'সাপের বাসা'। উল্লেখ্য: নিরুদ্দেশের লেখক জাফর চৌধুরী রকিব হাসানের ছদ্মনাম।)

এক

'এ-জন্যই ছোট প্লেন আমার ভাল্লাগে না,' বিরক্ত হয়ে মুখে হাত বুলাল মুসা। 'খালি নাচে!' যেন তার কথা প্রমাণ করতেই শাঁ করে অনেকখানি নীচে নেমে এল ছোট বিমানটা, দড়ি কেটে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়ার মত। পাক দিয়ে উঠল তার পেটের ভিতর।

'এসে গেছি,' হেসে বলল পাইলটের সীটে বসা কিশোর। 'ওই যে লাবক এয়ারপোর্ট। গাড়ি এলে ঘণ্টা দুয়েকের ভিতরেই র‍্যাঞ্চে পৌঁছে যাব।'

'কী দরকারটা ছিল এই বাদামের খোসায় বসে অর্ধেক টেক্সাস পাড়ি দেয়ার? একটা বড় লাইনারে করে চলে এলেই পারতাম। এখন আবার লাবকে নেমে গাড়িতে করে নিউ মেক্সিকো, হাড়গোড় আস্ত থাকলেই হয়।'

'তা থাকবে। প্লেন চালানোর এরকম একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম, ছাড়তে কী ইচ্ছে করে, বলো?'

গরম বাতাসে আবার দুলে উঠল প্লেন।

সীটের কিনার খামচে ধরল মুসা, সাদা হয়ে গেল হাতের আঙুল। 'সেটা বরং এরচেয়ে অনেক আরামের হতো।' জানালার বাইরে তাকাল সে। 'তোমাকে স্টুডেন্ট পাইলটের লাইসেন্স দিয়েই ভুলটা করেছে। সারাক্ষণ এখন প্লেন নিয়েই থাকবে···ওড়া আর ওড়া···সর্বনাশ! সামনে পাহাড়। লাগিয়ে দিও না।'

'আরে নাহ্। পাহাড় না ওটা, পর্বতই। চূড়াটা দেখেছ কেমন টেবিলের মত চ্যাপ্টা? দারুণ রানওয়ে হবে। ঠেকায় পড়লে ওখানে আরামসে নামিয়ে ফেলতে পারব প্লেন।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'ভেবেছিলাম নিউ মেকসিকোতে এসে চেহারা কিছুটা নরম হবে। কই? একই রকম পাহাড়-পর্বত। রুক্ষ। শুকনো। কিছু মরা গরুর শুকনো হাড্ডি দেখার শখ আমার একটুও নেই। এই রহস্যের কিনারা এখানকার শেরিফই করতে পারত। আসলে এসেছ প্লেন চালাতে, তাই না?'

'তা বলতে পারো। তা ছাড়া জ্যাক কারসন চাচার বন্ধু। চাচা কথায় কথায় সেদিন বলল, কারসন নাকি একবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আমাকে দিয়ে সেই ঋণ যদি কিছুটা শোধ হয়...আর তুমি যে বলছ শুধু কয়েকটা মরা গরু, তা কিন্তু

নয়। আমি শিওর ভিতরে আরও কোন জটিল রহস্য রয়েছে। এত সহজে হার মানার পাত্র নন করসন। পঞ্চাশ হাজার একর জমির মালিক। এসাইজের একটা র‍্যাঞ্চ যিনি চালান···। কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে, বুঝলে।' থেমে গেল হঠাৎ কিশোর। 'এসে গেছি।'

নাক নিচু করে দিল বিমানের। সামনে মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে রানওয়ে। পশ্চিম আকাশের রঙ ঘোলাটে বাদামী।

'ধূলিঝড় আসছে বোধহয়,' কিশোর বলল। সিমেন্টের রানওয়েতে চাকা স্পর্শ করতেই নেচে উঠল টুইন ইঞ্জিন হালকা বিমানটা, তারপর মসৃণ গতিতে ছুটে চলল একটা দামী গাড়ির মত। প্লেন থামিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে, ব্যাগ নিয়ে নামল কিশোর। মুসা আগেই নেমে পড়েছে। বিমানটা ভাড়া করে এনেছে ওরা। সময়মত কোম্পানির পাইলট এসে ফেরত নিয়ে যাবে।

টারমিনালে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

'কিশোর?' মহিলা কণ্ঠের ডাক শোনা গেল। 'মুসা?'

ঘুরে তাকাল ওরা।

ডাকছেন হালকা-পাতলা শরীরের এক প্রৌঢ়া। পরনে জিনস, গায়ে এমব্রয়ডারি করা একটা ওয়েস্টার্ন শার্ট। তুষারের মত সাদা চুল।

হেসে এগোল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা।'

'আমি অ্যান্ডি কারসন,' ছোট্ট হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মহিলা। চেপে ধরলেন কিশোরের হাত। অবাক হলো সে। কাঠির মত আঙুলগুলোতে এত শক্তি! 'জ্যাক আসতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে।' কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন মহিলা। 'র‍্যাঞ্চে আরেক সমস্যা হয়েছে।'

'কী?' কিশোর জানতে চাইল।

'চলো, যেতে যেতে বলব।'

বিশাল একটা দামী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে টারমিনালের বাইরে। ট্রাংকে ব্যাগগুলো তুলে রাখল দুই গোয়েন্দা। কিশোর সামনের সীটে বসল, মিসেস কারসনের পাশে। মুসা বসল পিছনের সীটে। পার্কিং লট থেকে বেরোলেই খোলা অঞ্চল। সামনে পশ্চিম আকাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মস্ত একটা বাদামী দাগ।

'আবার আসছে!' নাক কুঁচকে বললেন মহিলা। 'এই ঝড়টরগুলো এত বিচ্ছিরি লাগে না আমার! সব চিহ্ন মুছে দিয়ে যাবে।'

'চিহ্ন?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'পল ব্যানউডকে খুঁজতে বেরিয়েছে জ্যাক আর বিলি। আজ সকালে কাজে আসেনি পল,' মিসেস কারসনের কথায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'উইক এন্ড শেষ করতে পারেনি আরকি এখনও,' মুচকি হেসে বলল মুসা।

'পল সেরকম ছেলে নয়। তিরিশ বছর আমাদের এখানে চাকরি করেছে ওর বাবা। র‍্যাঞ্চটাকে এখন নিজের বলেই মনে করে সে। উন্নতির জন্য কতরকম চেষ্টাই না করেছে।' হাসলেন মিসেস কারসন। 'বয়েস তোমাদের চেয়ে দু'এক

বছরের বেশি। আমরা ওকে কর্মচারী মনে করি না। আমাদেরকে আঙ্কেল-আন্টি ডাকে। যথেষ্ট সম্মান করে। না, বিপদেই পড়েছে পল।'

'বিলি কে?' কিশোর জানতে চাইল।

'বিলি মন্টিরো, আমাদের আরেক কর্মচারী। দু'জন লোক আমাদের।'

'মানে?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'মাত্র দু'জনকে নিয়ে এত বড় র‍্যাঞ্চ চালান?'

মাথা ঝাঁকালেন মহিলা। 'পঞ্চাশ হাজার একর, শুনলে তো মনে হয় না জানি কী সাংঘাতিক ব্যাপার। আসলে তা নয়। জমি এতই নীরস, একটা গরুকে খাওয়াতেই একশো একর জমির ঘাস লাগে। মাঝেমধ্যে অবশ্য লোক দরকার পড়ে, তখন অন্য র‍্যাঞ্চ থেকে ধার নিই।' হাসি মলিন হয়ে এল তাঁর। 'র‍্যাঞ্চিং আজকাল খুব একটা লাভজনক ব্যবসা নয়। অনেক বড় বড় র‍্যাঞ্চার মার খেয়ে গেল, হঠাৎ গরুর মাংসের দাম আর কদর পড়ে যাওয়ায়।'

'এর সাথে মরা গরুর সম্পর্ক কী?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস কারসন। 'সব জানাবে তোমাদেরকে জ্যাক। মনে হচ্ছে, এখান থেকে তাড়াতে চায় আমাদেরকে কেউ। কারণ জানার অনেক চেষ্টা করেছে জ্যাক, পারেনি। আশা করি তোমরা পারবে। তোমার চাচা মিস্টার পাশা তো তা-ই বলল। তবে ও এলে ভাল হতো আরকি। জ্যাক চেয়েছিল তার বন্ধু আসুক...'

'হঠাৎ জরুরী কাজে আটকে গেল চাচা। তা ছাড়া আজকাল গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছে। শখ থাকলেও ব্যবসার চাপে আর কিছু করতে পারে না।' এক মুহূর্ত থেমে বলল কিশোর, 'আমাদের বয়েস কম দেখে ভরসা পাচ্ছেন না তো? তবে কথা দিতে পারি, ডোবাব না।'

এসে গেল ঝড়। চারিদিকে যেন ধুলোর ভারি পর্দা ঝুলছে। সামনে কয়েক শো ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। মিহি বালি ঢেউয়ের মত বিছিয়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর। খানিক পরে একটা সাইনবোর্ড পেরোল গাড়ি। তাতে লেখা: ওয়েলকাম টু নিউ মেকসিকো, ল্যান্ড অভ এনচ্যান্টমেন্ট। বালিতে প্রায় ঢেকে গেছে লেখাগুলো।

'প্রায়ই এরকম ঝড় হয় নাকি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'প্রায়ই,' পথের ওপর মিসেস কারসনের দৃষ্টি স্থির, সাবধানে চালাচ্ছেন। গাড়ি চলছে পশ্চিমে। 'সাংঘাতিক শুকনো এলাকা এটা। গাছপালা নেই যে বাতাসকে রুখবে। তিনশো বছর আগে স্প্যানিশরা যখন এসেছিল এই এলাকায়, এর নাম দিয়েছিল লা টিয়েরা এনক্যান্ট্যাডা, বিশেষ করে এই সান্টা ফে অঞ্চলটার। এর ইংরেজি মানে করা হয়েছে এনচ্যানটেড। এই যে বিশাল অঞ্চল দেখছ, এখানে সিভিল ওঅরের আগে থাকত শুধু ইনডিয়ান আর কোম্যাঞ্চেরোরা। আর পালিয়ে আসা কিছু শ্বেতাঙ্গ খুনী ও চোর-ডাকাত।'

মাইলের পর মাইল পেরোচ্ছে গাড়ি। অবশেষে জীর্ণ একটা পেট্রোল স্টেশনে এসে ঢুকল। একধারে একটা লাল পিকআপ দাঁড়িয়ে আছে। সারা গায়ে ধুলো।

গায়ের লাল রঙটা কোনমতে বোঝা যায়।

সবকিছুতে মিহি বালি পড়ে আছে। জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় এলাম?'

হেসে উঠলেন মিসেস কারসন। 'পছন্দ হচ্ছে না তো? এটা ক্যাপরক শহর। একটা গ্যাস স্টেশন আছে। একটা পোস্ট অফিস আর একটা জেনারেল স্টোর আছে। পোস্ট অফিসে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি।'

গাড়ি থেকে নেমে গেলেন মিসেস কারসন। একটা বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন। বেরিয়ে এলেন হাতে একগাদা খাম নিয়ে। পাশে পাশে আসছে একজন লোক, যেন একটা দৈত্য। নাক বসে গেছে, ঘুসি মেরে ভেঙে দেয়া হয়েছে কিনা কে জানে। ভালুকের মত বিশাল থাবা দিয়ে সেই নাক ডলে মহিলার পথরোধ করল সে। লোকটার পিছনে পুরোপুরি আড়াল হয়ে গেলেন মিসেস কারসন। কিশোর-মুসাকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি হাসল লোকটা, খুলে ধরল দরজার কাঁচের পাল্লাটা।

লোকটার সঙ্গে কয়েকটা কথা বললেন মিসেস কারসন। তারপর এগিয়ে আসতে লাগলেন গাড়ির দিকে। দানবটা এগোল পিকআপের দিকে। গাড়ির ভিতরে একটা সুন্দর সৌখিন গান র‍্যাক রয়েছে, এখান থেকেই চোখে পড়ে।

'লোকটা কে?' মিসেস কারসনকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসলেন মিসেস কারসন। 'ডেন মার্টিন, ওরটেগা র‍্যাঞ্চের নতুন ফোরম্যান। আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে, একথা শুনলে রেগে আগুন হয়ে যাবে ওর বস। বহুদিন ধরেই স্পাইক ওরটেগার সঙ্গে আমার স্বামীর মন কষাকষি চলছে। এখন আরও বেড়েছে। একটা বেড়া নাকি ভাঙা হয়েছে, রেগে আছে ওরটেগা, একথাই জানাল আমাকে ডেন।' ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে রাস্তায় নিয়ে এলেন মিসেস কারসন। 'এখনও অনেক পথ যেতে হবে আমাদের।'

'লোকটার গাড়িতে বন্দুক দেখলাম,' কিশোর বলল। 'এখানে সবাই সঙ্গে অস্ত্র রাখে নাকি?'

শ্রাগ করলেন মহিলা। 'কয়োটের ভয়। প্রচুর আছে এখানে। কখন যে সামনে পড়বে ঠিক নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার বললেন মিসেস কারসন, 'ঝড় না থাকলে এতক্ষণে পাহাড়টা দেখতে পেতে, যেটার কারণে শহরের নাম রাখা হয়েছে ক্যাপরক। বিরাট পাহাড়, উত্তর থেকে দক্ষিণে বহুদূর লম্বা হয়ে গেছে। ওটার পুব পাশে রয়েছি এখন আমরা। এর নাম ল্যানো ইসটাক্যাডো, অর্থাৎ খুঁটির প্রান্তর। এলাকাটার বেশির ভাগই সমতল, টিলাটক্কর নেই বললেই চলে। শোনা যায়, ইনডিয়ানরাও পথের নিশানা রাখার মত তেমন কিছু পায়নি এখানে। শেষে চিহ্ন রাখার জন্য কিছুদূর পরপর খুঁটি গেড়ে নিয়েছিল। পশ্চিমে রয়েছে একটা বালির পাহাড়...' হঠাৎ প্রচণ্ড একঝলক বাতাস দুলিয়ে দিল গাড়িটাকে। স্টিয়ারিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিসেস কারসন।

'এই এই!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'এই কিশোর, লোকটাকে দেখলে?'

'কোন লোক? এই ঝড়ের মধ্যে বেরোবে কেউ, পাগল নাকি!'

'আমি তো দেখলাম,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'অদ্ভুত এক বুড়ো। মাথায় মেকসিকান হ্যাট। হাতে একটা ঝুড়ি, খড় দিয়ে বানিয়েছে। এই দেখলাম এই নেই, গায়েব হয়ে গেল! ভূতের মত!'

'নিশ্চয় ফ্র্যাঙ্ক মারকি।' আবার গাড়ি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন মিসেস কারসন। 'কেউ বলে ও নেটিভ আমেরিকান, কেউ বলে মেকসিকান। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত, লোকটা পাগল।' নিজের কপালে টোকা দিয়ে বোঝালেন, 'মাথা খারাপ। কোথা থেকে কখন যে এসে হাজির হবে কেউ বলতে পারে না। তবে আসে বড় উদ্ভট সময়ে।'

মহাসড়ক থেকে মোড় নিয়ে পাশের একটা কাঁচা রাস্তায় নামলেন মিসেস কারসন। 'ওই যে,' হাত তুলে দেখালেন তিনি।

ধুলোর ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে ওদের চোখে পড়ল সাদা রঙ করা একটা বাড়ি, সিডার কাঠের ছাত। সামনে পার্ক করে রাখা কতগুলো পিকআপের পাশে এনে গাড়ি রাখলেন মিসেস কারসন।

লম্বা একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন সামনের দরজা খুলে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। পোড় খাওয়া মুখ। গায়ে জ্যাকেট, মাথায় হালকা ধূসর স্টেটসন হ্যাট। 'তোমরাই তাহলে রকি বীচের বিখ্যাত তিন গোয়েন্দা,' হেসে বললেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু দুজনকে দেখছি, আরেকজন কই?'

'আরেকজন এখন রকি বীচে নেই,' কিশোর জানাল। 'বাবা-মা'র সঙ্গে দেশের বাড়িতে গেছে। আয়ারল্যান্ডে। আমরা দুজন ছিলাম। দুজনই এসেছি। আমরা এখানে এসেছি, বাড়ি ফিরে শোনার পর অবশ্য আফসোসের অন্ত থাকবে না রবিনের।'

'কারসন র‍্যাঞ্চে স্বাগতম,' হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। 'আমি জ্যাক কারসন।'

'আমি কিশোর পাশা,' মিস্টার কারসনের হাতটা ধরে জবাব দিল কিশোর। 'ও মুসা আমান।'

উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন মিসেস কারসন, 'পলকে পেয়েছ?'

'না,' হাসি মুছে গেল কারসনের মুখ থেকে। 'এইমাত্র এলাম। ওর বাংকহাউসে গিয়েছিলাম। মনে হলো খুব তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়েছে। খাবার সাজানো রয়েছে টেবিলে, টিভিটা খোলা, ট্রাকটা ঘরের বাইরে। শুধু ঘোড়াটা নেই, হয়তো ঘোড়ায় চড়েই গেছে। ঝড় না এলে চিহ্ন দেখে পিছু নিতে পারতাম। শেরিফকে খবর দিয়েছি। ঝড় থামলেই খুঁজতে বেরোবে বলেছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'টেলিফোন অ্যানসারিং মেশিন জিনিসটা কি জানো তো?'

হাসল কিশোর। 'অল্পস্বল্প। কী জানতে চান?'

'এসো,' পথ দেখিয়ে তাঁর ছোট অফিসটায় নিয়ে এলেন কারসন। ডেস্কের

ওপর রয়েছে অ্যানসারিং মেশিনটা, ওটার লাল আলো টিপ-টিপ করছে। 'কাল নিয়ে এসেছে ওটা পল, আমি তখন ছিলাম না। ও চলে যাওয়ার পর ফিরেছি, দেখা হয়নি। কাজেই বলে যেতে পারেনি কী করে চালাতে হয় এটা। আনাড়ি হাতে টেপাটিপি করতে গিয়ে মেসেজটা মুছেই ফেললাম কিনা কে জানে।' বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। 'বোধহয় শেরিফ,' বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মেশিনটা একবার ভালমত দেখল কিশোর। তারপর একটা সুইচ টিপল। 'হাই, জ্যাক,' বলে উঠল একটা হাশিখুসি কণ্ঠ। 'পল বলছি। বাংকহাউসে ফিরে এসে ভাবলাম দেখিই না মেশিনটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা, সে-জন্যই কথা বলছি। কাল সকালে দেখা হবে।' জোরে বারকয়েক বীপ বীপ করে নীরব হয়ে গেল মেসেজ।

তারপর ভেসে এল দ্বিতীয় মেসেজ। 'জ্যাক! পল বলছি।' উদ্বিগ্ন মনে হলো কণ্ঠটাকে। 'দশটা বাজে। পুরানো বাস্তুভিটাটার কাছে কিছু ঘটছে। আলো দেখতে পাচ্ছি। দেখতে যাচ্ছি আমি।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর-মুসা। কোন সূত্র রেখে গেছে পল? বাইরে শোনা গেল গরম গরম কথা, আরও গরম হয়ে উঠছে ক্রমেই।

কারসনের কণ্ঠকে যেন কেটে দিয়ে ধমকে উঠল আরেকটা কণ্ঠ; 'ওই বেড়াটা ঠিক করা হয়েছে দেখতে চাই আমি, এবং খুব তাড়াতাড়ি। তোমাকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি কারসন। পরের পশুটা চারপেয়ে দু'পেয়ে যা-ই হোক, আমার সীমানায় দেখলে শকুনের খাবার বানিয়ে ফেলব, মনে রেখো।'

দুই

সদর দরজার কাছে ছুটে গেল দুই গোয়েন্দা। দড়াম করে বন্ধ হলো একটা গাড়ির দরজা। গর্জে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন। খোয়া বিছানো পথে যেন ভীষণ রেগে গিয়ে খড়খড় করে পিছলে গেল রবারের টায়ার। ওরা বেরিয়ে দেখল চকচকে একটা পিকআপ ছুটে চলে যাচ্ছে।

'কে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

শান্ত চোখে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলেন কারসন, 'স্পাইক ওরটেগা। ওরটেগা র‍্যাঞ্চের মালিক।' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'বড্ড বদমেজাজী। রাগ চলে গেলে আবার মাটির মানুষ।'

'এত রাগল কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'আজ সকালে আমার কয়েকটা গরুকে ওর সীমানায় দেখেছে ওর ফোরম্যান। একজায়গায় বেড়াও নাকি ভেঙেছে। ও বলে আমার গরু এই কাজ করেছে। আমি বিশ্বাস করি না। বলে দিয়েছি ঝড় থামলে গিয়ে ধরে নিয়ে আসব। তবে আগামী হপ্তার আগে বেড়া ঠিক করতে পারব না। তাতেই রেগে গেছে ওরটেগা।'

'বেড়া ভাঙা, গরু ছুটে যাওয়া,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এসব হর-হামেশাই ঘটে নাকি এখানে?'

'আমার বেলায় ঘটছে,' মাথা ঝাঁকালেন কারসন, গভীর ভাঁজ পড়ল কপালে। 'গেট খোলা থাকা, বেড়া ভাঙা, টেলিফোন লাইন ছিঁড়ে যাওয়া—প্রথম প্রথম এসব ছোটখাট অঘটন ঘটত। তারপর একটা-দুটো করে বাছুর হারাতে লাগল। খোঁড়া হয়ে ফিরে আসতে লাগল ঘোড়া। এখন গরু মরতে আরম্ভ করেছে। এখানে বাস করাই মুশকিল হয়ে উঠেছে। আমাদের শেষ করে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে কেউ।'

'এটা থামানোর জন্যই চাচাকে খবর দিয়েছিলেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

ভ্রূকুটি করলেন কারসন। 'না, এসব কে ঘটাচ্ছে জানার জন্য। দু'দিন আগে পল গিয়েছিল দক্ষিণের পুকুরটার কাছে। গিয়ে দেখে এগারোটা গরু মরে পড়ে আছে। সেদিনই খবর পাঠালাম তোমার চাচাকে।'

'চাচা এখন গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়েছে। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাজ করেই সময় পায় না। তাই আমাদের পাঠিয়েছে।' কিশোর জবাব দিল। মিস্টার কারসনের দিকে তাকাল। 'পুকুরের কথা বললেন। প্রাকৃতিক লেক, নাকি মানুষের বানানো?'

'প্রাকৃতিক,' কারসন বললেন। 'পুকুর না বলে দীঘি বলা উচিত। বিরাট দীঘি। কিংবা খুদে হ্রদ।'

'আপনার ধারণা বিষ খাইয়েছে গরুগুলোকে?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ।'

'কী বিষ?' মুসার প্রশ্ন।

'লবণ মেশানো পানি।'

'লবণাক্ত পানি!' কিশোর অবাক।

'কিন্তু এখানে লবণাক্ত পানি আসবে কোত্থেকে?' মুসাও বুঝতে পারছে না। 'হাজার মাইলের মধ্যে তো সাগর নেই।'

'তেলের কুয়াটুয়া নেই তো?'

'আরে নাহ্, কী বলো। তেলের সঙ্গে লবণের কী সম্পর্ক?'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' কারসন বললেন। 'কিছু কিছু কুয়াতে তেলের সঙ্গে থাকে লবণের স্তর। পাম্পের সাহায্যে তুলে লরিতে করে ফেলে দিয়ে আসা হয় প্রথমে সেই লবণ, তারপর তেল তোলা হয়। এখান থেকে শুরু করে আর্মস্ট্রঙের মধ্যে কয়েকটা নতুন কুয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। বলা যায় না, কেউ হয়তো লরি বোঝাই করে সেই লবণ তুলে এনে ফেলেছে আমার পুকুরে।' ভ্রূকুটি গভীর হলো তাঁর। 'সূত্র বলতে শুধু পেয়েছি টায়ারের দাগ। অনেকগুলো। বেশ চওড়া।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ভারি ট্রাকের চাকা।'

প্রসঙ্গ বদল করল মুসা, 'পলকে দেখেছে ওরটেগা?'

'জিজ্ঞেস করার সময়ই পাইনি। নিজেই একতরফাভাবে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে চলে গেল।'

'অ্যানসারিং মেশিনে দুটো মেসেজ রয়েছে,' জানাল কিশোর। 'পলের। প্রথমটা দিয়ে মেশিন টেস্ট করেছে। দ্বিতীয় মেসেজটাতে বোঝা যাচ্ছে যে মেসেজ রেখেছে সে বেশ উদ্বিগ্ন। পুরানো একটা বাস্তুভিটায় আলো দেখার কথা বলেছে। দেখতে যাবে একথাও বলেছে।'

বিস্ময় ফুটল কারসনের চোখে। 'এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম আমি।' ছেলেদের নিয়ে অফিসে ঢুকলেন তিনি। মেসেজ শুনলেন নিজের কানে। উদ্বেগ স্পষ্ট হলো চেহারায়।

'পুরানো বাস্তুভিটাটা কী?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'এই এলাকার প্রথম বসত বাড়ি। এখন ধ্বংসস্তূপ। আমার আর ওরটেগার সীমানার ঠিক মাঝামাঝি।' জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কারসন। 'ঝড় মনে হয় গেল। শেরিফের জন্য অপেক্ষা করব আমি। তবে তোমরা ইচ্ছে করলে গিয়ে বাস্তুভিটাটায় খুঁজে দেখতে পারো।' মুসার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আমাদের হলুদ পিকআপটা তো দেখেছ। অনেক পুরানো আমলের ইঞ্জিন, অন্য রকম গীয়ার। চালাতে পারবে?'

প্রাচীন মডেলের গাড়ি চালানোর আগ্রহে চকচক করে উঠল মুসার চোখ। 'নিশ্চয় পারব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। লুফে নিল মিস্টার কারসনের ছুঁড়ে দেয়া চাবিটা।

আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। আরেকবার ঘরের বাইরে আশপাশটা ভালমত দেখার সুযোগ পেল দুই গোয়েন্দা। একটা পাহাড়ের ঢাল। পূর্ব দিকে মুখ করা। ঢালের নীচে উপত্যকায় টিনের তৈরি একটা গোলাবাড়ি, আর কয়েকটা পাকা বাড়ি দেখা গেল। সেগুলোতে গ্যারেজ, মেকানিক শপ ইত্যাদি। কাছাকাছি জটলা করছে যেন আরও কিছু ছাউনি। নানারকম কাজ হয় ওগুলোতে। এসব ছাড়িয়ে পর্বতের ঢালে অনেক দূর ছড়িয়ে রয়েছে উপত্যকা। গাছপালা কিচ্ছু নেই, ঊষর জমি। তারপরের নিচু এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মে আছে ঝোপঝাড়, ছোট জাতের গাছের খুদে জঙ্গল। মাঝে মাঝে মাথা তুলেছে হালকা রঙের টিলা, ছোটখাট পাহাড় বলা চলে। দিগন্তের একেবারে কোল ঘেঁষে যেন শুয়ে রয়েছে লম্বা আঁকাবাঁকা একটা মোটা রেখা।

'ওটাই ক্যাপরক?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' কারসন বললেন। হাত তুলে সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখালেন। 'ওদিকে মাইল দুয়েক দূরে বাংকহাউসটা। ক্যাপরকের চূড়ার ঠিক নীচেই।' মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুঁশিয়ার থেকো। একটু অসতর্ক হলেই বিপদে পড়বে।'

'বাস্তুভিটাটা কোথায়?' কিশোর জানতে চাইল।

দক্ষিণে শৈলশিরার দিকে দেখালেন কারসন। 'ওদিকে, পাঁচ মাইল দূরে। যেপথে এসেছ তোমরা, সেপথেই যাবে। এক জায়গায় গিয়ে দেখবে পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। শাখাপথটা ধরে গেলেই পেয়ে যাবে।'

পাহাড়ের গোড়ার একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বিমান

বন্দরে থাকে ওসব, উইন্ড সক। ঝোপঝাড় সাফ করে রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে, তবে সাধারণ ছোট বিমান নামাতেও ওখানে কষ্ট হবে। 'ওখানে আলট্রালাইট ওড়ায় নাকি কেউ?'

প্রশংসার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন কারসন। 'পলের মিনিপ্লেনটার কথা শুনেছ তারমানে? নতুন কিনেছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'শুনিনি। অনুমান। আলট্রালাইট আছে পলের?' অবাক হয়েছে সে। 'ওটা দিয়ে কী করে?'

'গরু খেদায়। টেলিভিশন দেখে জেনেছে দক্ষিণ অঞ্চলে আজকাল হেলিকপ্টার দিয়ে গরু খেদায়। ব্যস, তার ধারণা হয়ে গেছে আলট্রালাইট দিয়েও সেটা সম্ভব, আর হেলিকপ্টারের চেয়ে দামও পড়বে অনেক কম।' শ্রাগ করলেন তিনি। 'জোরজার করে আমাকে দিয়ে কিনিয়েছে সে। তবে লাভ হবে বলে মনে হয় না আমার। ওর একটা যুক্তি হলো ওপর থেকে দেখা যায় অনেক দূর, আর নানারকম বাধার কারণে মাটি থেকে যেসব গরু দেখা যায় না, সেগুলোও দেখতে পাবে আকাশ থেকে। কথাটা অবশ্য ভুল বলেনি। ওপর থেকে সহজেই সব গরু জড় করতে পারবে।'

'কই ওটা?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

গোলাবাড়ির দিকে দেখিয়ে বললেন কারসন, 'ওখানে। ওড়াতে পারো নাকি?'

'শিখেছি। দেখাতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'মানুষ খোঁজার কাজেও সুবিধা হবে ওটা দিয়ে।'

নিচু গলায় মুসা বলল, যাতে শুধু কিশোর শুনতে পায়, 'কিশোর, ওড়াতে পারবে তো? সবে তোমাকে লার্নার্স লাইসেন্স দেয়া হয়েছে...'

ঢাল বেয়ে নামতে নামতে কিশোর বলল, 'ফেডারেল আইনে আলট্রালাইট ওড়ানোর ব্যাপারে নিষেধ নেই। জিনিসটার ওজন যদি কম হয়, পঞ্চাশ মাইলের বেশি জোরে না ওড়ানো হয়, অবশ্যই যদি তাতে কোন ভাড়াটে প্যাসেঞ্জার না থাকে, আইন কিছু বলবে না।'

কিশোরের সঙ্গে এল মুসা ও মিস্টার কারসন। গোলাঘরের ম্লান আলোয় বিমানটা দেখে মৃদু শিস দিয়ে উঠল কিশোর। মিস্টার কারসনকে বলল, 'আংকেল, দারুণ জিনিস!'

বিমানটার লম্বা পাখাগুলো নাইলনে তৈরি। লাল রঙের ওপর হলুদ ডোরাকাটা। পাখার ভার বহন করার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। পাখার পিছন দিকে যেন ঝুলে রয়েছে ইঞ্জিন, ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে প্রপেলার। চাকার ওপরে বসানো দুটো ঝুড়ির মত সীট। পিঠ লাগিয়ে ঠেস দেয়ার জন্য হেলান রয়েছে ঝুড়িগুলোতে।

'যেটাতে করে এসেছি, কন্ট্রোল অনেকটা ওটারই মত,' বাঁয়ের সীটটায় উঠতে উঠতে বলল কিশোর। 'তবে ওটার ককপিটের চেয়ে এটা অনেক খোলামেলা।'

হেসে বলল মুসা, 'প্লেন না বলে এটাকে উড়ুক্কু মোটরসাইকেল বললে বেশি মানাবে।'

'এটা দিয়ে পলকে খুঁজতে সত্যি সুবিধা হবে,' কারসনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ওড়ার চেষ্টা করে দেখি, কী বলেন?

'দেখো।'

মিনিটখানেক পরেই একটা ঝুড়িতে চেপে বসল কিশোর। পায়ের কয়েক ইঞ্চি নীচে মাটি। বাতাসের দিকে মুখ করে আছে। ইঞ্জিনের গুঞ্জন করাতকলের করাতের মত। কন্ট্রোল নাড়াচাড়া শুরু করল সে।

থ্রটল টানল কিশোর। লাফিয়ে উঠল আলট্রালাইট। কানের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুটছে বাতাস। দেখতে দেখতে পাহাড়ের মাথার ওপরে উঠে পড়ল বিমান। থামল না, উঠেই চলল। বাঁয়ে মোড় নিল সে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছ থেকে সরে এসে গতি কমাল কিশোর। হালকা ডানায় ভর করে ঈগলের মত বাতাসে ভাসছে এখন আলট্রালাইট। সামনে মিনি-রানওয়ে। ওটা পেরিয়ে এসে নীচে নামাল বিমানটাকে কিশোর, গতি আরেকটু কমাল। তারপর মোড় নিয়ে আবার চলে এল পথের ওপর। দু'ধারে কাঁটাঝোপ। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে ওড়ার সময় গতি কমাতে থাকল একটু একটু করে। ধীরে ধীরে নামছে। চাকা মাটি ছুঁতেই ঝাঁকি খেয়ে লাফ দিয়ে উঠল আলট্রালাইট। আবার নেমে এল রানওয়েতে। ছুটল। ব্রেক কষে মসৃণভাবে ওটাকে থামাল কিশোর।

'কেমন বুঝলে?' ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন কারসন।

ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতে জবাব দিল কিশোর, 'দারুণ! জবাব নেই!'

'কী করবে এখন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ট্রাকটা নিয়ে ভিটায় চলে যাও। আমি আকাশ থেকে তোমার পিছু নেব।'

'যোগাযোগ রাখব কীভাবে?' সন্দিহান চোখে বিমানটার দিকে তাকাল মুসা। 'ওটাতে নিশ্চয় রেডিও নেই।'

'অন্যভাবে সঙ্কেত দেব। এই যেমন ধরো, কিছু দেখতে পেলে ওই জিনিসটাকে ঘিরে চক্কর দেব, হাত দেখাব তোমাকে। কোন না কোনভাবে বোঝানো যাবেই।'

'হ্যাঁ, তা যাবে,' কারসন বললেন। 'গুডলাক।'

কারসনকে নিয়ে হলুদ পিকআপে চড়ল মুসা। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, সারাটা জীবনই র‍্যাঞ্চ কাটিয়েছে গাড়িটা, গোসল করিয়ে সাফসুতরোও খুব কমই করানো হয়েছে। চাবি মোচড় দিতেই জ্যান্ত হয়ে উঠল দানবীয় ভি-৮ ইঞ্জিন, রীতিমত গর্জাতে শুরু করল। মুচকি হাসল সে। সাইলেন্সারের অবস্থা করুণ, তবে এই বিকট আওয়াজে নিশ্চয় অভ্যস্ত হয়ে গেছে গরুর পাল, কিছু মনে করে না।

গীয়ার বদলানোর জন্য মস্ত স্টিক শিফটটা ধরে টানতেই এত জোরে শব্দ হলো ইঞ্জিনের ভিতর, মনে হলো সব ভেঙেচুরে যাচ্ছে। ফার্স্ট গীয়ার দিল মুসা। দুলতে দুলতে রওনা হয়ে গেল গাড়ি। পাহাড়ের গোড়ায় নেমে দেখল, কিশোরও আবার উঠে পড়েছে আকাশে।

উত্তরে আধমাইল দূরে দু'ভাগ হয়েছে রাস্তাটা। মোড় নিয়ে দক্ষিণের পথটা ধরে চলল মুসা। পথের মাঝে ছোটবড় অসংখ্য গর্ত। একপাশে থেকে তার পিছে পিছে উড়ে আসছে কিশোর, একশো ফুট ওপর দিয়ে। সহজেই ট্রাকটাকে পিছনে ফেলে যেতে পারে, কিন্তু গেল না।

পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে সূর্য। হঠাৎ আলো চলে গেল কিশোর। সামনে একশো গজ মত এগিয়ে গিয়ে চক্কর দিতে আরম্ভ করল। ধ্বংসস্তূপটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মুসা আরেকটু হলে; শেষ মুহূর্তে দেখল। ছয় ফুট উঁচু মেসকিট ঝাড়ের পাতার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

কোনমতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কামরার একটা ছাউনিমত ঘর, তারও একটা ধার বসে গেছে। বাকিটা এতই নড়বড়ে, দেখে মনে হয় জোরে বাতাস এলেই ধুপ করে পড়ে যাবে। পিছনে রয়েছে ঘোড়া বাঁধার কোরাল আর পানি খাওয়ানোর গামলা। কাঠের উইন্ডমিল রয়েছে, তার পাশে গজিয়ে উঠেছে ছোট ছোট কয়েকটা গাছ।

বালিতে পায়ের ছাপ ছিল কিনা বোঝা গেল না। থেকে থাকলেও এখন নেই, নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে দিয়েছে ধূলিমেশানো ঘূর্ণিঝড়। ট্রাক থামিয়ে ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে এল মুসা। ছাউনির দরজা খুলল। এক কোণে একটা বাংক। আর ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের পাশে দুটো চেয়ার। ফাটল ধরা সিমেন্টের মেঝেতে পড়ে রয়েছে কাগজ, খালি বোতল আর খাবারের টিন, লোহার একটা পুরানো স্টোভকে ঘিরে। কেউ নেই। জীবনের আর কোন চিহ্ন নেই, এমনকি ধুলোয় ঢাকা মেঝেতে একটা পায়ের ছাপও নয়।

বাইরে বেরিয়ে মুসা দেখল, পুবে উড়ে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। তাড়াতাড়ি ট্রাকে উঠে বিমানটাকে অনুসরণ করল।

ধূসর বালির পাহাড়ে একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে কিশোরের। সেটাই দেখতে চলেছে। কাছে এসে দেখল, একটা ঘোড়া। পিঠে জিন পরানো রয়েছে কিন্তু সওয়ারী নেই। পলের ঘোড়া হতে পারে, এটায় চড়েই হয়তো বাস্তুভিটায় আগুন দেখতে বেরিয়েছিল সে।

চক্কর দিতে তৈরি হচ্ছে কিশোর, এই সময় ডানের ফুট পেডালে ঝাঁকুনি লাগল। হালের ডান পাশের নিয়ন্ত্রক ওটা। চরকির মত পাক খেতে আরম্ভ করল আলট্রালাইট।

প্রাণপণে পেডাল চেপে হাল ঠিক রাখার চেষ্টা চালাল সে। কিন্তু কাজ হলো না, আটকে গেছে ওটা। সামান্য নড়েই ওটাও গেল আটকে।

আতঙ্ক এসে চেপে ধরতে চাইল মনকে, জোর করে সরাল। ফিরে তাকাল

পিছনে। হালটা নিশ্চয় আটকে গেছে। এর মানে নিয়ন্ত্রক তারটা ছিঁড়ে গেছে। বিকল করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রণ।

পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে নীচে নামছে আলট্রালাইট। দ্রুত উঠে আসছে মাটি। তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে না পারলে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভাঙবে আলট্রালাইট, আর সেই সাথে সে-ও···!

তিন

শান্ত থাকবে! মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এসব পরিস্থিতিতে!—ফ্লাইট ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশ মনে পড়ল কিশোরের। পায়ের নিয়ন্ত্রক কাজ করছে না বটে, কিন্তু হাতেরটা? কন্ট্রোল স্টিক নিয়ে টানাহেঁচড়া শুরু করল সে। কেঁপে উঠে ডানে কাত হয়ে গেল বিমান, তবে পাক খাওয়া বন্ধ হলো।

'বাঁচা গেল!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'হাতেরটা কাজ করছে। লম্বা চক্কর দিয়ে মোড় নিতে পারব। তবে ক্রস কন্ট্রোলে চলছে এখন, চালাতে একটু ভুল হলেই হয় এখন ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে, নয়তো আবার পাক খাওয়া শুরু হবে।'

শুধু স্টিক ব্যবহার করে খুব সাবধানে আলট্রালাইটটাকে আবার পথে নিয়ে এল কিশোর। ঝড়ের ঝাপটায় পাতার মত থরথর করে কাঁপছে বিমান। একশো ফুট ওপরে আবার ওটাকে তুলে আনল সে। সোজা এগোল র‍্যাঞ্চের দিকে। হলুদ পিকআপটা চোখে পড়ল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ওপর দিকে চেয়ে রয়েছে মুসা।

গোলমাল হয়েছে এটা বোঝানো দরকার ওকে। হাত বের করে বিমানের লেজ দেখিয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ল কিশোর। নিজের বুকে হাত রাখল, তারপর দেখাল র‍্যাঞ্চের দিকে। ট্রাকটার দিকে নির্দেশ করল, বালির পাহাড়ের দিকে দেখাল, যেখানে ঘোড়াটাকে দেখেছে।

ট্রাক থামিয়ে নেমে এল মুসা, ওপরের দিকে চোখ। আবার একই সঙ্কেত দেখাল কিশোর। বুঝে ফেলল মুসা, বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিশোরকে নিশ্চিত করল তার ইঙ্গিত সে বুঝেছে। আবার উঠল ট্রাকে।

র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল কিশোর। দীর্ঘ, অস্বস্তিকর যাত্রা। নিরাপদ হয়নি এখনও। ক্রস কন্ট্রোলের সাহায্যে ল্যান্ড করা খুব কঠিন।

গতি যথাসম্ভব কমিয়ে দিল। ধীরে ধীরে টেনে তুলল আলট্রালাইটের নাক। চলে এল রানওয়ের ওপর। ডান ডানা সামান্য কাত হয়ে আছে। নামার ঠিক আগের মুহূর্তে জোরে চেপে ধরল ডানের ব্রেক। ডান চাকার ওপর নামাল বিমান। ঝাঁকুনি খেল, হ্যাঁচকা টান লাগল ডানে, তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দৌড়ে এলেন কারসন। 'এরকম ওড়া শিখলে কোথায়!'

কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে কিশোরের। 'শিখিনি। কপাল জোরে বেঁচে গেছি।'

*

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে আন্দাজ করে ফেলেছে মুসা, কিন্তু কী সেটা বুঝতে পারছে না। একবার ভাবল যায়, গিয়ে দেখে কিশোরের কী হয়েছে? পরে ভাবল, কোন কিছু চোখে পড়েছে তার, সেটাই দেখতে যাবার নির্দেশ জানিয়েছে। কাজেই পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে চলল মুসা।

নিচু ঝোপগুলোর কাছে পৌঁছে সরু হয়ে পায়েচলা পথে রূপ নিয়ে হারিয়ে গেছে রাস্তাটা। মনে পড়ল মুসার, কারসনের আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই গাড়ি থামিয়ে নেমে এল। তারপর কী হয়েছে দেখার জন্য পায়ে হেঁটে উঠতে শুরু করল। গাছপালা বেশি নেই। আলগা বালিতে পা রাখা বেশ কষ্টকর, তাই গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে।

চূড়ায় উঠে দেখল পশ্চিম দিগন্তে ডুব দেয়ার পাঁয়তারা করছে সূর্য। বিশ গজ দূরে একটা ঘোড়া, আরোহী নেই। বোধহয় ওটাকেই দেখেছিল কিশোর, আন্দাজ করল মুসা।

চমকে গেলে দৌড়ে সরে যেতে পারে ঘোড়াটা, সে-জন্য সাবধানে এগোল সে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে আছে জানোয়ারটা, নড়ল না। মুসা ওটার লাগাম ধরার পরও মাথা নিচু করেই রাখল। 'এই, তোর পিঠের মানুষটা কোথায়রে?' জিজ্ঞেস করল সে।

লাগাম ধরে ওটাকে টেনে নিয়ে এল মুসা। ট্রাকের কাছে কিছু লম্বা ঘাসের মধ্যে একটা ঝোপের সাথে বাঁধল, যাতে চরে খেতে পারে। তারপর আবার ফিরে গিয়ে উঠতে শুরু করল পাহাড়ে। পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। সেগুলো ধরে ধরে চলে এল ছোট একটা গর্তমত জায়গায়, ঝড়ের সময় নিশ্চয় এখানে আশ্রয় নিয়েছিল ঘোড়াটা। আরোহীর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না ওখানে মুসা।

আবার ট্রাকের কাছে ফিরে এসে টেইলগেটে উঠে বসল। সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া দেখতে দেখতে ভাবছে, কিশোর কখন লোকজন নিয়ে আসবে?

অবশেষে অন্ধকারের বুক চিরে ফুটল দুই জোড়া হেডলাইটের আলো। সামনের ট্রাকটা এসে থামতেই লাফ দিয়ে নামল কিশোর। পিছনে এলেন কারসন। সাথে রয়েছে ছিপছিপে একজন মানুষ, খাড়া চুল, প্রায় চারকোনা চ্যাপ্টা মুখ। ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে ঘোড়াটার দিকে ছুটে গেল একটা ধূসর রঙের কুকুর। গরগর করছে।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। 'কী হয়েছিল? চমৎকার ম্যানেজ করেছ।'

'হালের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। কপাল ভাল, তাই আস্ত নামতে পেরেছি।'

'ও জাত বৈমানিক,' প্রশংসা করলেন কারসন। ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পলের ঘোড়া! কোথায় পেলে?'

'ওই ওখানে,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'মানুষের কোন চিহ্ন দেখলাম না।'

'বিল,' ছিপছিপে লোকটাকে আদেশ দিলেন কারসন, 'ন্যাপকে সাথে নিয়ে

গিয়ে খুঁজে দেখো তো কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

'ন্যাপ! ন্যাপ!' ডাকল বিলি। ঘোড়াটার কাছে বসে এখনও গরগর করছে কুকুরটা। 'আয় এখানে!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে এল ওটা।

'ও বিলি মন্টিরো,' ট্রাকের সঙ্গে বেঁধে টেনে আনা ট্রেলারের পিছনের দরজা খুলতে খুলতে বললেন কারসন। 'র‍্যাঞ্চের কাজ ভাল বোঝে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব প্রখর। ওখানে কিছু থেকে থাকলে ঠিক বের করে ফেলবে।'

'আর কুকুরটা?' ট্রেলারে ঘোড়াটাকে তুলতে সাহায্য করছে কিশোর।

'ওটা পলের,' আনমনে মাথা নাড়লেন কারসন। 'বাংকহাউসে গিয়ে কুকুরটাকে দেখিনি, অবাকই হয়েছিলাম। বিল বলল একটু আগে এসে হাজির হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার...'

এই সময় ফিরে এল বিলি। মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু নেই।'

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'হুঁ। চলো যাই। শেরিফ এসে হয়তো বসে থাকবে আমার জন্য। আসতে বলেছিলাম। খিদেও পেয়েছে।'

*

'দারুণ রেঁধেছেন আন্টি,' মিসেস কারসনের দিকে তাকাল মুসা। 'এখানে খাবার সব সময়ই এরকম হয় নাকি? তাহলে র‍্যাঞ্চেই চাকরি নিয়ে নেব।'

তার কথায় হাসল সবাই।

'আপনার র‍্যাঞ্চের কথা বলুন,' কিশোর বলল কারসনকে। 'অনেক জায়গা লীজ নিয়েছেন শুনেছি। পঞ্চাশ হাজার একর, তাই না?'

'হ্যাঁ।' পিছনে চেয়ার ঠেলে সরালেন কারসন। 'এসো।' ছেলেদেরকে নিয়ে অফিসে ঢুকলেন তিনি। দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় ম্যাপ দেখালেন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাল রঙের রেখা টেনে চিহ্ন দেয়া রয়েছে। হাত রাখলেন তার ওপর, 'এই জায়গাটা আমাদের।' আঙুল সরালেন আরেক জায়গায়। 'আর এটা সরকারি জায়গা।' লাঙল দিয়ে জমি চষার মত করে আঙুলটাকে ঠেলে নিয়ে চললেন উত্তরে। 'র‍্যাঞ্চের এই জায়গাটা, দক্ষিণ প্রান্ত, এটা লীজ নিয়েছি। বালির পাহাড়ের খানিকটাও পড়েছে এর মধ্যে। মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। আগামী মাসে রিনিউ করতে হবে।'

'জায়গাটা কেমন?' মুসা জানতে চাইল। 'আপনাদের কাজে লাগে?'

কারসন হাসলেন। 'না লাগলে কী আর নিয়েছি? গরুগুলোকে ঘাস খাওয়াই ওখানে। কাজেই রিনিউ করতেই হবে আমাকে। তা ছাড়া রিনিউ খরচও খুব কম, না করানোর মানে হয় না।'

বাইরে একটা গাড়ি এসে থামল। খানিক পর থাবা পড়ল সদর দরজায়। মিসেস কারসনের কণ্ঠ শোনা গেল, 'এই যে, সাইমন। যাও, জ্যাক অফিসেই আছে।'

ধুলো লাগা খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন লোক পা রাখল কারসনের অফিসে। একহারা গড়ন, বয়েস তিরিশের বেশি হবে না। বুকে শেরিফের ব্যাজ,

কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে একটা ·৩৭৫ ম্যাগনাম। 'ইভনিং, জ্যাক। পলের দেখা মিলল?'

'নাহ্,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন কারসন। ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ও রবি সাইমন, এখানকার শেরিফ। রবি, এ-হলো কিশোর পাশা, আর ও মুসা আমান। শখের গোয়েন্দা। আমাকে সাহায্য করতে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'ওয়েলকাম টু আর্মস্ট্রং কাউন্টি,' বলল বটে, কিন্তু চোখ দুটো স্বাগত জানাল না ছেলেদেরকে। ওদের ওপর কড়া নজর বোলাচ্ছে। তারপর কারসনের দিকে ফিরে বলল, 'পলের নিরুদ্দেশ হওয়ার ফাইল তৈরি করে ফেলব, না আরও কয়েক দিন দেখবে?'

'আজ বিকেলে ওর ঘোড়াটা পেয়েছি,' মুসা বলল। 'ব্যালির পাহাড়ে।'

এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল শেরিফের ঠোঁটে। 'নিশ্চয় ঘোড়া থেকে পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে। দেখো, কাল সকালেই ফিরে আসবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে।'

সাইমনের চোখে চোখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন কারসন, তারপর বললেন, 'মন থেকে বলনি ওকথা। তুমিও ভাল করেই জানো, হাঁটতে শেখার আগেই ঘোড়ায় চড়া শিখেছে পল।'

'তাহলে কী হয়েছে?'

'বলতে পারব না। কাল সকালে খুঁজতে বেরোব।'

'দেখি, পারলে দু'জন ডেপুটিকে পাঠাব,' শেরিফ বলল।

'অন্য র‍্যাঞ্চারদের সঙ্গেও কথা বলব। দেখা যাক কী হয়।'

'ঠিক আছে। সূর্য উঠলেই বেরিয়ে পড়ব। বাংকহাউসে পাঠিয়ে দিয়ো ওদেরকে।'

শেরিফ বেরিয়ে গেলে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন কারসন। 'অনেক কিছু শেখার বাকি আছে এখনও ওর। ভাল শেরিফ হতে হলে প্রচুর অভিজ্ঞতা দরকার।'

'পলের নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে আপনার অন্য সমস্যাগুলোর যোগাযোগ থাকতে পারে, তাই না?'

'জানি না। আন্দাজে কিছু বলা যাবে না। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পেলে হয়তো বুঝতে পারতাম। রাতের বেলা অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়ে গেল কেন? ট্রাকটা নিতে পারত। নেয়নি ওটা। এখনও জায়গামতই আছে।'

'তারমানে কেউ বোঝাতে চাইছে, ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিল পল?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হতে পারে,' ভ্রূকুটি করলেন কারসন। 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার।'

'তার কিংবা আপনার কি কোন শত্রু আছে, যে পলকে গুম করে ফেলতে চায়?' মুসা জিজ্ঞেস করল। নীরব হয়ে গেলেন কারসন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'পলের নেই, আমার থাকতে পারে।'

'কয়েকটা নাম বলতে পারবেন?' কিশোর বলল।

'প্রমাণ ছাড়া কারও নাম বলা ঠিক হবে না।'

'কিন্তু আমাদের কিছু সূত্র তো দরকার। নইলে তদন্ত করব কী নিয়ে?'

'বেশ,' দ্বিধা করলেন কারসন। 'প্রথমেই যে নামটা মনে আসছে, বেন ফ্রেনটিস। গত বছর আমার এখানে কাজ করেছে। তাড়াতে বাধ্য হয়েছি, কারণ র‍্যাঞ্চের কিছু জিনিস চুরি করে বিক্রি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। পলের সাথে অবশ্য খাতির ছিল তার, যাওয়ার আগে পর্যন্ত, তবে আমার ওপর খুব রেগেছে বেন।'

'ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'আরমারদের ওখানে কাজ নিয়েছে শুনেছিলাম। গরুকে ঘাস খাওয়ানোর চাকরি। তারপর আর খবর জানি না।'

'ওরটেগাকে সন্দেহ হয়?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'কাল বিকেলে তো খুব একটা ভাল ব্যবহার করল না আপনার সাথে।'

'ও চেঁচামেচিই করে বেশি, তবে লোক খারাপ না। তবে···যাকগে, এখন ওসব আলোচনা থাক। আপাতত পলকে খুঁজে বার করা দরকার। তারপর অন্য সমস্যার সমাধান। ঘোড়া থেকে যদি সত্যিই পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বিপদ হবে। যা গরম ওখানে, পানি ছাড়া আরেকটা দিন বাঁচবে না।'

'কিশোর, আলট্রালাইটের খবর কী?' মুসা জানতে চাইল। 'মেরামত করে ওড়ানো যায় না? খুঁজতে সুবিধা হতো।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। নতুন তার লাগবে।'

'আনানোর সময় নেই,' কারসন বললেন। 'সকালেই খুঁজতে বেরোব পাহাড়ের ওদিকে। খুব খারাপ এলাকা। পথ হারালে ভীষণ বিপদে পড়বে। একা ছাড়া যাবে না তোমাদের। একজন আমার সাথে আসবে, আরেকজন যাবে বিলের সঙ্গে।'

*

পরদিন ভোরে বাংকহাউসের সামনে জমায়েত হলো এক ডজন ট্রাক আর জীপ। ক্যাপরকের ওপরে ছোট, পরিচ্ছন্ন একটা বাড়ি, ওটা বাংকহাউস। পাশে গোলাবাড়ি আছে, কোরাল আছে, পিছনে একটা প্রপেন ট্যাংকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা স্যাটেলাইট ডিশ।

'ভিতরে গিয়ে দেখব একবার?' কারসনের অনুমতি চাইল কিশোর।

দরজার তালা খুলে দিলেন তিনি। 'যাও। জলদি করবে। দেরি করতে পারব না আমরা। শেরিফের লোক এলেই রওনা হব।'

বাংকহাউসটা দেখে মনে হলো কিশোরের, এক সময় এটা কোন র‍্যাঞ্চ মালিকের মূল বাড়ি ছিল। এখন মনে হচ্ছে মেসবাড়ি। অবিবাহিত পুরুষরা থাকে। বেডরুমের দেয়ালে সাঁটানো কিছু সুন্দরী অভিনেত্রীর ছবি। একপাশে দেয়ালে একটা গান র‍্যাক। একটা আলমারি বোঝাই কাউবয় বুট, শার্ট, নীল জিনসের প্যান্ট।

লিভিং রুমটা প্রায় শূন্য। শুধু একটা টেলিভিশন, একটা স্টেরিও সেট, আর এক তাক ভর্তি কান্ট্রি সং ও ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্যাসেট। রান্নাঘরে মাইক্রোওয়েভ আভনের পাশের কাউন্টারে পড়ে রয়েছে অর্ধেক খাওয়া একটা পিৎসা। এগুলোকে অবশ্য সূত্র বলা যায় না।

'বাইরে লোকের সাথে কথা বলছেন কারসন। জনা তিরিশেক লোক জড় হয়েছে। দু'জন ডেপুটিও এসে হাজির হয়েছে। কারসন বললেন সবার উদ্দেশে, 'শুনেছেন নিশ্চয় পরশু রাতে পল নিখোঁজ হয়েছে। কাল বিকেলে পুরানো বাস্তুভিটার কাছে পাহাড়ে তার ঘোড়াটা পেয়েছি। কাজেই ওটার কাছে থেকেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাব আমরা। খোঁজার জায়গা অনেক কমে গেল।'

'সর্বনাশ।' সার্চ পার্টির একজন আরেকজনকে নিচু গলায় বলতে শুনল মুসা। 'কমে গেল কী বলে! বিশ বর্গমাইল মরুভূমিতে খোঁজা···ইমপসিবল!'

জোড়ায় জোড়ায় লোক ভাগ করে দিলেন কারসন। মিনিট কয়েক পরেই গাড়িতে উঠল সবাই।

সবুজ একটা পিকআপে কারসনের সঙ্গে রইল কিশোর। সিবি রেডিও আছে গাড়িটায়। সারাটা সকাল রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো কঠিন মাটিতে নাচানাচি করল গাড়ি, ঝাঁকি দিয়ে আরোহীদের হাড় থেকে মাংস আলাদা করার প্রতিজ্ঞা করেছে যেন। পিছনে উড়ে চলেছে ধুলোর মেঘ। প্রতিটি উইন্ডমিল কিংবা ডোবার ধারে এসে থামেন কারসন, রেডিওতে কথা বলেন। কিশোর বেরিয়ে উইন্ডমিলের চূড়ায় কিংবা গাড়ির ছাতে উঠে চোখে দূরবীন লাগিয়ে চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় খুঁজে দেখে। উইন্ডমিলে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে সামনে পড়ে গরুর পাল, ওগুলো সরিয়ে পথ করে এগোনো এক মহাঝামেলার কাজ। সে আর মুসা যে একা বেরোয়নি, সেজন্য স্বস্তিবোধ করছে এখন। প্রতিটি পথ, উইন্ডমিল, ডোবা দেখতে এক রকম। আলাদা করে যে কী করে চেনে এখানকার লোকে, ভাবতে অবাক লাগছে তার।

দুপুরের খাবারের সময় র‍্যাঞ্চে ফিরল ওরা। দু'জন লোককে নিয়ে ওরটেগাকে ওখানে হাজির হতে দেখে অবাক হলো কিশোর-মুসা। ওরটেগাও লোক নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিল!

'কোনও খবর?' কারসন জানতে চাইলেন।

মাথা নাড়ল ওরটেগা। 'না, জ্যাক। সবাই একই কথা বলছে। কেউ কিছু দেখেনি।'

দ্রুত খাওয়া শেষ করে আবার বেরোল ওরা। আরেকবার ফিরে এল রুক্ষ ধুলোটে প্রকৃতির হাড়-ঝাঁকানো অঞ্চলে। সূর্য ডোবার সামান্য আগে আবার র‍্যাঞ্চে এসে মিলিত হলো দলটা। সবাইকে হতাশ দেখাচ্ছে। 'কিচ্ছু নেই,' ঘোষণা করার মত করে বলল ওরটেগা। 'জ্যাক, যদি কাল আবার আসতে পারি···'

মাথা নাড়লেন কারসন। 'দরকার নেই। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করলেন তিনি।

'কাল কেউ আসছে না?' মুসা জানতে চাইল।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কারসন। 'কী লাভ? কোন জায়গা তো আর বাদ রাখিনি। পল বেঁচে থাকলে–বেঁচে আছে কিনা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে–প্রথমেই চলে আসত কোন একটা ডোবার কাছে। কারণ ওই মরুভূমিতে প্রথম যা দরকার তা হলো পানি।

'তা ঠিক।' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'আমি আর মুসা ঠিক করেছি, পুরানো বাস্তুভিটায় ক্যাম্প করব। কী দেখে সন্দেহ হলো পলের জানতে চাই।'

'বুদ্ধিটা ভালই,' কারসন বললেন। 'বেশ, যাও। অ্যান্ডির কাছ থেকে খাবার চেয়ে নিয়ো। সবুজ পিকআপটা নিয়ে যাও। সিবি রেডিও আছে, সুবিধা হবে। যোগাযোগ রাখতে পারবে। ঘুমানোর জন্য দুটো ম্যাট্রেসও নিয়ে নিয়ো।'

পুরানো ছাউনিতে যখন পৌঁছল দুই গোয়েন্দা, অন্ধকার নেমেছে তখন। একমাত্র ঘরটায় রহস্যময় আলোআঁধারি সৃষ্টি করেছে লণ্ঠনের আলো। বাইরে গোঙাচ্ছে মরুর বাতাস, মেসকিট ঝাড়ে মাথা কুটছে যেন। হঠাৎ শব্দটা কানে এল ওদের। পায়ের চাপে মাটিতে পরে থাকা শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ।

'কিশোর,' মুসা বলল, 'এখানে ভালুক আছে?'

'মনে হয় না,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'এসব অঞ্চলে থাকে বলে তো শুনিনি। গিয়ে দেখা দরকার।'

নিঃশব্দে দরজার দিকে এগোল দু'জনে।

চার

সামান্য ফাঁক হলো দরজা। পাথর হয়ে গেল যেন দুই গোয়েন্দা। ঘরের ভিতরে ঠেলে দেয়া হলো কী যেন, লাঠির মাথায় ঝোলানো একটা লাউয়ের মত জিনিস। তারপর দেখা গেল একটা বয়স্ক হাত, লাঠিটাকে শক্ত করে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে। খটখট করছে লাউয়ের মত জিনিসটা।

পুরো খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বৃদ্ধ, ধূসর তারের মত চুল। মাথায় খড়ের তৈরি সমব্রেরো হ্যাট, কাঁধে ঝোলানো খড়ের ব্যাগ।

'এই তো সেই লোক!' ফিসফিসিয়ে বলল উত্তেজিত মুসা। 'ঝড়ের মধ্যে এই লোকটাকেই দেখেছিলাম! ফ্র্যাঙ্ক মারকি!'

'হ্যাল্লো,' অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মেকসিকান ভাষায় কী যেন বলল বুড়ো। লাউয়ের মত জিনিসটা নেড়ে খটখট শব্দ করল আবার। ইংরেজিতে বলল, 'আমি মারকি। তোমাদের হুঁশিয়ার করতে এলাম।'

'হুঁশিয়ার?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ ব্যাপারে?'

'শয়তান ঘুরছে,' ফিসফিস করে বলল লোকটা। 'বিপদ।' হাত তুলে পুবের জানালার বাইরেটা দেখাল। 'দেখতে পাচ্ছো?'

ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখতে পেল ক্যাপরকের মাথার ওপরে বাঁকা চাঁদ উঠেছে। 'খাইছে! কেমন ভূতুড়ে লাগছে!' বিড়বিড় করল সে। 'চাঁদ ঘিরে ওই আঙটির মত রেখাটা কীসের?'

'হয় এরকম,' কিশোর বলল। 'পর্বতের চূড়ায় জমা বরফের কারণে। দূর থেকে মনে হয় চাঁদের চারপাশেই বুঝি ওই রিঙ তৈরি হয়েছে।'

এগিয়ে এল বুড়ো। টেবিলের ধুলোতে আঙুল দিয়ে ইংরেজি 'কে' অক্ষরটা লিখে ওটাকে ঘিরে একটা বৃত্ত আঁকল। 'খুব খারাপ।'

'কারসনের র‍্যাঞ্চের কথা বলছে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল মুসা।

'চাঁদের চারপাশের রিঙটার কথা বোঝাতে চাইছে,' বলল কিশোর। 'চাঁদকে গিলতে রাহু আসছে এটা বোঝাতে চায় না তো?' বুড়োর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলতে চান?'

'অনেক দিন আগে,' বুড়ো বলল, 'এই অঞ্চলে যেসব বিদেশী বাস করতে এসেছিল তাদেরকে খুন করেছিল কোম্যাঞ্চেরোরা।' ক্যাপরকের দিকে হাত তুলল সে। 'ওই ওখানে, আমার বাপ-দাদাদের পবিত্র মাটিতে। একজন বাদে সবাই মারা পড়েছিল সেরাতে। তখনও আজকের মতই চাঁদের চারপাশে ছিল ওই আঙটি। চলে যাও তোমরা, আর কক্ষনো আসবে না।'

বাইরে একটা গরু ডেকে উঠল। কোথায় আছে ওটা দেখার জন্য জানালার দিকে ফিরল দুই গোয়েন্দা। আবার যখন ঘুরে তাকাল, গায়ে লাগল একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। বুড়ো নেই ঘরে।

'চলো, দেখি কোথায় যায়?' বলতে বলতে দরজার দিকে ছুটল মুসা। কিন্তু বাইরে বুড়োর ছায়াও দেখতে পেল না।

'বাদ দাও, মুসা,' হাত নাড়ল কিশোর, 'পিছু নিয়ে লাভ হবে না। গেছে গায়েব হয়ে। ওর পিছু নিতে গেলে পলের মতই আমাদেরকেও কাল খুঁজতে বেরোবে সার্চ পার্টি।'

নিরাশ হয়ে আবার ঘরে ফিরে এল মুসা। 'ঘুমানো দরকার, না কি বলো?'

মাঝরাতে জেগে গেল মুসা। অস্বস্তি লাগছে। একটা শব্দ শুনেছে। আর এক ধরনের বিচিত্র কাঁপুনি, বজ্রপাতের সময় মাটি যেমন কাঁপে অনেকটা সেরকম। জানালা দিয়ে দেখল, অনেক পশ্চিমে সরে গেছে চাঁদ। একরত্তি মেঘ নেই আকাশে। বজ্রপাতের কোন সম্ভাবনাই নেই। মনে হলো, নিশ্চয় স্বপ্নে শুনেছে ওই আওয়াজ।

আবার যখন ঘুম ভাঙল, ভোরের আলো তখন জানালা দিয়ে ঢুকছে। টিট-টিট করে সঙ্কেত বাজাচ্ছে কিশোরের ঘড়ি।

'আমার ছুটি,' ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল মুসা। উঠতে ইচ্ছে করছে না।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে ততক্ষণে কিশোর। 'কারসন আঙ্কেলকে কথা দিয়েছি সকাল সাতটার মধ্যে রেডিওতে যোগাযোগ করব। তারপর মরা গরু খুঁজতে বেরোব।'

রেডিওতে কথা বলা শেষ করল কিশোর। তারপর পুকুরটা দেখতে চলল, যেটার পানি খেয়ে গরুগুলো মারা গেছে।

বাস্তভিটার সিকি মাইল দক্ষিণে এসে ট্রাকের গতি কমাল মুসা। হাত তুলে আকাশের দিকে দেখাল। দশ-বারোটা বড় কালো পাখি উড়ছে। 'শকুন!'

'নিশ্চয় মড়া দেখতে পেয়েছে। জায়গামতই এসেছি আমরা।'

পথের ঠিক নীচেই মাটির একটা বাঁধ যেন ঠেলে উঠেছে শুকনো জলাশয়ের প্রায় বুক থেকে। পুকুরের বেশির ভাগ পানিই বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। এক জায়গায় সামান্য একটুখানি পানি জমে রয়েছে, সবুজ, শ্যাওলায় থিকথিকে। পানির কিনারে সাদা পাউডারের মত জিনিস বেশ পুরু হয়ে পড়ে আছে। রাস্তা থেকে নেমে পুকুরের ধার পর্যন্ত চলে গেছে ভারি চাকার দাগ।

নাক কুঁচকাল মুসা। দুর্গন্ধ। কাছেই ঝোপের পাশে পড়ে রয়েছে কয়েকটা মরা গরু। সে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম খেয়ে শেষ করে ফেলেছে শকুনের দল। নাকি আগেরগুলো খাওয়া শেষ, এগুলো নতুন?'

জবাব না দিয়ে সাদা জিনিসগুলোর কাছে হাঁটু গেড়ে বসল কিশোর। 'হুঁ, লবণের মতই লাগছে। মুসা, স্যাম্পল নাও। বোতলে ভরে পানিও নাও। পরে পরীক্ষা করব। আমি আশপাশটা একটু ঘুরে দেখি।'

চাকার দাগগুলো কাছে থেকে ভালমত দেখল কিশোর। তারপর হাঁটতে লাগল পুকুরের চারপাশে। মাটির দিকে চোখ। স্যাম্পল নিতে নিতে মুসা দেখল নিচু হয়ে কী যেন তুলে নিচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। জিজ্ঞেস করল, 'কী পেলে?'

ফিরে এসে জিনিসটা দেখাল কিশোর। ছোট একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ, ভিতরে রাইফেলের গুলির তিনটে চকচকে খোসা। 'একেবারে তাজা।'

'কী রাইফেল?'

'বলতে পারব না। গুলির নীচে মিলিটারি অর্ডন্যান্স মার্ক রয়েছে, নম্বর ফরটি থ্রি। এটা ক্যালিবার নয়, বোধহয় কোন সালে তৈরি হয়েছে, সেটা। তেতাল্লিশ সাল। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিলামে বিক্রি করে দেয়া জিনিস।' হাতের তালুতে রেখে দেখছে কিশোর। 'অদ্ভুত দেখতে, তাই না? গোড়া থেকে কাঁধ পর্যন্ত খুব খাটো, ধীরে ধীরে চিকন হয়ে উঠেছে। মনে হয় থারটি ক্যালিবার।'

'আঙ্কেল কিংবা বিলিই হয়তো গুলি করে গরুগুলোকে মেরেছে,' মুসা বলল। 'যেগুলো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, বাঁচানো সম্ভব ছিল না।'

'হয়তো। জিজ্ঞেস করব।' চাকার দাগগুলোর দিকে তাকাল আবার কিশোর। 'ভালমত বোঝা যায় না। ক্ষয় করে ফেলেছে বাতাস। আমাদের প্রধান সূত্র হলো এখন এই গাড়ি, ট্যাংকার, যেটা এই দাগ রেখে গেছে। চলো, বাড়ি যাই। কারসন আঙ্কেলকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

ওদের গাড়ির শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কারসন।

গুলির খোসাগুলো দেখে মাথা নাড়লেন তিনি, 'আমরা মারিনি। তবে পানির ধারে অনেক শিকার মেলে। প্রায়ই শিকার করতে যায় লোকে।'

'ট্যাংকার ট্রাকটা খোঁজার কথা ভাবছি আমরা,' মুসা বলল। 'পানি দূষিত করেছে যেটা। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

মুসা কথা বলছে, কিশোর গিয়ে আবার ব্যাগে ভরা গুলির খোসাগুলো রেখে দিল গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে।

'আর্মস্ট্রঙের অয়েল-ড্রিলিং সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো,' কারসন বললেন। 'তেল তোলে ওসব কোম্পানি। ওরকম ট্যাংকার অনেক আছে ওদের। তবে কোন গাড়িটা গিয়েছিল পুকুরের কাছে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।'

'তবু দেখি চেষ্টা করে,' কিশোর বলল।

গাড়ি চালিয়ে আর্মস্ট্রঙে এল ওরা, কারসনের র‍্যাঞ্চ থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে। পশ্চিমা কাউ টাউন আর আধুনিক শহরের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। শহরের বাইরে বেশ কিছু দোকান আছে, দেখলে মনে হয় না দোকান, বসত বাড়ির মত। তেল কোম্পানির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রি করে ওরা। শহরের কেন্দ্রে আদালত ভবনটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান, পুরানো ঢঙের, একেবারে সেই আদিম বুনো পশ্চিমের ছাপ। দেড়শো বছর পিছিয়ে গেছে যেন এখানে পৃথিবী।

'এখান থেকেই শুরু করা যাক,' বলতে বলতে ডেলটা ড্রিলিং সার্ভিস কোম্পানির পার্কিং লটে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। একটা ট্রাকের পাশে রাখল। ট্রাকটার পিছনে জুড়ে দেয়া হয়েছে মস্ত একটা হ্যাংক ট্রেলার।

'চাকার সাইজ দেখেছ,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। এই রকম চাকার দাগই পড়েছে পুকুর পাড়ে।'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোল দু'জনে।

'কী চাও?' ভুরু তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল কাউন্টারের ওপাশে বসা লোকটা।

'চিঠি আদান-প্রদানের কাজটা কি আপনিই করেন নাকি?' কিশোর জানতে চাইল।

হাসল লোকটা। 'হ্যাঁ। ওটা আমার অনেক কাজের একটা।'

'ও। একটা ট্যাংক ট্রাক খুঁজছি আমরা।'

'পাবে। কতক্ষণের জন্য ভাড়া চাও?'

'তথ্য জানতে চাইছি আমরা। যে ট্রাকটাকে খুঁজছি, বেআইনীভাবে বিষাক্ত বর্জ্য ফেলে এসেছে একখানে।'

'রেজিস্ট্রেশন নম্বর?'

'জানি না।'

'কী করে বুঝলে ওটা আমাদের ট্রাক?'

'বুঝিনি, বোঝার চেষ্টা করছি, কোত্থেকে গেল ওটা। আপনাদের ছাড়া ওরকম গাড়ি আর কার কার আছে এখানে?'

খিকখিক করে হাসতে লাগল ডিসপ্যাচার। 'অন্তত তিনটে কোম্পানির আছে। এছাড়া রয়েছে আরও আধডজন অন্য কোম্পানির, যারা তেল তোলার কাজ করে না।'

'নয়-দশটা কোম্পানির ট্যাংকার, এই একটুখানি শহরে!' খুঁজে বের করা কঠিন হবে একথা কেন বলেছিলেন কারসন, বুঝতে শুরু করেছে কিশোর। 'লগ বুক-টুক কিছু রাখে ওসব ট্রাক?'

'বেশির ভাগই রাখে না। রাখবে কখন? অনেক কাজ।' ভুরু কাছাকাছি হলো লোকটার। 'বাঁচার জন্যে এখানে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।'

'ক্যাপরকের কাছে কোন ট্রাক কাজে যায় কিনা জানেন?'

মুহূর্তের জন্য স্বস্তি ফুটল মনে হলো লোকটার চোখে। পিয়ারে হেলান দিল। 'না। আমি যতদূর জানি, ওখানটায় কোন ড্রিলিং হচ্ছে না।' কিশোরের চোখে চোখে তাকাল সে। 'বর্জ্য বললে? কী জিনিস?'

'জানি না,' বলে মুসার হাত ধরে টানল কিশোর। 'এসো।' লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুসাকে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো সে।

বাইরে বেরিয়ে মুসা বলল, 'লাভ হলো না।'

শ্রাগ করল কিশোর। 'কারসন আংকেল ঠিকই বলেছেন। চলো, র‍্যাঞ্চেই ফিরে যাই। দেখি পলের কোন খবর পেল কিনা।'

সারাটা আকাশ ছিল পরিষ্কার। কিন্তু যখন উত্তরে রওনা হলো, দিগন্তে হুমকি হয়ে দেখা দিল কালো, ভারি মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

'ঝড় আসবে মনে হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'মরুভূমির এসব তুফান খুব ভয়ঙ্কর।'

এগিয়ে আসছে ঝড়, ওরাও চলছে সেদিকেই। সামনে কালো পর্দার মত ঝুলছে মেঘ, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে দু'পাশে। শেষে এমন অবস্থা হলো, দিগন্তের কাছে সরু এক চিলতে আলোর আভাস ছাড়া আলো বলতে আর কিছুই রইল না। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। একটু বাতাস নেই। মাথার ওপরে টগবগ করে ফুটছে যেন মেঘ। কালো রঙ আর নেই এখন, রূপান্তরিত হয়েছে অদ্ভুত সবজে-বেগুনী রঙে।

'কিশোর, ভাবসাব ভাল ঠেকছে না আমার।' ঝুলে থাকা মেঘের চাদর দেখাল মুসা।

হঠাৎ সামনে আধমাইল দূরে মস্ত একটা কালচে আঙুল যেন কালো চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে খোঁচা মারল মাটিতে। তারপর বলের মত ড্রপ খেয়ে উঠে যেতে লাগল আবার। আবার নামল। লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল একটা সাইনবোর্ডের কাছে। [illegible] পেয়েই হ্যাঁচকা টানে বোর্ডটাকে তুলে সেঁধিয়ে ফেলল পেটের মধ্যে।

'কাণ্ডটা দেখলে!' পিঠ কুঁজো করে ফেলেছে কিশোর, কাঁধ শক্ত। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে স্টিয়ারিং, যেন ভয় করছে তাকেও বোর্ডটার মত টান দিয়ে নিয়ে যাবে টর্নেডো।

চলার পথে যা পাচ্ছে সব তুলে নিচ্ছে ঝড়। প্রবল ঘূর্ণিবায়ু বালির একটা মোটা স্তম্ভ তৈরি করে ফেলেছে যেন। কানফাটা প্রচণ্ড গর্জন, যেন একসাথে তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে একাধিক দ্রুতগতি রেলগাড়ি।

সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড়!

পাঁচ

'জলদি! খাদে নামো!' ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল কিশোরের চিৎকার।

এত অন্ধকার হয়ে গেছে, রাস্তাই ভাল দেখতে পাচ্ছে না মুসা। এর মাঝেই কোনমতে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পথের পাশের খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। উপুড় হয়ে মাটি খামচে ধরে পড়ে রইল। টান দিয়ে তাকে ছুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বাতাস। মিনিটের পর মিনিট কাটছে। বয়ে চলেছে ঝড়। ধুলো আর ছেঁড়া ঝোপঝাড়ের পাতা উড়ছে ঘন হয়ে।

অবশেষে কমে এল ঝড়।

'ঠিক আছো তুমি?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছি,' বলতে বলতে উঠে বসল মুসা। কাঁধ ডলছে। 'অ্যাই কিশোর, ট্রাকটা কই?'

কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে কিশোরও উঠে বসল। মলিন মুখে হাত তুলল, 'ওটাই বোধহয়।' কয়েকশো ফুট দূরে মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে দলা পাকানো একটা ট্রাক।

'এই অবস্থা করেছে!' বিড়বিড় করল মুসা। পা কাঁপছে। কাঁটা দিয়ে উঠল শরীর। শীত লাগছে। একটু আগেও যখন ঝাপটা মারছিল তুফান, গনগনে চুলা থেকে যেন আঁচ লাগছিল গায়ে, এখন বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা। কয়েক মিনিটেই তাপমাত্রা অন্তত চল্লিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। বরফ-শীতল এক ফোঁটা পানি পড়ল ঘাড়ে। বৃষ্টি।

'এসো। গিয়ে অবস্থা দেখি,' বলে ট্রাকটার দিকে এগোল কিশোর।

ডানে কাত হয়ে পড়ে আছে ট্রাকটা। ছাত দুমড়ে বসে গেছে। ছিঁড়ে চলে গেছে একটা দরজা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট খোলা, শূন্য। মিনিট পাঁচেক খোঁজার পর নিশ্চিত হলো কিশোর, গুলিব খোসাসহ ব্যাগটা হারিয়ে গেছে, আর পাবে না।

'গেল আমাদের সূত্র,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা। 'ওরকম গুলি আবার দেখলে চিনবে?'

'তা চিনব। দেখতে একেবারে অন্যরকম তো।'

আবার ট্রাকটার দিকে তাকাল মুসা। বেশ জোরেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। 'এটা আর চলবে না,' মাথা নেড়ে বলল সে। 'চলো, রাস্তায় গিয়ে উঠি। কোন গাড়িটাড়ি এলে লিফট নিতে পারব।'

ওরাও রাস্তায় পৌঁছল, দেখল, ফ্ল্যাশলাইট জ্বালতে জ্বালতে দ্রুত ছুটে আসছে একটা গাড়ি। হাইওয়ে পেট্রোল কার। কাছে এসে থামল গাড়িটা। জানালা খুলে মুখ বের করল ট্রুপার। 'কী ব্যাপার, আবহাওয়া অফিসের টর্নেডো বুলেটিন শোননি? বাইরে ঘোরাঘুরি করছ যে?'

হেসে উঠল মুসা। 'আর ঘরে ঢুকেই বা কী হবে? যা ঘটার ঘটে গেছে।' কাঁধের ওপর দিয়ে হাত তুলে পিছনে দেখাল। 'ওই দেখুন আমাদের ট্রাকের অবস্থা।'

সেদিকে তাকিয়ে মৃদু শিস দিয়ে উঠল ট্রুপার। 'হাড়গোড় আস্ত আছে তো তোমাদের?'

'আছে,' জবাব দিল কিশোর। 'সময়মত খাদে লাফিয়ে পড়েছিলাম।'

দরজা খুলে দিল ট্রুপার। 'ওঠো। ভিজে যাচ্ছ।'

রেডিওতে রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করল ট্রুপার। চুপ করে শুনছে ছেলেরা। কথা শেষ করে ওদের দিকে ফিরল সে। 'কোথায় যাবে?'

'উত্তরে,' মুসা বলল। 'ক্যাপরক টাউন।'

'ভাল। ওদিকেই যাব। নামিয়ে দিতে পারব তোমাদের।'

হাইওয়ে ধরে চলছে পেট্রোলকার। 'এখানকার মানুষ বলে তো মনে হচ্ছে না তোমাদেরকে,' ট্রুপার বলল।

'না,' কিশোর বলল। 'জ্যাক কারসনের র‍্যাঞ্চে বেড়াতে এসেছি।'

'ও। ওখান থেকে একজন লোক হারিয়ে গেছে শুনলাম। পাওয়া গেছে?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'না।'

'হুঁ। এত অবাক হবার কিছু নেই। ছেলেছোকরাদের স্বভাবই ওরকম। কখন যে পোঁটলা বেঁধে কেটে পড়ে, কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় কাউকে কিছু না বলেই চলে যায়। কয়েক দিন পরেই খোঁজ পাওয়া যাবে। দেখা যাবে অন্য কোথাও চাকরি করছে।'

'র‍্যাঞ্চে কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। ক্ষতি করার বদনেশায় ধরেছে কাউকে। জানেন কিছু?

অবাক মনে হলো ট্রুপারকে। 'না। জায়গাটা অনেক দূর। সব খবর সব সময় আসে না।'

বিশ মিনিট পর ক্যাপরক স্টোরের সামনে এসে থামল গাড়ি। ট্রুপারকে ধন্যবাদ দিয়ে নামল দুই গোয়েন্দা।

'র‍্যাঞ্চে ফোন করব,' স্টোরের দিকে পা বাড়ায় কিশোর। পয়সা দিলে ওখান থেকে ফোন করা যায়। 'কেউ এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।'

'চলো। গলাটাও ভিজিয়ে নেয়া দরকার। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

যেমনটি হবে আশা করেছিল মুসা, ঠিক তেমনই হলো পুরানো স্টোরের ভিতরটা। ছোট্ট ঘর। সামনের ধুলো-ধূসরিত একমাত্র কাঁচের জানালা দিয়ে আলো আসার ব্যাবস্থা। তক্তা আর প্লাইউড দিয়ে আনাড়ি হাতে তৈরি শেলফ সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। ওগুলোতে বোঝাই নানারকম টিন, বাক্স। অনেকগুলোর গায়ের লেবেলের লেখা পড়া যায় না, পুরানো হয়ে মুছে গেছে। কিছু তাকে রয়েছে পেরেক, দড়ি, হাতুড়ি-বাটাল আর নানারকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

দরজার ডানে কাঠের একটা লম্বা কাউন্টার। ওটার পিছনে কাঁচের দরজার ওপাশে ক্যাপরকের পোস্ট অফিস। স্টোরের এককোণে একটা আদিম সোডা মেশিন, বোতল লাগান রয়েছে। কয়েকটা খুচরো পয়সা মেশিনের কোটরে ফেলে দিয়ে দুটো বোতল খুলে নিল মুসা। ছিপি খুলল।

'আংকেল আসছেন,' ফোন রেখে দিয়ে কিশোর জানাল।

তাকে একটা বোতল দিল মুসা।

'তোমরাই বেড়াতে এসেছ কারসনের বাড়িতে?' কাউন্টারের আড়ালে আবছা অন্ধকার থেকে শোনা গেল কণ্ঠটা। সাদা হয়ে গেছে মাথার সমস্ত চুল। স্টোরে ঢোকার পর থেকেই লোকটাকে দেখেও না দেখার ভান করেছে মুসা, অস্বস্তি লেগেছে বলে। কেন লেগেছে, বলতে পারবে না। লোকটার দৃষ্টিই বোধহয় এর কারণ। 'হ্যাঁ,' জবাব দিল সে। 'তুফানে আমাদের ট্রাক উড়ে গেছে। কপাল ভাল একটা পেট্রোলকার পেয়েছিলাম। ট্রুপার আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল।'

দুই পাশে কোণাকুণি উঠে গেল লোকটার ভুরু। 'কপাল সত্যিই ভাল।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'আচ্ছা, এখানকার এক বুড়োকে চেনেন—নেটিভ আমেরিকান, মাথায় ধূসর চুল, একটা খড়ের ব্যাগ বয়ে বেড়ায়?'

'চিনি। ফ্র্যাঙ্ক মারকি। আমি যখন এসেছিলাম, তখনও ছিল। এখনও আছে। কম দিনের কথা?' হিসেব করে বলল লোকটা, 'চল্লিশ বছর তো হবেই।'

'কোথায় থাকে?'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল বুড়ো। 'যখন যেখানে খুশি। তবে বেশির ভাগ সময়ই থাকে ক্যাপরকের নীচে একটা ঝুপড়িতে। কেন? দেখা হয়েছে নাকি?'

'হয়েছে,' মুসা বলল। 'বাস্তভিটায় রাতে থাকতে গিয়েছিলাম। ওই যে, পাহাড়ের ওপর একটা পুরানো ভাঙা বাড়ি আছে না···কাল রাতে হঠাৎ এসে হাজির। এক আজব গল্প শোনাল। চাঁদের চারপাশে আঙটি তৈরি হলে নাকি বিপদ আসে।'

'হুঁ, মারকিকেই দেখেছ,' মাথা দোলাল বুড়ো। 'নিশ্চয় কোম্যাঞ্চেরোদের খুনের গল্পও শুনিয়েছে। মিথ্যে বলেনি। প্রায় একশো বছর আগে ক্যাপরকের এক কেবিনে হামলা চালিয়েছিল খুনীগুলো। যাকে দেখেছে কাউকে ছাড়েনি। তারপর কেবিনটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে চলে গেছে।'

'কোম্যাঞ্চেরোরা সবাই নিশ্চয় নেটিভ আমেরিকান নয়, কি বলেন?' কিশোর

জানতে চাইল। 'আমার ধারণা, ওদের কিছু লোক মেকসিকান, বাকিরা শ্বেতাঙ্গ চোর-ডাকাত। তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। 'হোকগে। এখন আমাদের কী? একজন ছাড়া সবাই মরেছিল সেরাতে। সেই একজনও মরে গেছে বহু বছর আগে।'

'বিপদের কথা বলেছে মারকি,' তথ্য জোগাড়ের উদ্দেশ্যে বলল কিশোর। 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

হেসে উঠল দোকানদার। 'ও ওরকমই। নতুন কাউকে পেলেই ভয় দেখানোর চেষ্টা করে।' দাত বের করে হাসল বুড়ো। ঝিক করে উঠল সোনায় বাঁধানো একটা দাঁত। 'ও চায়, ভয় পেয়ে পোঁটলা-পাটলি বেঁধে সবাই আমরা কেটে পড়ি এখান থেকে। তখন তার জাতের লোকেরা এসে বাস করবে এখানে, পবিত্র তীর্থস্থান গড়ে তুলবে।'

'পবিত্র?' কৌতূহল জাগল কিশোরের। 'শব্দটা কাল রাতে মারকির মুখেও শুনেছি। কোন গোত্রের লোক সে?'

দ্বিধা করল বুড়ো। 'ঠিক বলতে পারব না। তবে মনে হয়, কিওয়া। শুনেছি, যেখানে খুনগুলো হয়েছিল, সেই জায়গাটার কাছেই ওদের পবিত্রভূমি।'

বাইরে একটা ট্রাক থামার শব্দ হলো। ভিতরে ঢুকলেন কারসন। 'আফটারনুন, হ্যাম।' বুড়োকে বলে ছেলেদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'এই, তোমরা কেমন আছো?'

'ভাল,' কিশোর জানাল। 'তবে আপনার ট্রাকের অবস্থা ভাল না। শেষ।'

কী করে টর্নেডোর কবলে পড়েছিল, কীভাবে রক্ষা পেয়েছে, ফেরার পথে কারসনকে জানাল দুই গোয়েন্দা। আর্মস্ট্রঙে যে সুবিধা করতে পারেনি, সেকথাও বলল। কারসন জানালেন, তিনি আর বিলিও সুবিধা করতে পারেননি। সারাটা দিন ঘুরে মরেছেন পুকুরগুলোর আশেপাশে। পলের চিহ্নও খুঁজে পাননি।

'আজ রাতেও বাস্তুভিটায় থাকব,' র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি এসে কিশোর বলল। 'হয়তো আজও আসতে পারে মারকি।'

মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'ভালই হবে। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবে তাহলে।'

'কেন?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মুসা। 'সে কিছু জানে ভাবছেন?'

'না, তা ভাবছি না,' আমতা আমতা করে বললেন কারসন। 'তবে এখানে যা যা ঘটে, কোন কিছুই বুড়োটার চোখ এড়ায় না কিনা। হয়তো পলের ব্যাপারেও সব জানে, সব দেখেছে। যদি ভাবে করা দরকার, তাহলে মুহূর্তে সব রহস্যের কিনারা করে দিতে পারে।'

ডিনার শেষ করে আবার বাস্তুভিটায় ফিরে এল কিশোর ও মুসা। বাতাসের বেগ খুব বেশি। তাপমাত্রা নেমে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে মরুর এই রাতে।

'ওটা জ্বালানোর চেষ্টা করব?' পুরানো স্টোভটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। মিসেস কারসন এক ফ্লাস্ক গরম কফি বানিয়ে দিয়েছেন ওদেরকে, সকালের জন্য।

সেটা টেবিলে রেখেছে সে।

লণ্ঠন ধরিয়েছে কিশোর। বলল, 'বাতির আলোই চোখে পড়বে মারকির। স্টোভ জ্বেলে আর ধোঁয়ার সঙ্কেত দিয়ে কাজ নেই।'

তবু গিয়ে স্টোভের ভারি গোল ঢাকনাটা তুলল মুসা।

'একেবারে তৈরি করেই রেখে গেছে কেউ। ম্যাচটা দাও। সঙ্কেত দিতে নয়, ঘর গরম করার জন্য জ্বালব।'

দিয়াশলাইর বাক্সটা ছুঁড়ে দিল কিশোর। একটা কাঠি জ্বেলে স্টোভে রাখা কাঠের টুকরোর নীচের কাগজে ধরিয়ে দিল মুসা। ধীরে ধীরে ঝড়ছে আগুন, সেদিকে তাকিয়ে বলল সে, 'অবাক কাণ্ড!'

'কী?' পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'কাঁচা কাঠ ধরালে যেরকম আওয়াজ হয় সেরকম হচ্ছে, অথচ জ্বলছে শুকনো কাঠের মতই। একটু ধোঁয়াও নেই।'

আগুন খোঁচানোর শিক দিয়ে ওপরের কয়েকটা কাঠ সরাল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল মোটা সলতে, চিড়চিড় করেছে ওটাই।

লাফিয়ে সরে এল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'জলদি সরে এসো! ফিউজ জ্বলছে! ডিনামাইট!'

ছয়

হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ফ্লাস্কটাই থাবা মেরে তুলে নিল মুসা, আগুনে কফি ঢেলে আগুন নিভিয়ে ফেলার জন্য।

হাত চেপে ধরল কিশোর। 'পাগল হয়েছ?' মুসাকে টেনে নিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। লাফিয়ে বেরোল চত্বরে। মাথা নিচু করে ছুটল দুজনে। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর একটা ধাতব গামলার কাছে এসে ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে।

পড়ার সময় কাঁধে আর মাথায় আঘাত লেগে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারাল মুসা। হুঁশ ফিরলে দেখল, তাকে ঝাঁকাচ্ছে কিশোর। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে চলেছে, 'মুসা! এই মুসা! ঠিক আছো তুমি? ঠিক আছো···'

মুখ গুঁজে পড়ে ছিল মুসা। মুখে মাটি ঢুকে গেছে, কানের ভিতরে অদ্ভুত ঝিনঝিনে শব্দ। মাথার একপাশে ব্যাথা। ডান কাঁধে মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরেছে কেউ, নড়তে গেলেই খচ করে লাগে। বাঁ হাতে ভর দিয়ে কোনমতে উঠে বসল সে। দেখল বাস্তুভিটার সিডার কাঠের বেড়াগুলো জ্বলছে, আগুনের ফুলকিগুলো রাতের আকাশে অসংখ্য জোনাকি হয়ে উড়ছে। আনমনে মাথা নেড়ে হা-হা করে হেসে উঠল সে।

'কী হয়েছে? হাসছ কেন?' কিশোর অবাক।

'না, এমনি,' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। হাসতে গিয়ে ব্যথা লেগেছে কাঁধে। 'ভাবছি, বেঁচে তো আছি। না মরে গিয়ে অন্য দুনিয়া দেখছি?'

'শুয়ে পড়ো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'ওই ডিনামাইটের খেলাটা যে খেলেছে সে নিশ্চয় কাছে-পিঠেই রয়েছে। দেখতে আসতে পারে।'

'দেখবে আর কী? একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।' চাঁদের আলোয় চারপাশে তাকাচ্ছে মুসা। একটু আগেও যেখানে কেবিনটা ছিল, এখন সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। বেড়া আর মেঝের কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়েছে চত্বরে।

'ভাগ্যিস স্টোভের লোহার টুকরো এসে গায়ে লাগেনি,' কিশোর বলল। 'শেলের মত বিঁধত তাহলে।'

'স্টোভটা ফেটে যাওয়ায় আগুনও নিভে গেছে। নইলে দাবানল লেগে যেতে পারত। ঝোপঝাড়গুলো যা শুকনো।'

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে দেখছে ওরা ক্যাপরকের মাথার ওপর চড়ছে বাঁকা চাঁদ। বাতাসে দুলছে মেসকিট ঝাড়, নুয়ে নুয়ে পড়ছে, সাদা মাটিতে নানারকম সচল ছায়া সৃষ্টি করে ধোঁকা দিচ্ছে ওদের চোখে। মনে হয় মানুষ নড়ছে।

অবশেষে কিশোরের মনে হলো, কেউ যদি লুকিয়েই থাকে তাকে বের করে আনা দরকার। পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল পরিত্যক্ত উইন্ডমিলের পাশের একটা পুরানো স্টোরেজ ট্যাংকে। ফাঁপা শব্দ হলো। ব্যস, আর কিছু না।

'নেই বোধহয়,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'চলো, ট্রাকে উঠে পালাই।'

কাঁধের ব্যথা উপেক্ষা করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল মুসা। বলল, 'ওটাতেও বোমা বসিয়ে রাখেনি তো?'

কিশোর হেসে বলল, 'ভয় দেখাচ্ছ?'

'না, সাবধান হতে চাইছি। জ্বালানোর আগে স্টোভের ভিতরটা ভালমত দেখে নিলে...'

'বেশ তো। চালানোর আগে এবার ভালমত দেখে নেব।'

ক্রল করে পিকআপের কাছে চলে এল ওরা। খুব সাবধানে পরীক্ষা করে দেখল চাকা, সীটের পিছনে, নীচে, ইঞ্জিনের আশেপাশে।

'মনে হয় নেই,' মুসা বলল। 'চান্স একটা নেয়া যায়, কী বলো?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যায়। এখানে থাকা উচিত না আর। সকাল পর্যন্ত বসে থাকতে গেলে আবার কোন বিপদে পড়ব।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল মুসা। কিশোর বসল তার পাশে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে, লম্বা দম নিয়ে, আস্তে মোচড় দিল সে। দিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলল। যে ভয় করেছিল, সেটা ঘটল না—বোমা ফাটল না, তার বদলে গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

ঢাল বেয়ে এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকি খেতে খেতে নীচে নেমে চলল গাড়ি। টায়ারের নীচে খড়খড় করছে পাথর। দু'ধারে মেসকিট ঝাড়ে ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

উপত্যকায় পৌঁছে কাঁচা সড়কে উঠল পিকআপ। হেডলাইট জ্বালল মুসা।

গতি বাড়াল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে চায় র‍্যাঞ্চহাউসে। কিন্তু শত্রুর দেখা মিলল না। নির্জন পথ। শুধু একবার একটা অ্যান্টিলোপ হরিণ আলোর সামনে দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল একপাশ থেকে আরেকপাশে।

গাড়ি র‍্যাঞ্চে ঢুকতেই ঘেউ ঘেউ শব্দে পাড়া মাথায় করে ছুটে এল ন্যাপ। মুসা ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতেই অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল র‍্যাঞ্চহাউসের এখানে সেখানে।

সদর দরজায় উঁকি দিলেন কারসন। 'কী ব্যাপার?'

'বাজি পোড়ানোর শখ হয়েছিল জানি কার,' কঠিন কণ্ঠে বলল মুসা। 'বাস্তুভিটাটা উড়িয়ে দিয়েছে।'

সব শুনে কারসন বললেন, 'র‍্যাঞ্চে নিরাপদেই ঘুমোতে পারবে। ন্যাপের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে তোমাদের ক্ষতি করতে আসতে পারবে না কেউ।'

'হ্যাঁ, ঘুম দরকার আজকের রাতে,' মাথা দোলাল কিশোর। 'কাল অনেক কাজ। সকালে উঠেই আর্মস্ট্রঙে যাব, আলট্রালাইটের তার আনতে। তারপর খুঁজতে বেরোব বেন ফ্রেনটিসকে। জিজ্ঞেস করব, ডিনামাইট নিয়ে খেলতে ওর কতটা ভাল লাগে।'

*

পরদিন সকালেও মুসার কাঁধের ব্যথাটা সামান্য রয়ে গেল। আর কোন অসুবিধে নেই। সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে, ফলে আর্মস্ট্রঙে রওনা হতেও দেরি হয়ে গেল। সেই জায়গাটা পেরিয়ে এল, যেখান থেকে টর্নেডো ওদের ট্রাক উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

'বীমা করা না থাকলে অনেকগুলো টাকা গচ্চা যেত আংকেলের,' দোমড়ানো ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল মুসা।

আর্মস্ট্রঙে পৌঁছে ফোন বুক দেখে বেনের ঠিকানা বের করল কিশোর। স্কোয়্যারের কাছ থেকে দুই ব্লক দূরে একটা পুরানো বাড়িতে থাকে সে।

'এখন থাকার কথা নয়,' বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল কিশোর। 'কাজে গিয়ে থাকতে পারে। ওকে না পেলে পড়শীদের কাছে খোঁজ নেব। ওর সম্পর্কে জানার চেষ্ট করব।'

দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে শোনা গেল কড়া কণ্ঠ, 'এই, কে?'

'মিস্টার ফ্রেনটিস?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভাগো! আমি এখন টাকা দিতে পারব না। একটা কানাকড়িও নেই।'

'আমরা বিল চাইতে আসিনি, মিস্টার ফ্রেনটিস। আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।'

'আমার সাহায্য?' সন্দেহ ফুটল ফ্রেনটিসের কণ্ঠে। 'আমারই তো এখন সাহায্য দরকার।...আচ্ছা দাঁড়াও।'

খুলে গেল দরজা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে লোকটা। কতদিন দাড়ি কামায়নি কে জানে। বেঁশ গোলগাল একখান ভুঁড়ি। বগলের নীচে ক্রাচ। প্যান্টের

ডান পা-টা ছেঁড়া, পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত প্লাস্টার করা। 'হ্যাঁ, বলে ফেলো। তাড়াতাড়ি করবে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর ও মুসা। বাস্তুভিটায় গিয়ে বোমা পেতে রেখে আসার মত অবস্থা নয় বেনের।

সামান্য দ্বিধা করে কিশোর বলল, 'শুনেছি কারসন র‍্যাঞ্চে চাকরি করতেন আপনি?'

'করতাম। তাতে কী?' খেঁকিয়ে উঠল বেন।

'ওখানে কিছু গোলমাল হচ্ছে,' মুসা বলল। 'তথ্য জানতে চাই।'

ওদের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বেন। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি কিচ্ছু বলব না!'

'পল ব্যানউড নিখোঁজ হয়েছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। আশা, বন্ধুর কথা শুনে যদি নরম হয় লোকটা।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর ফাঁক হলো দরজা। 'পলের কী হয়েছে?'

'দুই রাত আগে গায়েব হয়ে গেছে।'

আবার পুরো খুলে গেল দরজা। 'ভিতরে এসো।' পথ দেখিয়ে খুদে একটা লিভিংরুমে ছেলেদের নিয়ে এল বেন। যত্রতত্র পড়ে রয়েছে অসংখ্য বীয়ারের খালি ক্যান। নড়বড়ে একটা চেয়ারের ওপরে, নীচে গার্দা করা পুরানো খবরের কাগজ। চেয়ারের কাগজগুলোর ওপরেই বসে পড়ল সে। 'কারসনটা আস্ত পাজী। তবে পল ছেলেটা ভাল।'

প্লাস্টারের দিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'পা ভাঙলেন কবে?'

'গত হপ্তায়। একটা ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে বেমক্কা পড়লাম বেড়ার ওপর। কিছুদিনের জন্য গেলাম ঘর-বন্দি হয়ে।' ভ্রূকুটি করল সে। 'পল কবে নিখোঁজ হয়েছে বললে?'

'রোববার রাতে। বাস্তুভিটায় আলো দেখে কৌতূহল হয়, দেখতে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। ভাবছি, পুকর পাড়ে গরু মরার সাথে তার নিরুদ্দেশের কোন সম্পর্ক আছে কিনা।' বেনের চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'গরু মরার খবর শুনেছেন?'

'শুনেছি। ভাল ভাল গরুগুলো মরে যাচ্ছে, খারাপই বলতে হবে।' বাঁকা হাসি হাসল বেন। 'কারসনের ওপর চটে গেছে কেউ।'

'কে, আন্দাজ করতে পারেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

দাড়ি চুলকাল বেন। 'নাহ্! বলাটা বোধহয় উচিত হবে না, আমার আন্দাজ ঠিক না-ও হতে পারে। ভাবছি, ওই নেটিভ আমেরিকানটা না তো?' শুকনো হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'লোকে বলে, বুড়োটা নাকি জাদু জানে। হয়তো জাদু করেই পানিকে লবণ বানিয়ে ফেলেছে।'

*

'লোকটাকে কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। বেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে

এসে একটা ছোট মেকসিকান রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে দু'জনে। কিছু খাওয়ার জন্য। বসেছে একটা আবছা অন্ধকার কোণে।

'ভাল না,' স্যান্ডউইচে কামড় বসাল মুসা। 'তবে ওকে সন্দেহের খাতা থেকে বাদ দিতে চাইছি। ও বোধহয় এসব করেনি। কারসনের কথা উঠলেই কেমন রেগে যাচ্ছিল দেখলে। ও এসব করে থাকলে রাগত না রেখেঢেকে কথা বলত।'

'তা ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'পায়ের যা অবস্থা, একা তো চলতেই পারে না। সাহায্য করার জন্য কাউকে যে ভাড়া করবে, সেই টাকাও নেই। তেমন কোন পরম বন্ধু আছে বলেও মনে হয় না।'

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে মুসাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফিরে তাকাল কিশোর। একটা টিনএজ মেয়ে। সুন্দরী। পরনে জিনস, পায়ে হাইকিং বুট, লম্বা কালো চুল কোমরের ওয়েস্টার্ন বেল্ট ছুঁই ছুঁই করছে। রোদে পোড়া চেহারা আর সহজ হাঁটাচলা দেখেই অনুমান করে নেয়া যায়, ঘরে বসে থাকার মেয়ে নয়।

'হাই, জুলি,' কাউন্টারের ওপাশ থেকে ডাক দিল ম্যানেজার।

'হেই, ডজ,' লোকটাকে একটা চমৎকার হাসি উপহার দিয়ে কাউন্টারের সামনে বসল মেয়েটা। এক মগ কফি ঠেলে দিল তার দিকে ম্যানেজার। টেনে নিয়ে জুলি বলল, 'বালির পাহাড়টায় গিয়েছিলাম, নমুনা জোগাড় করতে।'

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। তার সব চেয়ে মধুর হাসিটা উপহার দিল। 'এক্সকিউজ মী! বালির পাহাড় বললেন। ক্যাপরকের কাছে যে, ওটা?'

ফিরে তাকাল মেয়েটা, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটার চোখে 'কে-তুমি-বাপু?' দৃষ্টি। মুচকি হাসল মুসা। জানে, মেয়েটার ওই দৃষ্টি থাকবে না বেশিক্ষণ, কিশোরের কবলে পড়েছে।

'আমি কিশোর পাশা,' বলে কোণের টেবিলের দিকে হাত তুলল। 'আর ও আমার বন্ধু মুসা আমান। কারসন র‍্যাঞ্চে বেড়াতে এসেছি আমরা। কিছু কিছু নমুনা আমরাও জোগাড়ের চেষ্টা করছি।' হাসল সে। 'আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সন্দেহ দূর হয়ে গেল মেয়েটার চোখ থেকে। কালো চোখের তারা এখন চকচকে। টুল থেকে উঠে কফির মগটা তুলে নিল। 'ও, তোমরাই তাহলে সেই দু'জন, যারা এসেই শহরের লোককে জেরা শুরু করেছ, টর্নেডোর মধ্যে বাইরে বেরিয়ে ট্রাক নষ্ট করেছ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, আমরাই।'

'আমি জুলিয়া মারটিংগেল,' হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। তারপর এগোল মুসার সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য। তারপর স্পষ্ট করে বলে দিল, ওকে আপনি-আপনি করার দরকার নেই, তুমি করে বললেই চলবে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কে, কী করে বুঝলে?'

টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসল জুলি। লম্বা চুলের বোঝা নেচে উঠল

পিঠে। 'এসব শহরে তুফানের বেগে খবর ছড়ায়। সব শুনেছি আমি। তোমাদেরকে দেখেই বুঝেছি তোমরাই সেই ছেলে।' মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো জুলি। হাসি মলিন হলো। 'পলের খবর কী?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'কোন খবর নেই।'

'চেনো নাকি ওকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'নিশ্চয়ই। একসাথে হাই ইস্কুলে পড়েছি আমরা,' জুলি বলল। 'তারপর র‍্যাঞ্চের কাজে ঢুকে গেল সে, আমি চলে গেলাম ইস্টার্ন নিউ মেকসিকো ইউনিভার্সিটিতে।' চুপ করে থাকল এক মুহূর্ত। 'ভূগোল পড়েছি। সেই সাথে নৃবিজ্ঞানের চর্চাও করেছি কিছুটা।'

আবার এক মুহূর্ত নীরব থেকে হাসল জুলি। 'এখানকার নেটিভ আমেরিকানদের ব্যাপারে সব সময়ই একটা কৌতূহল আছে আমার। এবারের গরমের ছুটিতে বেশ আনন্দেই আছি আমি। বি এল এম একটা কাজ দিয়েছে আমাকে। মাটির নীচে পানির লেভেল সার্ভে করতে এসেছে ওরা।'

'বি এল এম?' কিশোরের চোখে প্রশ্ন।

'ব্যুরো অভ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।' এক এক করে দুই গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাল জুলি। 'এখানে সরকারি জমি দেখাশোনার ভার ওদের ওপরই।'

পরের আধঘণ্টা এক নাগাড়ে কথা বলে গেল জুলি। কারসন র‍্যাঞ্চের আশেপাশের এলাকা যে তার পরিচিত শুধু তা-ই নয়, এখানকার ইতিহাসও তার জানা। পুরো এলাকায় এখন পরিস্থিতি কেমন, কী কী ঘটছে, সব মুখস্থ।

'কাল রাতে শহরে নাচের ব্যবস্থা করেছে দেখতে পাচ্ছি,' দেয়ালে সাঁটানো একটা পোস্টার দেখিয়ে বলল মুসা।

'যাওয়ার ইচ্ছে আছে মনে হয়?' হেসে বলল জুলি। 'নাচতে ইচ্ছে করলে চলে এসো।'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোল কিশোর।

'কী ভাবছ?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি, নাচতে যাব নাকি?'

'তুমি নাচবে?'

'উঁহু। তুমি নাচবে। আমার চেয়ে ভাল নাচতে পারো তুমি। জুলিকে সঙ্গী বানিয়ে নাচবে।'

'পাগল হয়ে গেলে!'

'না।'

কিছু একটা ভাবছে কিশোর, বুঝতে পারছে মুসা। কিন্তু কিশোর নিজে থেকে না বললে হাজার প্রশ্ন করেও তার মুখ খোলাতে পারবে না। অতএব সে-চেষ্টা করল না।

পিকআপের কাছে পৌঁছে ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজার দিকে এগোল সে, কিশোর গেল অন্য পাশ দিয়ে।

হাতলের দিকে হাত বাড়াল মুসা। 'আশ্চর্য! জানালাটা খোলা রেখে গিয়েছিলাম নাকি?'

'মুসা!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'খবরদার, হ্যান্ডেলে হাত দিয়ো না! সরাও, সরাও!'

হাত সরিয়ে জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল মুসা। হাতলের ভিতরের অংশ থেকে সরু একটা হলদে তার চলে গেছে স্টিয়ারিং হুইলের নীচে, একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে।

'ব্যাগের মধ্যে বোমা!' বিড়বিড় করল মুসা।

'দাঁড়াও, ফিউজটা নষ্ট করে দিচ্ছি,' বলে হাত বাড়াল কিশোর। সাবধানে চেপে ধরল তার পাশের দরজার হাতল।

এই সময় মুসার চোখে পড়ল ওটা। তার একটা নয়, দুটো। আরেকটা একই রকম হলদে তার অন্যদিকের হাতল থেকেও এসে ঢুকেছে ব্যাগের ভিতর। কিশোর দরজা খুললেই বোমা ফাটবে!

সাত

'কিশোর! খুলো না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পারলে পিকআপের ছাতের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কিশোরকে থামায়।

যেন বিদ্যুতের শক খেয়েছে, এমনিভাবে ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল কিশোর। 'দু'দিক থেকেই শয়তানী করে রেখে গেছে!'

'করবেই তো। সে কী আর জানে কোন পাশের দরজা আগে খুলব আমরা?'

খোলা জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। সাবধান রইল যাতে কোনমতেই ফ্রেমের সাথে না লাগে। দরজা আর সীটের মাঝের একটা খাঁজে বসানো রয়েছে একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ, আধ-খোলা। দুটো তারের মাথা এমনভাবে লাগিয়েছে, যাতে ফাঁদটা বন্ধ হলেই মাথা দুটো পরস্পরের সাথে লেগে যায়। যে কোন দিক থেকেই হোক, টান দিয়ে দরজা খুললেই বন্ধ হয়ে যাবে ফাঁদ। বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা করবে।

'সহজ সুইচ, কিন্তু কাজ হবেই,' কিশোর বিড়বিড় করল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। স্যান্ডউইচের একটা ফেলে দেয়া মলাটের বাক্স। সেটা তুলে এনে মুসাকে বলল, 'সরে যাও। কম করে বিশ কদম। দানবটাকে অকেজো করে দিচ্ছি আমি।'

মুসা নিরাপদ জায়গায় সরে যেতেই লম্বা দম নিল কিশোর। হাত সহ আবার মাথা ঢুকিয়ে দিল জানালা দিয়ে। ফাঁদের দুই সারি দাঁতের মাঝে বাক্সের একটা ছেঁড়া টুকরো গুঁজে দিয়ে, সাবধানে দু'দিক থেকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে বন্ধ করে

দিল ফাঁদটা। মলাটের জন্য মিলিত হতে পারল না খোলা তারের মাথা, সুইচিং হলো না, বোমাও ফাটল না।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল কিশোর। ড্রাইভারের পাশের দরজা আর সীটের মাঝের খাঁজেও একই রকম একটা ইঁদুর ধরার ফাঁদ। একইভাবে ওটাকেও বন্ধ করল। দরদর করে ঘামছে। যতটা না গরমে, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায়। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মুসাকে ডাকল, 'হয়েছে। আসতে পারো। আমি ব্যাগ খুলছি।'

'যদি ওটাতেও ফাঁদ থাকে?'

'মনে হয় না। আর থাকলে ফাটবে কীভাবে? দরজার সঙ্গে তার লাগিয়েছিল, যাতে টান লেগে ইঁদুরের কল বন্ধ হয়ে যায়।'

তবু সতর্ক রইল কিশোর। খুলল ব্যাগটা। ভিতরে চারটে টর্চের ব্যাটারি আর সাতটা ডিনামাইটের স্টিক সুন্দর করে বাঁধা। ব্যাটারিগুলো রয়েছে একটা প্লাস্টিকের ছোট বাক্সে। পজিটিভ সাইড থেকে একটা তার বেরিয়েছে, নেগেটিভ সাইড থেকে একটা। সংযোগ দেয়া হয়েছে স্টিকগুলোর সঙ্গে। আস্তে করে জিনিসগুলো বের করে আনল সে। তারের সংযোগ দেখাল। তারপর একটানে ছিঁড়ে ফেলল একটা তার। ডিনামাইটের বান্ডিল খুলতে বেরোল ছোট একটা ধাতব সিলিন্ডার।

'ব্যস, হয়ে গেল,' বোমা আর ব্যাটারি আলাদা রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'পরিষ্কার।'

'আরও আছে কিনা আল্লাহই জানে,' সন্দেহ যচ্ছে না মুসার। ভালমত খুঁজে দেখা হলো গাড়ির ভিতর। আর বোমা পাওয়া গেল না।

'নাহ্, নেই,' ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে বলল মুসা। 'এবার যাওয়া দরকার। আলট্রালাইটের তারের কথা ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি।'

'কী ভাবছ?'

'একটা কথা।'

'কী কথা?' ভুরু তুলল মুসা।

'ভাবছি, জুলিয়া মারটিংগেলের কথা। সত্যিই কি নাচবে ও তোমার সঙ্গে?'

কিশোরের রহস্যময় কথার মানে বুঝতে পারল না মুসা।

*

কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেক জায়গায় খুঁজে বেড়াল ওরা। আলট্রালাইটের নিয়ন্ত্রণ আবার ঠিক করা যায়, এরকম একটা স্টেইনলেস স্টীলের তার পেল না কোথাও। শেষে বাধ্য হয়ে বিমানটার প্রস্তুতকারীদের ফোন করতে চলল কিশোর।

'স্কাই স্ট্রিক অ্যাভিয়েশন,' ওপাশ থেকে বলল একটা নারীকণ্ঠ।

'আমার নাম কিশোর পাশা। সেদিন স্কাই স্ট্রিকের ওয়ান জিরো সেভেন মেশিনটা উড়াচ্ছিলাম। আকাশে থাকতেই হঠাৎ হালের তারটা ছিঁড়ে গেল। এখন আরেকটা

তাকে কথা শেষ করতে দিল না মেয়েটা। 'ইমপসিবল! আমাদের আলট্রালাইটের হালের তার কখনও ছেঁড়ে না। অন্তত যেভাবে বলা হচ্ছে ওভাবে তো নয়ই।'

'কিন্তু ছিঁড়ল তো। আরেকটা তার দরকার আমার। নইলে উড়তে পারছি না।'

লাইনের ওপাশে আলোচনা চলল প্রায় আধমিনিট। তারপর আবার ফোনে কথা বলল মেয়েটা। 'ওয়ারেন্টি দেয়া আছে আমাদের, অসুবিধা নেই। রাতের এক্সপ্রেসেই আরেকটা নতুন তার পাঠাচ্ছি।' দ্বিধা করল মেয়েটা। 'একটা কাজ করতে পারেন? ছেঁড়া তারটা পাঠিয়ে দিতে পারবেন, প্লীজ? আমাদের ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা করে দেখতে চান। তিনি খুব অবাক হয়েছেন।'

'ঠিক আছে। আর্মস্ট্রঙের প্যাকেজ ডিপো থেকে নতুন তারটা নিয়ে নেব আমি, পুরানোটা পাঠিয়ে দেব।'

শেষ বিকেলে কারসন র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হতে পারল আবার দুই গোয়েন্দা। ফেরার পথে ক্যাপরক স্টোরের কাছে থামল সোডা খাওয়ার জন্য।

'এসেছ, খুশি হলাম,' ওদেরকে স্বাগত জানাল সাদা-চুল বুড়ো। 'তোমাদের জন্য খবর আছে।'

'কী খবর?' প্রায় একসাথে বলে উঠল কিশোর ও মুসা। 'আবার কোন অঘটন নয় তো?'

'একটু আগে মারকি এসেছিল তোমাদের খুঁজতে।'

'কী চায়?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ওর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বলেছে। খুব নাকি জরুরী।'

সরু হয়ে এল মুসার চোখের পাতা। 'কীভাবে যাব?'

'ক্যাপরকের গোড়ায় গিয়ে একটা পুরানো সার্ভে রোড পাবে। ওই রাস্তায় নেমে দক্ষিণে যাবে আধমাইল। পুরানো বাড়িঘরের একটা ধ্বংসস্তূপ পাবে। ওখানেই মারকির ঝুপড়ি।'

রওনা হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

ক্যাপরকের পাদদেশে যেখানে হাইওয়েটা সবে শুরু হয়েছে, একটা কাঁচা রাস্তা দেখা গেল তার কাছে। দু'ধারে মেসকিটের ঝাড়। দেখে মনে হয় সারাটা গ্রীষ্মকাল ওপথে কোন গাড়ি চলেনি।

'এই রাস্তাই,' কিশোর বলল।

কাঁচা পথটায় গাড়ি নামাল মুসা। আধমাইল পেরোনোর আগেই ওদের বাঁয়ে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল। ঢালু ঢাল হঠাৎ খাড়া হয়ে গেল। রুক্ষ চূড়াটা অনেক উঁচুতে। রাস্তাটা চলে গেছে ঢালের গোড়া দিয়ে, এত সরু, একটা গাড়ি কোনমতে চলতে পারে।

'রাস্তা বটে,' বলেই শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরাল মুসা, বড় একটা পাথর এড়ানোর জন্য। দেখে মনে হয় গড়িয়ে এসে পথে পড়ার জন্য তৈরিই হয়ে আছে ওটা।

হেসে কিশোর বলল, 'যা এলাকা। মারকির সাথে দেখা করতে বেশি লোক আসে না নিশ্চয়।' সামনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। 'ধুলো দেখেছ? মেঘের মত উড়ছে। কোত্থেকে আসছে?'

মুসাও দেখতে পেয়েছে। গড়িয়ে গড়িয়ে যেন এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। আরেকটা ঘূর্ণিঝড়? না। ধুলোর ভিতরে বিশাল ট্রাকের নাকটা অস্পষ্ট চোখে পড়ল।

সোজা এগিয়ে আসছে ট্রাকটা।

আট

যতটা সম্ভব ডানে কাটল মুসা। সড়সড় করে পিকআপের শরীরে বাড়ি মারছে ঝোপঝাড়, ছালচামড়া তুলে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে যেন। দুটো চাকা রাস্তা থেকে পড়ে গেল। ভীষণ ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে গাড়ি। স্টিয়ারিং সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। পিকআপের প্রায় গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে শুধু ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল মুসার। 'দৈত্য!' ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল মুসা।

'ম্যাক ট্রাক। ট্রেলারও দেখলাম,' কিশোর বলল।

'এরকম গাড়িতে করে এনেই লবণ ফেলেনি তো?'

'অসম্ভব না। বুঝলে, ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগল না আমার কাছে। যেন আমাদের অপেক্ষায়ই ঘাপটি মেরে বসেছিল। যেই এলাম, ছুটে এল ধাক্কা মারতে।'

'পিছু নিই,' বলে আবার পিকআপের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রাস্তায় তুলতে পরল না গাড়িটা। চাকা পড়েছে খাদে। বনবন করে ঘুরছে, আলগা পাথর আর ধুলো ছিটাচ্ছে, কিন্তু মাটিতে কামড় বসাতে না পারায় উঠতে পারছে না।

নেমে গিয়ে দেখল কিশোর। বলল, 'বাদ দাও। হবে না। ভালমতই আটকেছে।'

আধঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পর অবশেষে খাদ থেকে চাকা তোলা সম্ভব হলো। আবার ঝাঁকুনি খেতে খেতে কাঁচা পথ ধরে ছুটল পিকআপ।

হাইওয়ে থেকে নামার পর ঠিক আধমাইলের মাথায় একটা ছোট জলাশয়ের পাশে কুঁড়েটা দেখতে পেল ওরা। সাদা রঙ করা বেড়া। পুরানো টিনের চাল। সামনের উঠানে এনে গাড়ি রাখল মুসা। ধুলোবালি পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে উঠানটার। গোটা দুই মুরগী চরছে। মরচে পড়া পুরানো একটা পানির ড্রামের

পাশের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা ছাগল। কুঁড়ের দরজা খোলা।

'মারকি ?' ডাক দিল কিশোর। 'এই মারকি, আছেন?'

জবাব দিল শুধু ছাগলটা। কয়েকবার ম্যা ম্যা করে। দরজার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিল ওরা। ছোট ঘর। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে একটা চারপায়া, কম্বল বিছানো। এককোণে ছোট তাক।

'খুব পরিষ্কার,' মন্তব্য করল কিশোর।

'হ্যাঁ। আর খুব শান্ত। গির্জার ভিতরটা যেমন থাকে, অনেকটা তেমনি।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'মনে হয় এটাই মারকির মন্দির। ভিতরে ঢুকি, কি বলো?' দ্বিধা করছে সে।

'আমি তো বাধা দেখি না। আমাদের আসতে বলেছে সে, ইচ্ছে করে তো আসিনি।'

ভিতরে ঢুকল ওরা। তাক বোঝাই মোমবাতি আর হাতে তৈরি বাসন-পেয়ালা। বড় বাটিতে রয়েছে নানারকম শুকনো শিকড়-বাকড়, রঙিন বালি, আর অচেনা পাউডার। নীচের তাকে সাদা ছাগলের চামড়ায় মোড়া একটা পুঁটুলি। ওটার পাশে স্তূপ করে রাখা র‍্যাটল সাপের দাঁত, আর আধডজন লেজ। তাকের পাশে ঝোলানো একটা সাপের চামড়া।

'র‍্যাটলস্নেকের দুশমন নাকি লোকটা?' কিশোর বলল।

'কী জানি, ওষুধ-টষুধ বানায় হয়তো। কিংবা ওঝা গোছের কিছু। অনেক নেটিভ আমেরিকানের বিশ্বাস, জন্তু-জানোয়ারের আত্মা মানুষকে শক্তি জোগায়, তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।'

'হুঁ! সত্যিই জোগায় কিনা কে জানে!' পোঁটলাটা দেখাল মুসা, 'ওটায় কী?'

'মারকির ওষুধের পোঁটলা হবে।'

এগিয়ে গেল মুসা। 'এই দেখো, এটা কী?'

পোঁটলার পিছনে রাখা ছোট একটা পাইন কাঠের তৈরি বোর্ড। বিচিত্র কতগুলো সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা। ডান পাশে একটা বৃত্তের ভিতরে আঁকা ইংরেজি 'সি' অক্ষর। ওটার সামান্য ওপরে কতগুলো আঁকাবাঁকা রেখা। বাঁয়ে তিনটে বৃত্ত, একটা আরেকটার মাঝে ঢুকে গেছে।

বৃত্ত তিনটে দেখিয়ে মুসা বলল, 'অলিম্পিক খেলার এই চিহ্ন একেঁছে কেন?'

'অলিম্পিক নয়,' দেখে কিশোর বলল। 'ওরটেগার র‍্যাঞ্চের সিমবল। আর বৃত্তের মাঝে যে লিখেছে, সেটা দিয়ে বুঝিয়েছে কারসনের র‍্যাঞ্চ।'

'রেখাগুলো?'

'শব্দের ঢেউয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্নের মত লাগছে আমার কাছে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল মুসা। 'মারকি নিশ্চয় একথা বোঝাতে চায়নি। ওই রেখার মানে হলো দুটো র‍্যাঞ্চের মাঝে বিরোধ রয়েছে।'

ভুরু তুলল কিশোর। 'তা হতে পারে। বোঝা যাচ্ছে মারকি অনেক কিছুই জানে। ওর মুখ খোলাতে পারলে কাজ হতো। পেলাম তো না। আমাদের আসতে

বলে কোথায় গেল কে জানে। পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। এসো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।'

রাস্তায় বেরোতেই আবার ম্যা ম্যা করে ওদেরকে যেন বিদায় জানাল ছাগলটা।

মারকির দেখা পাওয়া গেল না। আবার পিকআপে উঠল ওরা।

*

ক্যাপরকের ওপরের বাংকহাউসে ফিরে এসে ফ্রিজ থেকে একটা পিৎসা বের করে মাইক্রোওয়েভ আভনে ঢুকিয়ে দিল মুসা। কিশোর ফোন নিয়ে ব্যস্ত হলো। সারা দিন যা যা ঘটেছে, কারসনকে জানাল। সব কথা জানিয়ে শেষে বলল, 'রাতে বাংকহাউসেই থাকব। কাল অনেক কাজ সারতে হবে।'

'কী কাজ?' কিশোর লাইন কেটে দিলে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আংকেলকে ওই সঙ্কেতগুলোর কথা জিজ্ঞেস করলে না কেন?'

খাবার টেবিলের সামনে এসে বসল কিশোর। 'বিরক্ত করতে চাইলাম না। ওরটেগার সঙ্গে তাঁর খারাপ সম্পর্কের কথা তিনি বলতে চান না, সেদিনই বুঝেছি।' পিৎসায় কামড় বসিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ চিবাল সে। তারপর বলল, 'আদালতে গিয়ে রেকর্ড ঘেঁটে জানার চেষ্টা করব সম্পর্ক সত্যিই খারাপ কিনা। হলে কতটা এবং কেন?'

*

পরদিন সকাল ন'টায় আর্মস্ট্রঙের স্কোয়্যারে এনে গাড়ি রাখল মুসা। বড় একটা কটনউড গাছের তলায় রয়েছে কয়েকটা গ্র্যানিটের স্মৃতিফলক, যুদ্ধের সময়কার কিছু স্যুভনির। অন্যান্য অনেক জিনিসের মাঝে একটা ছোট কামান, এমনকি একটা জাহাজের নোঙরও রয়েছে। আদালত বাড়িটার ছাত গম্বুজ আকৃতির। এখানে এই ধরনের বাড়ি কে বানাল, ভেবে অবাক হলো দুই গোয়েন্দা। ভিতরে মোজাইক করা মেঝে। কাঁচের একটা দরজার ওপরে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে : কাউন্টি ক্লার্ক।

মার্বেল পাথরে তৈরি কাউন্টারের ওপাশে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। 'কী করতে পারি?' বলেই মুসার দিকে তাকিয়ে হৈ-হৈ করে উঠলেন, 'আরে কী কাণ্ড! একেবারে আমার নাতির মত চেহারা তোমার! বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

হাসল মুসা। 'তাই নাকি? আপনার নাতি কোথায় থাকে? দেখতে ইচ্ছে করছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই পুরো পরিবারের বর্ণনা দিয়ে ফেললেন বৃদ্ধা। মুসাকে পছন্দ করে ফেলেছেন, তাঁর কথা আর দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, নিশ্চয় কোন কাজে এসেছে ছেলেরা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কীজন্য এসেছ বললে না তো?'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'ক্যাপরকের কাছে দুটো র‍্যাঞ্চ আছে, জানেন, কারসন র‍্যাঞ্চ আর ওরটেগা র‍্যাঞ্চ। ও'দুটোর দলিলগুলো একটু দেখতে চাই।

গরু চরানোর যেসব মাঠ আছে, ওগুলোর লীজের দলিলও নিশ্চয় আছে।'

'আছে। মিনারেল লীজগুলোও দেখতে চাও?' মহিলা বললেন।

'নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ।'

মিনিট কয়েক পরেই একগাদা ফোল্ডার নিয়ে এলেন বৃদ্ধা। আশি বছর আগে সরকারের কাছ থেকে জায়গা ডেকে নিয়েছিল ওরটেগা পরিবার, পরিষ্কার দলিল। কারসনের জায়গা ডেকে নেয়া নয়, কেনা। বিশ বছর আগে কিনতে শুরু করেছিলেন জ্যাক কারসন। কিছু চারণক্ষেত্র আর খনির জায়গার দলিল আছে বিশ বছর আগের, কিছু ইদানীংকার।

'বেশ জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

জবাব না দিয়ে লীজের দলিলের তারিখগুলো টুকে নিতে লাগল কিশোর।

'জায়গা-জমির ব্যাপার কিছুটা জটিলই হয়,' মুসার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন বৃদ্ধা। 'তবে যা-ই ঘটো, ওই এলাকায় র‍্যাঞ্চ করে মিস্টার কারসনই সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছেন।'

'মিনারেল লীজ নিয়েছে কেন লোকে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'লাভটাভ হয়?'

শ্রাগ করলেন মহিলা। 'কী জানি? মনে হয় না। ওই এলাকায় কেউ কিছু পায়নি। মিস্টার কারসন হয়তো জায়গাগুলো আটকে ফেলেছেন, যাতে খনিজ শিকারীরা এসে নষ্ট করতে না পারে। নষ্ট করলে অবশ্য কোম্পানিই ক্ষতিপূরণ দেয়, তবে কিছু লোকের ধারণা, ক্ষতি যা করে তারচেয়ে অনেক কম দেয়।'

'সব খবরই দেখছি রাখেন আপনি,' হেসে বলল মুসা। 'আচ্ছা, ওরটেগা আর কারসন র‍্যাঞ্চে নাকি কী কী সমস্যা আছে? জানেন কিছু?'

দ্বিধা করলেন বৃদ্ধা। 'ওসব লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আলোচনা করা ঠিক না। তবু বলি, শুনেছি, কয়েক বছর ধরেই সম্পর্ক খারাপ যাচ্ছে দু'জনের। দুটো র‍্যাঞ্চের সীমানার কাছে খানিকটা পশু চরানোর জায়গা নিয়ে গোলমাল।' হাসলেন তিনি। 'হয়তো জিজ্ঞেস করবে আমি জানলাম কীভাবে? ওই বসন্তে অকশান বার্নে কাজ করেছে আমার স্বামী। সে বলে, সবাই জানে, করসনের অনেক বাছুরের গায়ে ওরটেগার লেবেল রয়েছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন,' চমকে গেছে মুসা, 'মিস্টার কারসনের বাছুরের গায়ে ওরটেগা র‍্যাঞ্চের ছাপ দিয়ে দিয়েছে ওরটেগা?'

'অবশ্যই প্রমাণ হয়নি সেকথা,' দ্বিধার সঙ্গে বললেন মহিলা। 'তবে, এত কিছুর পর আর ওরটেগার সাথে কারসনের ভাল সম্পর্ক থাকার কথা নয় নিশ্চয়।'

ফাইলগুলো বন্ধ করল কিশোর। 'নেটিভ আমেরিকান কোনও জমিদার নেই এখানে?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা। 'না।'

'শুনলাম,' মুসা বলল, 'ক্যাপরকের কিছু জায়গা ওদের পবিত্রভূমি?'

'ও, লসন ব্লাফের কথা বলছ বোধহয়।' পিছনের দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপের

দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। ক্যাপরকের শৈলশিরা থেকে বেরিয়ে থাকা একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'আসলে ওটা কারসনের সীমানার মধ্যেই। ওরটেগার সীমানার লাগোয়া উত্তরে। জায়গাটার নাম লসন ব্লাফ হয়েছে তার কারণ ওখানে লসন পরিবারকে খুন করেছিল ইনডিয়ানরা। ওরা বলে পবিত্রভূমি, তবে আইনত ওটা নেটিভদের জায়গা নয়।'

নোট লেখা কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল কিশোর। 'সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

সামনে ঝুঁকে তার একটা মধুর হাসি বৃদ্ধাকে উপহার দিয়ে মুসা বলল, 'আপনার নাতিকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।'

'জানাব,' কথা দিলেন বৃদ্ধা।

*

'জুলিকে একটা ফোন করো না,' আদালত থেকে বেরিয়ে কিশোর বলল। 'জিজ্ঞেস করে দেখো, এক কাপ কফি খাবে কিনা আমাদের সাথে।'

ভ্রুকুটি করল মুসা। 'তুমি এখনও ভাবছ বোমা পেঁতে রাখায় ওর হাত ছিল?'

'অসম্ভব কী? তা ছাড়া ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। বলে দেখো, আসে কিনা।'

ফোন করতে গেল মুসা। ফিরে এসে জানাল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জুলি আসছে।

আলট্রলাইটের তারটা এসেছে কিনা দেখার জন্য এক্সপ্রেস প্যাকেজ ডিপোর দিকে চলল দু'জনে। পথের পাশে একটা কাপড়ের দোকান দেখে তাতে ঢুকে দুই জোড়া নতুন বুট আর দুটো ওয়েস্টার্ন হ্যাট কিনল।

'জুলি আসতে এখনও অনেকক্ষণ,' হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। 'কী করে সময় কাটাই?' আরেকটা দোকান দেখে বলল, 'চলো, ঢুকে দেখি, কিছু মেলে কিনা।'

'খাইছে!' ভিতরে ঢুকেই বলে উঠল মুসা। সামরিক বাহিনীর বাতিল করা জিনিসপত্রে বোঝাই দোকানের তাকগুলো।

কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে গুলি আছে?'

'আছে,' জবাব দিল লোকটা। 'এম-সিক্সটিন আর কিছু ফরটি ফাইভ।' একটা কাঁচের বাক্স খুলল। 'তোমার কী জিনিস দরকার?'

'দরকার নেই। কয়েকটা গুলির খোসা পেয়েছিলাম,' বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর। 'দেখতে চাইছিলাম, আস্ত গুলিটা কেমন।' এম-১৬ বুলেটগুলোর ক্যালিবার .২২৩, সে যেগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিল তারচেয়ে অনেক ছোট। তারপর চোখে পড়ল আরও বড় কিছু গুলি। মাথায় কালো রঙ করা।

কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে গুলিগুলোর দিকে তাকাল ক্লার্ক। 'ব্রিটিশ থ্রি জিরো থ্রি। ইস্পাতের পাত ছিদ্র করে ফেলে।' একটা বুলেট বের করে কিশোরের

হাতে দিল। গোড়ায় নম্বর লেখা রয়েছে ফোরটি থ্রি।

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল মুসা। 'খোসাগুলো আমরা যেগুলো পেয়েছিলাম সেরকম। কী রাইফেলের?'

'থ্রি জিরো থ্রি। আরমার প্লেট ছেঁদা করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লি-এনফিল্ড রাইফেলে ব্যবহার করত ব্রিটিশরা।' দেয়ালে ঝোলানো ভারি একটা রাইফেল দেখাল সে।

গুলিটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'কী রকম বিক্রি হয়?'

'খুব একটা হয় না,' আগের জায়গায় গুলিটা রেখে বলল লোকটা। 'তবে সেদিন হঠাৎ করে একটা লোক এসে একসাথে দুই বাক্স নিয়ে গেল।' কাঁচের বাক্সটা বন্ধ করল সে।

'চেনেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল ক্লার্ক। 'কখনও দেখিনি।' ছেলেদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। 'এসব প্রশ্ন করছ কেন?'

'এমনি। জাস্ট কৌতূহল,' হাত নেড়ে বলল কিশোর। মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

'কোন ধরনের বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে জানি এখন,' মুসা বলল। 'খুঁজে বের করা বোধহয় কঠিন হবে না।'

মুচকি হেসে কয়েকটা পিকআপ দেখাল কিশোর। মোড়ের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে, ধুলোয় ঢাকা শরীর। সব ক'টার পিছনের জানলার কাছে গান র‍্যাক, এবং প্রতিটি র‍্যাকে অন্তত একটা করে হলেও রাইফেল আছে। 'কী খুঁজছি জানি বটে, কিন্তু আসল জিনিসটা খুঁজে বের করা শুধু কঠিন বললে ভুল হবে। বলা উচিত, প্রায় অসম্ভব।'

*

রেস্টুরেন্টে ঢুকে ওরা কয়েক মিনিট বসতে না বসতেই জুলি এসে হাজির হলো। চুল পিছনে আঁচড়ে টেনে বেঁধেছে। পরনে জিনসের বদলে এখন ডেনিম স্কার্ট।

'এই যে, পেলাম,' বলতে বলতে এসে বুদের সামনে মুসার পাশে বসল জুলি। 'নতুন কিছু?'

হাসল মুসা। ওর কাছ থেকে তথ্য জানা দরকার।

হাসিটা ফিরিয়ে দিল জুলি। হাসিতে ভাঁজ হয়ে গেল তার নীল চোখের দুই কোণ। এমুহূর্তে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা, বোমা পাতায় এই মেয়ের হাত আছে।

আলোচনা শুরু করল কিশোর। প্রথমেই বলল ক্যাপরকে মারকির কুঁড়েতে যাবার কথা।

'শুনে হিংসে হচ্ছে,' জুলি বলল। 'মারকির সাথে আমার খাতির আছে, কিন্তু বেশি কথা সে কখনই বলে না। ফলে তেমন কিছু জানতে পারি না। আমি জানি, নৃ-বিদ্যায় তার জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের চেয়ে কম না। তার গোত্রের শেষ

মানুষ সে। অথচ তার মুখ থেকে কোন কথাই আদায় করতে পারি না। জানার খুব ইচ্ছে আমার।'

'এখানকার লোকের ওপর কি রেগে আছে? হয়তো সে মনে করে, লসন ব্লাফ থেকে কারসন আংকেলের র‍্যাঞ্চ সরিয়ে নেয়া উচিত।'

'তুমি কি ভাবছ কারসন র‍্যাঞ্চে গোলমালের জন্য মারকি দায়ী?' খবরটা জানে একথা ফাঁস করে দিল জুলি।

সুযোগটা নিল কিশোর। জুলির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'আজ সকালে আদালতে গিয়েছিলাম আমরা, মিনারেল লীজগুলো দেখতে। তোমার কী মনে হয়, সোনা, তেল, ইউরেনিয়াম, এসব খনিজই র‍্যাঞ্চে গোলমালের কারণ?'

শক্ত হয়ে গেল জুলির মুখ। 'হতে পারে। না-ও হতে পারে।' কফির কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিল। 'কাজ আছে। চলি।' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ রাতে নাচতে যাব, মনে আছে? তুলে নেবে আমাকে?'

'আটটায়,' বলল মুসা। তবে তার স্বাভাবিক হাসিটা দেখা গেল না মুখে। বুঝতে পারছে, জুলি কিছু জানে, গোপন করছে। সেটা কী?

জুলি চলে গেলে পিকআপের দিকে এগোল দু'জনে। দরজা খোলার আগে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল বোমা-টোমা লুকানো আছে কিনা, তারপর উঠে বসল।

মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'কী ভাবছ?'

'জানি না,' গম্ভীর হয়ে আছে মুসা। বোমা পাতায় জুলির হাত আছে, এটা এখনও মানতে নারাজ সে। কিন্তু আগের মত নিশ্চিতও হতে পারছে না আর কী কী জানে জুলি।

যত তাড়াতাড়ি পারল র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা। ফিরেই তারটা বের করে নিয়ে আলট্রালাইট মেরামত করতে চলল।

তারটা টেনে বের করে ছেঁড়া মাথাগুলো দেখছে মুসা, এই সময় কিশোর ডাক দিল, 'মুসা, দেখে যাও।'

ফিরে তাকাল কিশোর। বিমানের লেজের কাছে গোল একটা ছিদ্র দেখাল মুসা। স্ট্রাট টিউবের যেখান দিয়ে তারটা যায়, ঠিক তার ওপরেই।

'আশ্চর্য!' পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মুসা। 'এখানে তো এরকম ছিদ্র থাকার কথা নয়!' টিউবের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দিল। ওপাশেও একই রকম আরেকটা ছিদ্র রয়েছে। প্রথমটার মত ধারগুলো এত মসৃণ নয়, আর কী যেন আটকে রয়েছে। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলগা করে বের করে আনল জিনিসটা, তারপর দরজার কাছে নিয়ে চলল বেশি আলোয় ভালমত দেখার জন্য। তামার খুব ছোট্ট একটা টুকরো।

হাতে ছেঁড়া তারটা রয়েছে এখনও। ভুরু কুঁচকে আরেকবার দেখল ওটার ছেঁড়া মাথা। ধীরে ধীরে ফিরল কিশোরের দিকে। 'আপনা-আপনি ছেঁড়েনি। গুলি করে কাটা হয়েছে। ইস্পাত ছিদ্র হয়ে যায় এমন বুলেট দিয়ে।'

নয়

'বুলেট?' নীচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। ছেঁড়া তারের মাথার দিকে তাকাল একবার, তারপর মুসার হাতের ধাতুর টুকরোটার দিকে। 'তামার তৈরি বুলেট?'

'হ্যাঁ। ভাগ্য ভাল তোমার, প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে গেছ,' অস্বস্তি ফুটেছে মুসার চেহারায়। 'তারমানে আমরা এখানে পা রাখার পর থেকেই লোকটার নজর রয়েছে আমাদের ওপর।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। হয়তো মারতে চায়নি, এটা ছুঁড়ে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ইঞ্জিনের শব্দে গুলির শব্দ শুনিনি আমি।'

আলট্রালাইটের সারা শরীর পরীক্ষা করে দেখল মুসা। 'নাহ্, আর ছিদ্র নেই।'

টিউবের ওপরের ছিদ্রটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। 'স্ট্রাটের কোন ক্ষতি হয়েছে বলেও মনে হয় না। এসো, একটু সাহায্য করো। তারটা লাগিয়ে ফেলি।'

'লাগানোর পর প্রথমে একটা টেস্ট ফ্লাইট দেব।' চোখের পাতা সরু হয়ে এল তার। 'তারপর যাব একবার ওরটেগার এলাকায় ঘুরে আসতে।'

চমৎকার কাজ করল নতুন তারটা। ওড়ার সময় সামান্যতম গড়বড় করল না বিমান। নেমে এসে মুসাকে নিয়ে ঘরে চলল কিশোর, ওরটেগা র‍্যাঞ্চটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করার জন্য।

ওদের পরিকল্পনা তেমন পছন্দ হলো না কারসনের, তবে ঠিকানাটা বললেন। 'বাস্তুভিটা ছাড়িয়ে মাইল দুই গেলেই একটা বেড়া দেখতে পাবে। ওখান থেকেই ওরটেগার সীমানা শুরু।'

'তারমানে হাইওয়ে ধরে না গিয়েও এক র‍্যাঞ্চ থেকে আরেক র‍্যাঞ্চে ঢুকে যাওয়া যায়,' বিড়বিড় করল মুসা।

শ্রাগ করলেন কারসন। 'রাস্তার মালিক কাউন্টি, তারমানে জনগণ। যে কেউ ব্যবহার করতে পারে ওগুলো।'

'সহজেই ওরটেগার এলাকা থেকে আপনার এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে ট্যাংক-ট্রাক, তাই না?' কিশোর বলল। 'কিংবা এখান থেকে ওখানে?'

'পারে। তবে হাইওয়ে কিংবা পুরানো সার্ভে রোড দিয়েও সহজেই যাতায়াত করতে পারে।'

হলুদ পিকআপটা নিয়ে আবার বেরোল দু'জনে। দক্ষিণে চলল।

'কী ভাবছ?' পথের মাঝের বড় একটা গর্ত এড়ানোর জন্য সাঁই করে বাঁয়ে কাটাল মুসা।

'অনেকগুলো ছেঁড়া সুতো জোড়া দিতে হবে, জটিল ব্যাপার,' কণ্ঠের হতাশা

পুরো চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'সবচেয়ে জটিল সমস্যাটা হলো, মোটিভটাই জানতে পারিনি এখনও। প্রতিশোধের ব্যাপার হলে, বেন ফ্রেনটিসকে সন্দেহ করতে পারতাম। কিন্তু তার পা খোঁড়া। কাজেই প্রতিশোধ ভাবতে পারছি না। লোভ হলে বলা যায় ওরটেগা দায়ী। কিন্তু কীসের লোভ? গরু চরানোর সামান্য একটু জায়গা আর কতগুলো ফালতু মিনারেল লীজের জন্য কিডন্যাপিং আর খুনের দায় মাথায় নিতে চাইবে না সে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'যদি পবিত্রভূমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় রেগে গিয়ে এসব করে থাকে, তাহলে আমাদের সন্দেহ হতে পারত মারকি। যার কাছে এখন পর্যন্ত কোন অস্ত্র দেখিনি। সন্দেহ আরও দু'জনকে করতে পারি, যাদের কোন মোটিভই নেই, অন্তত এখনও পাইনি। তারা হলো জুলি আর পল ব্যানউড।'

'কাকে সন্দেহ করবে বুঝতে পারছ না তো?' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'ওই দেখো।'

কয়েকশো গজ দূরে ছোট একটা বালির পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। মাথায় খড়ের তৈরি সমব্রেরো হ্যাট। ওদের পিকআপ আর পাহাড়টার মাঝের উপত্যকা জুড়ে রয়েছে সেজ গাছের কোমর সমান ঝোপ।

গাড়ি থামাল মুসা। দু'জনেই বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ওটার পাশে। চূড়ায় দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ লোকটা নড়ল না।

'আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যই খুঁটি গেড়েছে বোধহয়,' মুসা মন্তব্য করল। 'ভাবতে অবাক লাগে না? একেবারে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আমাদের ওপর চোখ রাখতেই হাজির হয়ে যায় ওই লোক। যেন জানে, কখন কী ঘটছে, ঘটবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আধিভৌতিক ক্ষমতা আছে হয়তো, ওঝাদের যেমন থাকে।'

'যাবে নাকি?'

'গিয়ে লাভ হবে না। আমাদের সাথে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে, ওখানে না দাঁড়িয়ে এখানেই চলে আসত মারকি। আর যাবই বা কীভাবে? এই ঝোপের সমুদ্রের ভিতর দিয়ে গাড়ি এগোবে না। পায়ে হেঁটে যদি যাই, আমরা পৌঁছার অনেক আগেই গায়েব হয়ে যাবে সে।' হাসল কিশোর। 'আমার বিশ্বাস, কথা বলার দরকার মনে করলে ও নিজেই এসে হাজির হবে।'

'দেখিই না কী করে?' বলে ঝোপের দিকে পা বাড়াল মুসা।

তার চোখের সামনেই হঠাৎ করে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল মূর্তিটা।

'কী, বলেছিলাম না,' হেসে বলল কিশোর।

আবার গাড়িতে উঠল ওরা। মিনিট বিশেক এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পথে চলার পর একটা ধাতব খুঁটি চোখে পড়ল। তাতে সাদা রঙে লেখা সাইনবোর্ড। লেখার মর্মার্থ: ওরটেগা র‍্যাঞ্চের সীমানা শুরু হয়েছে ওখান থেকে। অনুমতি না নিয়ে ঢোকাটাকে বেআইনী বলে গণ্য করা হবে।

'বেআইনী কিছু করছি না আমরা,' নিজেকেই যেন বোঝাল মুসা। 'বেড়াতে এসেছি।' পা দিয়ে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরল। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি।

তিন-চার মাইল পরে একটা শৈলশিরার ওপর র‍্যাঞ্চ কমপ্লেক্স চোখে পড়ল ওদের। মূল বাড়িটা বিশাল, একতলা, স্প্যানিশ ধাঁচে তৈরি। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে ওটার সাদা দেয়াল আর কমলা রঙের টালির ছাত। আরও এগিয়ে দেখতে পেল বারান্দায় দাড়িয়ে আছে বিশালদেহী একজন মানুষ, সামনের দিকে নজর।

'যেন জানে আমরা আসব,' মুসা বলল।

কাছে এসে তাকে চিনতে পারল কিশোর। ডেন মারটিন। পলকে খুঁজতে সেদিন সে-ও গিয়েছিল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ডেন। 'পলের খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না। আমরা মিস্টার ওরটেগার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ওই মুহূর্তে ডেনের পিছনের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একজন বয়স্ক লোক। বেঁটে। পরনে জিনস, গায়ে ওঅর্ক শার্ট, গলায় বাঁধা একটা বড় রুমাল। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তাহলে তোমরাই সেই লোক, যারা সমস্ত আর্মস্ট্রং কাউন্টিতে মানুষকে জেরা করে বেড়াচ্ছ।' ছেলেদেরকে পথ দেখিয়ে একটা হলঘর পার করিয়ে আরেকটা ঘরে নিয়ে এল সে। চামড়ায় মোড়া কয়েকটা আর্মচেয়ার আর একটা ওক কাঠের টেবিল রয়েছে সেঘরে। ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে বসতে বসতে লোকটা বলল, 'বলো এখন, তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

'আপনি জানেন, পলকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি,' সাবধানে কথা বলল কিশোর।

'জানি,' আন্তরিক সহানুভূতির সুরে জবাব দিল ওরটেগা। 'খুব খারাপ। আমার বিশ্বাস ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল। পরদিন তার স্যাথের জিনিসপত্র সব হারিয়েছে ওই ধূলিঝড়ে।' মাথা দুলিয়ে বলল, 'প্রচণ্ড ঝড় গেছে। গত বছর দুইয়ের মধ্যে এরকম দেখিনি।'

'কিন্তু পরদিন ঝড়ের মধ্যে ঘুরতে গেল কেন সে?' মুসার প্রশ্ন। 'তা ছাড়া কারসন আংকেল বলেছেন খুব ভাল ঘোড়াসওয়ার পল, ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ার কথা নয়।'

মাথা ঝাঁকাল ওরটেগা। 'ঘোড়ার মতিগতি খারাপ হলে অনেক সময় ভাল আরোহীও পিঠ থেকে পড়ে যায়। পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে না হারালে আর কী ঘটবে? কারসনকে ছেড়ে যাবে না পল কিছুতেই। কাজেই চলে গেছে একথা বলা যাবে না।'

'কিন্তু খোঁজা তো কম হলো না,' কিশোর বলল। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার এলাকায় একবার খুঁজে দেখতে চাই।'

আন্তরিক ভাবটা অনেকখানি হারিয়ে গেল ওরটেগার চেহারা থেকে। 'আপত্তি

নেই। তবে আমার একজন লোক থাকবে তোমাদের সঙ্গে। জায়গা চেনে এরকম কাউকে সাথে না নিলে তোমরাও হারিয়ে যেতে পারো।' এক এক করে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে। 'আরেকবার মানুষ খুঁজতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

হুমকি দিল না তো?–ভাবছে কিশোর। কিন্তু লোকটার চোখ দেখে কিছু বুঝতে পারল না। বলল, 'কাল সকালেই আসি?'

'আসতে পারো। তবে তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। যা জায়গা, যদি কোনভাবে গিয়ে পড়েই সেখানে পল, তাহলে এতক্ষণে মরে গেছে। বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম।' চেয়ারটা ঠেলে পিছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল ওরটেগা।

'ইদানীং কোন বড় ট্রাক আপনার এলাকা দিয়ে গেছে?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মুসা।

আবার বসে পড়ল ওরটেগা। কঠিন দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কয়েকটা দাগ নাকি দেখা গেছে। আমার কর্মচারীদের মুখে শুনলাম। গরুর ট্রাক হতে পারে। ট্রাকের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

ওরটেগার মুখের ওপর কিশোরের দৃষ্টি স্থির। 'কারসনের পুকুরে যে ট্রাকটা গিয়ে লবণ ফেলে এসেছে, সেটাও খুব বড় ট্রাক।'

আলতো মাথা ঝাঁকাল ওরটেগা। 'তোমরা জানো, কারসনের সঙ্গে আমার বনিবনা নেই। কিন্তু তবু ওর জন্য আমার দুঃখ হয়। পশুর ক্ষতি হওয়ার চেয়ে র‍্যাঞ্চারের বড় ক্ষতি আর নেই। প্রথমে খোঁড়া হয়ে যেতে লাগল তার ঘোড়া, তারপর মরতে লাগল গরু। কারসন নিশ্চয় নিজের গরুকে লবণ খাইয়ে মারেনি।' ধীরে ধীরে রাগ দেখা দিল তার চেহারায়। 'ওসব শয়তানিতে আমারও কোন হাত নেই, আমি কিচ্ছু করিনি।'

অস্বস্তিকর, দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত কাটল। তারপর কিশোর বলল, 'যাক, যা জানতে এসেছিলাম, জানা হলো আমাদের।' উঠে দাঁড়াল সে।

এবার আর দরজার কাছেও এগিয়ে দিল না ওদেরকে ওরটেগা।

ফেরার পথে দরজার পাশে একটা গান র‍্যাক চোখে পড়ল কিশোরের। কয়েক ধরনের শটগান আর হরিণ মারার রাইফেল রয়েছে তাতে। একটা রাইফেল দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল ওটা।

'রাইফেলে হাত দিলে কেন?' পিছন থেকে চাবুকের মত আছড়ে পড়ল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

গটমট করে এসে কিশোরের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল ওরটেগা। 'যুদ্ধের পর আর ফেরত দেইনি এটা,' অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল সে। 'বাড়ি নিয়ে এসেছি।' গলার ঝাঁঝ কমল না। 'এটা আমার প্রিয় জিনিস। আমি চাই না কেউ চুরি করে নিয়ে যাক।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, 'ডেন!'

দরজায় দেখা দিল ডেন মারটিন।

'এ দুটোকে এলাকা থেকে বের করে দিয়ে এসো,' আদেশ দিল ওরটেগা।

ট্রাকের দিকে এগোতে এগোতে নিচু গলায় বলল মুসা, 'ব্যাপার কী?'

'রাইফেলটা দেখলে বুঝতে,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'ব্রিটিশ থ্রি-জিরো-থ্রি, মার্ক থ্রি লি-অ্যানফিল্ড।' কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে তাকিয়ে দেখল, রাইফেলটা হাতে নিয়ে এখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরটেগা। 'আমার ধারণা, ওই রাইফেল দিয়ে গুলি করেই আকাশ থেকে মাটিতে নামানো হয়েছিল আমাকে।'

দশ

'কী হয়েছে, জানি না,' ওদেরকে ট্রাকে তুলে দিয়ে বলল ডেন। 'তবে মিস্টার ওরটেগার হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছেন তিনি!'

'থাক, ওসব বলে আর লাভ নেই,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। 'আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।'

পিছনে হারিয়ে গেল র‍্যাঞ্চহাউস। আনমনে মাথা নাড়ল মুসা। 'তোমার হাতে রাইফেল দেখে যেরকম জ্বলে উঠল, আমার তো মনে হলো বদ্ধ উন্মাদ।' রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা গরুকে বাঁচানোর জন্য শাঁ করে পাশে কাটাল সে। 'ভাবছি, ওরকম যুদ্ধের স্যুভনির আর কটা আছে এই এলাকায়?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। আরেকটা ট্রাকে করে ওদের পিছনে আসছে ডেন। 'থাকতে পারে। সন্দেহ করছি বটে, কিন্তু ওরটেগাকে তো আর দেখিনি আলট্রালাইটের ওপর গুলি চালাতে। সে না-ও হয়ে থাকতে পারে।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'তবে লোকটা ভীষণ বদমেজাজী।'

পথের পাশের ঝোপ থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল একটা রোড রানার। মোরগের সমান বড় পাখিটা গাড়ির আগে আগে ছুটল। খুব জোরে দৌড়াতে পারে। সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'ওরটেগা যদি এসব করে থাকে, কী কারণে করেছে? কারসনকে এই এলাকা থেকে তাড়ানোর জন্য, যাতে তার ব্যবসা জমে ওঠে? নাকি সরকারি জমি দখলের জন্য?'

'ওই মরুভূমি দিয়ে কী করবে সে? ঘাস নেই যে গরুকে খাওয়াবে। নাহ্, বুঝতে পারছি না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'মিনারেল লীজগুলোর ব্যাপারটা কী? হয়তো এমন কিছু জানে ওরটেগা, যা আর কেউ জানে না।'

'মনে হয় না। বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো এসে খোঁজাখুঁজি করে গেছে।' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'তবু, দেখি, জুলিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মনে হয় ও জানে আমি এব্যাপারে আলোচনা শুরু করতেই হঠাৎ থামিয়ে দিয়েছিল আমাকে।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। গতি বাড়াতে বলল মুসাকে। 'তাড়াতাড়ি করো। কাপড় বদলে পার্টিতে যেতে দেরি হয়ে যাবে।'

*

আর্মস্ট্রঙের পুরানো এলাকায় জুলিদের বাড়ি। ছোট, ছিমছাম, হলদে রঙ করা। নীরব নির্জন রাস্তা ধরে এগোনোর সময় কিশোর মুসা দু'জনেই দেখল, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভ লাল রঙের পিকআপ।

'বাড়িতেই আছে জুলি।' ইগনিশনে মোচড় দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল মুসা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ঢুকেই প্রশ্ন শুরু করব?'

'নাচবে তুমি। যা ভাল বোঝো করবে,' হেসে বলল কিশোর। নতুন কাউবয় হ্যাটটা কপালের ওপর আরও টেনে দিয়ে আরাম করে হেলান দিল সীটে। 'আমি বসছি। দশ মিনিটের মধ্যে যদি না বেরোও, শেরিফকে খবর দেবো।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসল মুসা। 'দশ মিনিট অনেক সময়। ম্যানেজ করে ফেলতে পারব।' গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে এগোল সে।

'আসছি,' মুসার টোকার জবাব এল ভিতর থেকে। দরজা খুলে দিল জুলি। মুসার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে হাসল। 'বাহ্, একেবারে খাঁটি কাউবয়।'

'কেন, খারাপ লাগছে?'

'মোটেও না। শহরের যে কোন মেয়ে তোমার সাথে নাচতে একপায়ে খাড়া হয়ে যাবে।'

জুলির চেহারার উত্তেজনাই বুঝিয়ে দিল, নাচার চেয়ে আরও জরুরী কিছু এখন মন জুড়ে রয়েছে তার। 'এসো, একটা জিনিস দেখাব···।' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'কিশোর কোথায়? ওরও দেখা দরকার।'

'গাড়িতে বসে আছে,' অবাক হয়ে ভাবছে মুসা, কী দেখাতে চায় জুলি? জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখাবে?' ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ভিতরে তাকাল সে। একপাশে লিভিং রুম, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ছোট ঘরটার একমাথায় রান্নাঘর, ওটাও নির্জন, অন্তত এখান থেকে কাউকে চোখে পড়ছে না।

'ডাকো ওকে,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল জুলি। 'তোমাদের দু'জনকেই···'

'আগে আম্মাকেই দেখাও না,' অস্বস্তি লাগছে মুসার। ফাঁদ না-ও হতে পারে। যদি হয়ও, দু'জন একসাথে তাতে পা দিতে চায় না। একজন অন্তত মুক্ত থাকুক।

সরে এসে দরজা আরও ফাঁক করে ধরল জুলি। 'বেশ, এসো,' হাল ছেড়ে দিল যেন সে, 'দেখাই।' হাত ধরে মুসাকে ভিতরে টেনে নিল সে।

দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে জুলি। সেদিকে তাকিয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল মুসার। কিন্তু এখনও কাউকে চোখে পড়ছে না।

মুসার হাত ধরে তাকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে এল জুলি। টেবিলে বোঝাই হয়ে আছে হলদেটে গ্রাফ পেপার। অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা টানা ওগুলোতে। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত মনে পড়ে গেল তার, ওরকম কয়েকটা রেখা দেখেছে মারকির বাড়িতে, মারকির নিজের হাতে আঁকা। জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী?'

'এটাই দেখাতে চাইছি।' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল জুলি। 'সারাটা বিকেল খেটেছি।'

কয়েকটা কাগজ টেবিলে ছড়াল সে। 'কিশোর মিনারেল লীজগুলোর কথা বলতেই হঠাৎ মনে পড়ল আমার। ব্যুরো অভ ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অফিসে চলে গেলাম। সোজা গিয়ে ঢুকলাম ওদের মাটির নীচের ঘরে, পুরানো লগগুলো খুঁজে বের করলাম। সেই উনিশশো তিরিশের লগও রয়েছে। দেখে বুঝলাম, বহু বছর ওগুলোতে কারও হাত পড়েনি।' হাসল সে। 'ইচ্ছে করলে এখন জিনিয়াস বলতে পারো আমাকে।'

'জিনিয়াস?' হেসে উঠল মুসা। 'তারচেয়ে বরং নীলনয়না বিশ্বসুন্দরীই বলি। তা এই পুরানো জঞ্জালগুলোতে কী আছে? ওই আঁকিবুকিগুলোই বা কীসের?'

'পুরানো জঞ্জাল বলছ? এগুলো অনেক পুরানো সাইমোগ্রাফ লগ।' কয়েকটা বাঁকা রেখার ওপর আঙুল বোলাল সে। 'আর এগুলো বোঝায় কোথায় কোথায় বিশেষ খনিজ জমা রয়েছে।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'কিছুই বুঝলাম না।'

নেচে উঠল জুলির নীল চোখের তারা। 'যদি আমার হিসেবে ভুল হয়ে না থাকে, মিস্টার মুসা আমান, তেলের সাগরের ওপর ভাসছে কারসন র‍্যাঞ্চ!'

এগারো

সাংঘাতিক খবর! কিশোরকে জানানোর জন্য দৌড় দিল মুসা। দরজার দিকে ছুটল। হাত নেড়ে কিশোরকে আসতে ইশারা করে আবার ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে। খোলাই রইল দরজাটা।

রান্নাঘরে এসে ঢুকল কিশোর।

'দেখো কিশোর, জুলি কী পেয়েছে!' টেবিলে রাখা কাগজগুলো দেখিয়ে বলল মুসা।

'সাইজমোগ্রাফ লগস?' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ তুলে নিল কিশোর। ভাবলেশহীন চেহারা। কিন্তু মুসা জানে, ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে গোয়েন্দাপ্রধান। চোয়ালের পেশী সামান্য কঠিন হয়ে যাওয়াটাই এর প্রমাণ। 'তারমানে ওই এলাকায় তেল খোঁজা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে কেউ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জুলি। 'ক্যাপরক এরিয়ায় উনিশশো তিরিশ সালে করা হয়েছিল ওই লগ। সঠিক বলতে পারব না, তবে যতদূর মনে পড়ে, কারসুনের র‍্যাঞ্চের দক্ষিণ দিকে, বালির পাহাড়টার ধারে খোঁজা হয়েছিল।'

'তুমি পড়তে পারো?' গ্রাফগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'বোঝো?'

'ভূগোলের ছাত্রী আমি, ভুলে যাচ্ছ। সাইজমোগ্রাফ রিপোর্ট নিয়ে অনেক কাজ করেছি।' কিশোর যে রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, সেদিকে আঙুল তুলে জুলি বলল, 'এগুলো বলছে, লবণের মস্ত স্তর রয়েছে।'

'তেলের কাছে লবণের কাজ কী?' মুসা জানতে চাইল।

'অনেক। প্রচণ্ড তাপ এবং চাপে জমা লবণ চিটাগুড়ের মত তরল হয়ে গিয়ে এদিক সেদিক ছড়াতে শুরু করে। মাটির নীচে কোন দুর্বল জায়গা পেয়ে গেলেই ঠেলে ওঠে ওখান দিয়ে, মস্ত বুদ্‌বুদের মত। যতক্ষণ না কোন পাথরে বাধা পায়, থামে না। ওই বুদ্‌বুদের ঠেলা খেয়ে তেলও ওপরে উঠে আসতে থাকে। তেলের চাপে ওদিকে বুদ্‌বুদটা আবার একটা অদ্ভুত রূপ নেয়, অনেকটা উল্টো করে দেয়া গম্বুজের মত। গম্বুজের সেই খোলের মধ্যে জমা হয় তেল। মাটি খুঁড়লে দেখতে পাবে মস্ত একটা তেলের হ্রদ, কিংবা দীঘি।'

হাসল কিশোর। 'বুঝেছি। ওগুলোকে সল্ট ডোম বা লবণের গম্বুজ বলে। স্পিন্ডলটপ ওরকম একটা।'

'স্পিন্ডলটপ?' বুঝতে পারছে না মুসা।

মাথা ঝাঁকাল জুলি। 'নাম। উনিশশো এক সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের সবচেয়ে বড় তেলের খনি। ওটার আকৃতিও ছিল গম্বুজের মত, নীচে লবণ।'

হলদেটে লগগুলোয় চাপড় মারল কিশোর। 'কিন্তু উনিশশো তিরিশ সালে যদি এটা পেয়ে থাকে, তাহলে তখনও খুঁড়ে তোলেনি কেন? কোন কুয়া নেই কেন কাছে?'

'এই নোটগুলো দেখো,' লগের পাশের মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে লেখা গুটিগুটি অক্ষরগুলো দেখাল জুলি। 'মাটির এগারো হাজার ফুট নীচে ওই ডোম।'

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'তোমার জবাব পেয়েছ, মুসা। তিরিশ সালে এত নীচে থেকে তেল তোলার উপায় জানা ছিল না কারও। যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়নি। টেকনোলজির তখন আদিম অবস্থা।'

'ঠিক,' সুর মেলাল জুলি। 'আর যদিও বা কষ্টে-সৃষ্টে ওরকম গভীর একটা কুয়া খুঁড়তও, তেলের দাম এত কম ছিল, পোষাত না।'

'কিন্তু এখন দাম অনেক বেশি।' চিন্তিত ভঙ্গিতে রিফ্রিজারেটরের গায়ে হেলান দিল মুসা।

'এখন এর চেয়েও গভীরে খোঁড়ে,' যোগ করল জুলি, 'যদি মনে করে প্রচুর তেল পাওয়া যাবে। বিশেষ করে আমেরিকায়, তেল যেখানে খুব দরকার।'

'কীসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এগুলো,' সাইজমোগ্রাফ রিপোর্টগুলোর ওপর টোকা দিল কিশোর। 'শক ওয়েভ?'

'মানে বোমা ফাটিয়ে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'বোধহয়,' জুলি বলল। 'তবে আজকাল বিজ্ঞানীরা অনেক উন্নত পদ্ধতি বের করেছেন। বিরাট ট্রাকে যন্ত্রপাতি এনে মাটির গভীরে ভারি জিনিস ফেলা হয়।

সেই জিনিসের আঘাতে কম্পন সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের সাহায্যে সেই কম্পন মেপে অনুমান করে নেয় নীচে কী আছে।'

উত্তেজনা বাড়ছে। কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। আবার ফিরল জুলির দিকে। 'কিন্তু ইচ্ছে করলে এখনও পুরানো পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়, তাই না? আর যারা ওই বোমা ব্যবহার করবে, তাদের নিশ্চয় জানতে হবে ডিনামাইট ফাটানোর কায়দা-কানুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জুলি। 'নতুন যন্ত্রপাতি না থাকলে পুরানো কায়দায় অবশ্যই করা যায়।' অবাক মনে হলো তাকে। 'কেন?'

সন্তুষ্ট হয়ে হাসল মুসা। জুলির অবাক হওয়াটাকে ভান ভাবতে পারল না। এতটা অভিনয় করতে পারবে না জুলি। তারমানে, আর যেই থাকুক, গাড়িতে ডিনামাইট পাতায় তার হাত অন্তত নেই।

'অনেক ডিনামাইট দেখলাম কিনা গত কয়েক দিনে,' বলল সে। 'কারসন র‍্যাঞ্চের পুরানো বাস্তুভিটায় বোমা পেতে রাখা হয়েছিল। রাতে ওখানে ঘুমাতে গিয়েছিলাম আমরা। তারপর পেতে রাখল গাড়িতে। যাতে দরজা খুললেই ফাটে।'

বড় বড় হয়ে গেল জুলির চোখ। 'মানে···কেউ তোমাদেরকে খুন করতে চেয়েছিল!'

'তা ছাড়া আর কী?'

'আরেকটা কথা মনে আছে তোমার?' কিশোর বলল। 'প্রথম দিন আমরা যখন বাস্তুভিটায় রাত কাটাতে গেলাম, বজ্রপাতের মত আওয়াজ শুনেছিলাম? এখন বুঝতে পারছি, বোমাই ফাটিয়েছিল।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়ল জুলি। 'নিশ্চয় কেউ তেলের খোঁজ করছে!'

'মনে হয়,' ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'সাইজমোগ্রাফি যেখানে করা হয়, জায়গাটা দেখতে কেমন হয়? মাটিতে বড় বড় অনেক গর্ত থাকে?'

মাথা নাড়ল জুলি। 'না। তিন ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত, একশোটা কিংবা তারও বেশি। অনেক গভীর। একটা থেকে আরেকটা একশো ফুট দূরে। ওপর থেকে গর্তের মুখগুলো দেখা যায়, চারপাশে খুঁড়ে তোলা আলগা মাটি জমে থাকে। ড্রিল রিগের সাহায্যে খোঁড়ে।'

'রিগগুলো কেমন?' জানতে চাইল কিশোর। 'অনেক বড়?'

'না। পরীক্ষামূলক গর্ত খুব বড় হয় না। কাজেই রিগও বড় লাগে না। এমন যন্ত্র নিয়ে আসে সেগুলো সহজেই ট্রাকে তোলা যায়।'

মাথা চুলকাল মুসা। অবশেষে এই রহস্যের অন্ধকারে আলো ফুটতে শুরু করেছে। 'কিন্তু এখনও ওখানে তেল আছে সেটা জেনে কার কী লাভ হবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল সে। 'অনেক টাকা খরচ ওই তেল তুলতে।'

'না তুলেও টাকা কামানো যায়।' বুঝিয়ে দিল জুলি, 'যদি তুমি শিওর হয়ে যাও তেল আছে, মিনারেল লীজ কিনে নিতে পারো। আর সেটা কিনতে খরচ হয়

খুবই সামান্য। তারপর ওই লীজ নিয়ে গিয়ে অনেক অনেক দামে বেচতে পারবে তেল কোম্পানির কাছে।'

'হুঁ, তা ঠিক। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও। কারসন র‍্যাঞ্চের মাঝখানে রয়েছে বেশির ভাগ তেল। উত্তরের অংশটা লীজ নিয়েছেন স্টেট-এর কাছে থেকে...'

'আর দক্ষিণের অংশটা নিয়েছেন ফেডারেল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে,' বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর। 'যত গোলমাল সব ফেডারেল এলাকায়। পশুচারণ ভূমির লীজ রিনিউ করতে বাধা দেয়া হচ্ছে তাঁকে।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন তুলল জুলি। 'তেল তুলতে গিয়ে জায়গা নষ্ট হয় না। গর্তের আশেপাশে সহজেই গরু চরতে পারে।'

'তার কারণ,' আঙুল মটকাল মুসা, 'তেলের গর্ত করা হয়েছে, এটা দেখতে দিতে চায় না আংকেলকে।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'তেল তরল পদার্থ। যে কোন জায়গা দিয়ে পাইপ ঢুকিয়ে টেনে তোলা যায়।'

'যায়। আর তাই করতে চাইছে ওরা,' কিশোর বলল। 'মোটিভ আন্দাজ করা যাচ্ছে এখন। জলদি গিয়ে সেটা যাচাই করা দরকার।'

'ঠিক,' একমত হলো মুসা।

'এক মিনিট, এক মিনিট, কাউবয়!' দু'জনের হাত চেপে ধরল জুলি। 'তোমরা চলে গেলে আমাকে নাচতে নিয়ে যাবে কে?'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। এখন নাচতে যাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই ওদের।

'এই রাতে আর মরুভূমিতে গিয়ে কী করবে?' বোঝানোর চেষ্টা করল জুলি। 'অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়বে না। বড়জোর কয়েকটা কায়োট দেখতে পাবে। তা ছাড়া, আমার সাহায্য লাগবে তোমাদের।'

'তোমার সাহায্য?' কিশোর বলল। 'শোনো, তোমাকে ছাড়াই...'

'না, পারবে না। এখানকার মরুভূমি তোমাদের অচেনা। কিন্তু আমার চেনা। মুহূর্তে পথ হারাবে তোমরা। আমি হারাব না।' করুণা করার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল জুলি। 'সবচেয়ে বড় কথা, সাইজমোগ্রাফি সাইট তোমরা আগে দেখনি, এখন দেখলে চিনতে পারবে না। আমি পারব। তাহলে বুঝতেই পারছ?'

'হুঁ, যুক্তি আছে ওর কথায়,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'ব্ল্যাকমেল করছে আমাদের,' বিড়বিড় করল কিশোর।

মধুর হাসি উপহার দিল ওদেরকে জুলি। 'ব্ল্যাকমেল নয়, বলো সমঝোতা,' মিষ্টি করে বলল সে। 'কাল খুঁজতে বেরোব আমরা। আজ রাতে পার্টি দেব। নাচই যদি না থাকল তো জীবনে আর কী থাকল।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। 'ও-কে। আজ রাতে পার্টিই করব। কিন্তু কাল সকালে আমাদের পয়লা কাজ হবে, শয়তান মানুষগুলোকে খুঁজতে যাওয়া।'

*

কাকভোরে বাংকহাউসের বাইরে জীপ থামার শব্দ শুনতে পেল কিশোর। দু'বার হর্ন বাজল।

পর্দা তুলে তাকাল কিশোর। বলল, 'জুলি এসেছে। একেবারে সময়মত।'

ঘুমের জড়তা কাটানোর জন্য দ্বিতীয় কাপ কফি খেতে হলো মুসাকে। পায়ের বুড়ো আঙুলে এখনও ব্যথা। রাতে বেশি নাচানাচির ফল।

কোথায় যাচ্ছে জানানোর জন্য কারসনকে ফোন করল কিশোর। মুসা বেরিয়ে এল বাইরে। অন্ধকার কাটেনি এখনও। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। চোখ রগড়াল সে। স্বপ্ন দেখছে না তো? জুলির জীপের রঙ লাল, তার ওপর কালো ডোরাকাটা। কাজের পোশাক পরে এসেছে জুলি। খাকি জাম্পসুট, হাইকিং বুট, নরম হ্যাট। চমৎকার। গলায় ঝোলানো একটা দূরবীন।

কিশোর আর মুসা জীপে উঠতে উঠতেই ম্যাপ বের করে মেলে নিয়েছে জুলি। 'সোজা ক্যাপরকের দিকে এগোব এখন। তারপর নেমে যাব বালির পাহাড়ের দিকে।' যে পথে যেতে হবে, সেটার ওপর আঙুল বোলাল সে।

'বেরোনোর আগে লগগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে এসেছি,' ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রাখল জুলি। 'আমার অনুমান, তিরিশ সালে ঠিক এই জায়গাটায় পরীক্ষা চালিয়েছিল ওরা। ওখান থেকে খোঁজা আরম্ভ করব আমরা, তারপর এগিয়ে যাব পুবে। এই যে এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে পথ।' আঙুলের খোঁচা মারল ম্যাপে। 'পুরানো বাস্তুভিটাটা এখান থেকে পশ্চিমে, বেশি দূরে নয়। আলগা বালি খুব বেশি এখানে। গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না। কাজেই, আমার মনে হয় না ওদিকে খোঁজ চালিয়েছে ওরা। দিনের বেলা ওই এলাকা হেঁটে পেরোনোর চেষ্টা করতে যাওয়া আর মরতে যাওয়া এক কথা।' হাসল সে। 'এখন শক্ত হয়ে বসো। রাস্তা খারাপ।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বাংকহাউসের পিছনের একটা কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ি চালাল জুলি। পথটা আগে মুসার নজরে পড়েনি। জুলি বলেছে 'খারাপ', কিন্তু কতটা খারাপ আন্দাজ করতে পারেনি সে। পথে পড়ার পর বুঝল। কোথায় চলে গেল ঘুম। পাগলের মত হাত বাড়িয়ে শক্ত করে ধরার জন্য একটা কিছু খুঁজছে। ক্যাপরকের গোড়া দিয়ে দক্ষিণে ঘুরে এগিয়ে গেছে পথ। কাত হয়ে আছে একপাশে। মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে নেমে যাচ্ছে কিছুদূর, আবার উঠছে। টিলাটক্কর আর গর্তের অভাব নেই। তার ওপর বিছিয়ে রয়েছে রাশি রাশি আলগা পাথর।

নীচের দিকে নামার সময়ও গতি কমাল না জুলি। সামনের সীটে বসা মুসা আরেকটু হলে ডিগবাজি খেয়ে পড়ত। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। নিঃশ্বাস বন্ধ। পাহাড়ের গোড়ায় নেমে এখানে আর উঠল না পথটা। এগিয়ে গেল সোজা। দু'ধারে ঝোপঝাড়। শেষ মাথায় গিয়ে পড়েছে কাঁকর বিছানো আরেকটা শক্ত রাস্তায়। ওটাতে উঠে গতি আরও বাড়িয়ে দিল জুলি।

'বিকল্প রাস্তায় চলে এলাম,' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে কথা বলতে চিৎকার করতে হচ্ছে। 'বারো মাইল পথ বেঁচে গেল। পাহাড়ে চড়তে খুব ভালবাসে ম্যাগাডন।'

'ম্যাগাডন?' চোখ মিটমিট করে এদিক ওদিক তাকাল কিশোর। পাহাড়ে খুঁজল প্রাগৈতিহাসিক জীবটাকে। 'কই, কোথায় ম্যাগাডন?'

'আরে ওদিকে কোথায় দেখছ,' হেসে উঠল জুলি। 'এটা, এটা,' আদর করে ড্যাশবোর্ডে চাপড় দিল সে। 'আমার এই গাড়িটার নাম ম্যাগাডন।'

'ও, তাই বলো।'

'হ্যাঁ, নাম যেমন, কাজও করেছে তেমন,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'তিরিশ মিনিট সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু আমার আয়ু কমিয়ে দিয়েছে পাঁচ বছর।' তবে মনে মনে একটা কথা স্বীকার না করে পারল না সে, ওস্তাদ ড্রাইভার জুলি।

পরের তিরিশটা মিনিট প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করে কাঁচা সড়ক ধরে এগোল ওরা। দু'ধারে মেসকিটের ঝাড়। মাঝে মাঝে নিচু বালির পাহাড়। ওসব পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে পথটা। প্রতিটি মোড়ের কাছে এসে বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে, নির্দ্বিধায় গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে জুলি। ওর ওপর গাড়ি চালানোর ভারটা ছেড়ে দিয়েছিল বলে এখন মনে মনে খুশিই হচ্ছে মুসা। রাস্তা থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে। সবগুলো দেখতে একরকম লাগছে তার কাছে। কোনটা দিয়ে যে যাওয়া উচিত, কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু জুলি পারছে। কারণ পথ তার চেনা।

অবশেষে সহনীয় গতিতে জীপের গতি নামিয়ে আনল জুলি। কথা বলা সম্ভব হলো।

সামনে ঝুঁকে জুলির কাঁধ ছুঁলো মুসা। 'থামো!' গাড়ির গতি কমতে না কমতেই লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে পথের পাশের ঢাল বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল।

কী দেখে ছুটে গেছে কিশোর, সেটা মুসার চোখেও পড়ল। ঢালের গায়ে বালিতে আঁকাবাঁকা রেখা, আঙুল দিয়ে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো এঁকে রেখে গেছে কেউ।

'আরে, মারকির কুঁড়েতে ওরকম চিহ্নই দেখেছি!' বলতে বলতে মুসাও নেমে পড়ল লাফ দিয়ে।

'কিসের চিহ্ন?' জীপের ওপরে দাঁড়িয়ে দূরবীন চোখে লাগাল জুলি।

ঠিক ওই সময় পায়ের কাছে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন শুনতে পেল মুসা। অবাক হয়ে সেদিকে তাকানোর আগেই টের পেল, উড়ে এসে গালের ওপর পড়ছে কিছু। লাফিয়ে উঠল সে-ও। শূন্যে থাকতেই আক্রমণকারীকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। মুখ থুবড়ে বালিতে পড়ল সে।

বারো

ব্যথা ভালই পেয়েছে মুসা, কিন্তু পরোয়া না করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তেই। থু-থু করে মুখ থেকে বালি ফেলে মাটির দিকে তাকাল। কিছুই না দেখে জুলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'স্বপ্ন দেখছিলাম?'

'না,' হেসে বলল জুলি। 'প্রাণ বাঁচাচ্ছিলে।'

হাত তুলে একটা সেজঝোপ দেখাল সে। ফ্যাকাসে বাদামী একটা লেজ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'সাইডউইন্ডার। আরেকটু হলেই দোজখে পাঠিয়ে দিত তোমাকে।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'ওই দাগটা তাহলে সাপের?'

'হ্যাঁ। অন্য সাপের মত সোজাসুজি না চলে বিচিত্র ভঙ্গিতে একপাশে লাফিয়ে চলে সাইডউইন্ডার। ফলে আলগা বালিতে ওরকম দাগ পড়ে, মনে হয় যেন আঙুল দিয়ে এঁকেছে কেউ।'

প্যান্ট থেকে বালি ঝেড়ে ফেলল মুসা। 'ওরকম চিহ্ন মারকির ঘরে আঁকা দেখেছি। সাপ নিয়ে কারবার করে সে।' বুড়োর ঘরে কী কী দেখেছে জুলিকে জানাল সে।

শুনে জুলি বলল, 'হয়তো সাইডউইন্ডার বোঝাতেই ওই চিহ্ন এঁকেছে সে।'

আবার জীপে চড়ল ওরা। রাস্তার ওপর কড়া নজর রাখল ছেলেরা। ইদানীং এপথে আর কোন গাড়ি গেছে কিনা দেখছে।

এক জায়গায় এসে মেসকিট বনের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া টায়ারের দাগ চোখে পড়ল কিশোরের। 'মনে হয় ঝড়ের পরে হয়েছে। চলো, দেখি।'

ইঞ্জিন লো গীয়ারে দিয়ে জীপের মুখ ঘোরাল জুলি। এগিয়ে চলল কিশোরের নির্দেশিত দিকে। ঝোপের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ গজ মত এগিয়েছে দাগ, তারপর গিয়ে শেষ হয়েছে খোলা জায়গায়।

'এই, দেখো,' চেঁচিয়ে বলেই নেমে পড়ল মুসা। মাটিতে পড়ে রয়েছে পাতলা কিছু হলদে রঙের তার। ওদের গাড়িতে যে তার দিয়ে বোমা পাতা হয়েছিল সেরকম। তারগুলোর মাথা মাঝে মাঝে মাটিতে দেবে গেছে। তবে কোনটা কোনদিকে গেছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

নেমে এসে একটা তারের মাথা ধরে টানল জুলি। 'দেখা যাক অন্য মাথায় কী আছে।'

তারটা অনুসরণ করে কাঁটাঝোপে এসে ঢুকল ওরা। মেসকিটের পালকের মত পাতাগুলো দেখতে খুব সুন্দর, ভাবল কিশোর, আর খেতেও নিশ্চয় ভাল লাগত যদি ছাগল হতাম। কিন্তু এর লম্বা চোখা কাঁটার খোঁচা মোটেও সুখপ্রদ

নয়। কুচ করে একটা কাঁটা চামড়া ফুটো করে ঢুকে যেতেই নাকমুখ কুঁচকে গুঙিয়ে উঠল সে।

'ওই যে, দেখো,' জুলি দেখাল, 'একটা ফুটো। যে কটা তার আছে, সব কটার শেষ মাথায় ওরকম একটা করে ফুটো পাওয়া যাবে, আমি শিওর।'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই খুব কাছে থেকে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া।

'কে জানি আসছে!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর।

চোখের পলকে একটা ঘন মেসকিট ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল তিনজনে। এক মিনিট গেল···দুই···। শুধু বাতাসের শব্দ। ভোররাতে যে বাতাস ছিল কনকনে ঠাণ্ডা, এখন বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেটাই হয়ে উঠছে আগুনের মত গরম।

'জীপটা ফেলে আসা উচিত হয়নি,' মুসা বলল। 'কেউ ওটা নিয়ে গেলে মরেছি। লোকালয় নিশ্চয় এখান থেকে অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ,' জুলি জানাল। 'যেদিকেই হাঁটো, অনেক দূর।'

'জলদি চলো,' কিশোর বলল। 'দূর দিয়ে ঘুরে চলে যাই জীপের কাছে।'

ঝোপের আড়ালে আড়ালে মাথা নিচু করে দৌড় দিল তিনজনে। আলগা বালিতে পা হড়কে যেতে চায়। দৌড়ানো খুব কষ্টকর। জীপের কাছে আসতে আসতে ঘেমে নেয়ে গেল মুসা। লুকানো শত্রুকে খোঁজার চেষ্টায় টান টান করে রেখেছে চোখের পেশী, ব্যথা করছে এখন।

'ঘোড়াও দেখছি না। মানুষও না,' বালিতে পেট ঠেকিয়ে অন্য দু'জনের পাশে শুয়ে বলল জুলি। সামনের খোলা জায়গায় চোখ।

'মনে হয় আসেনি এদিকে,' বলে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের ওপরের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াতে গেল মুসা। 'এভাবে শুয়ে থাকতে···'

বুমম্ করে উঠল শটগান! সামনের খোলা জায়গায় ছিটকে উঠল বালি। হুমড়ি খেয়ে আবার মাটিতে পড়ল সে। দু'হাতে মাথা ঢেকে ফেলেছে, অপেক্ষা করছে পরবর্তী গুলির। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। আধমিনিট পর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল একটা ঘোড়া, তারপর শোনা গেল খুরের আওয়াজ। গুলি করেছে যে, সেই লোকটাই বোধহয় ছুটে চলে যাচ্ছে। আরও মিনিটখানেক ওভাবেই পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল মুসা। ফিসফিস করে জুলিকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিকঠাক আছো তো?'

'আছি।' বলে পাশ ফিরল জুলি। 'কিশোর! ওরকম করছ কেন? গুলি লেগেছে? ...'

'না।' ছোট পাহাড়ের বালিতে ঢাকা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল কিশোর। 'আমার কিছুই হয়নি, তবে মাগাডনের অবস্থা কাহিল। রেডিয়েটর খতম।'

ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েই হাঁ হয়ে গেল মুসা। জীপের সামনের অংশের কয়েকটা ফুটো দিয়ে তীব্র বেগে ছিটকে বেরোচ্ছে পানি। ইঞ্জিনের নীচে পানি জমে গেছে ইতিমধ্যেই।

'সব্বোনাশ!' আঁতকে উঠল জুলি। 'এত ফুটো বন্ধ করব কী দিয়ে?'

'করা যাবে না,' নামা থামিয়ে দিয়েছে কিশোর। 'আমার ধারণা, রেডিয়েটরটা একেবারেই গেছে। ওই জীপ আবার চালাতে হলে নতুন রেডিয়েটর লাগবে।'

'তারমানে আটকা পড়লাম এখানে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জুলি। 'ভয় নেই। জীপের পিছনে দুই গ্যালন পানি রেডি রাখি আমি। আর সিবি রেডিও তো আছেই। চলো, পানি খেয়ে নিই আগে। তারপর রেডিওতে সাহায্য চাইব।'

'তোমরা থাকো,' কিশোর বলল। 'বলা যায় না, আরও কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি গিয়ে নিয়ে আসি।'

মুসা কিছু বলার আগেই রওনা হয়ে গেল কিশোর। মাথা নিচু করে দৌড় দিল। দূর দিয়ে আধচক্কর ঘুরে এগোল জীপের দিকে। খুব সাবধানে গাড়ির কাছে পৌঁছে যখন বুঝল কাছে-পিঠে শত্রু নেই, তখন মাথা তুলল। হাত বাড়িয়ে তুলে আনল একটা প্লাস্টিকের জগ। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা। দ্বিতীয়টাও বের করে একইভাবে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'খালি!'

'অসম্ভব! চেঁচিয়ে বলল জুলি। 'আসার সময় ভরে এনেছি আমি।'

'ফেলে দিয়েছে!' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'আর পানি যখন ফেলেছে, হয়তো...'

'হ্যাঁ,' মুসা কথা শেষ করার আগেই বলল কিশোর। রেডিওর মাইক্রোফোন কর্ডটা তুলে দেখাল সে। তার আছে, মাইকটা নেই, ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কিংবা ভেঙে ফেলে দিয়েছে।

চোখের ওপরের ঘাম মুছে আকাশের দিকে তাকাল মুসা। ইতিমধ্যেই আগুন ঢালতে আরম্ভ করেছে সূর্য, অথচ দুপুরের এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি। 'কী করব এখন? লোকালয় কম করে হলেও পনেরো মাইল দূরে। এই রোদের মধ্যে মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া...!' মাথা নাড়ল সে। 'মারা পড়ব!'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। 'সেটাই চায় আমাদের শত্রু!'

তেরো

ঢাল বেয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল কিশোর। 'পানি নেই, রেডিও নেই...এই বালির সমুদ্রে ভালমতই আটকা পড়লাম আমরা!'

গনগনে রোদের দিকে তাকিয়ে জুলি বলল, 'এরচেয়ে গুলি করে মেরে রেখে গেলে ভাল করত। কষ্ট থেকে বেঁচে যেতাম।'

'যে মারত তার জন্য ভাল হতো না। আমরা ছাতি ফেটে মরলে লোকে ভাববে পানির অভাবে মরেছি, দুর্ঘটনা। যদি অবশ্য আমরা মরার পর এসে জীপটা ধ্বংস করে দিয়ে যায় লোকটা, তবেই। গুলিতে যে রেডিয়েটর ফুটো হয়েছে এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে।'

'আমরা যে এখানে আছি কী করে জানল?' মুসার প্রশ্ন। 'পিছু নিয়ে এসেছে?'

তিক্ত কণ্ঠে জুলি বলল, 'পিছু নেয়ার দরকার ছিল না। সারা পথ ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এসেছি আমরা। ক্যাপরকে উঠে কেউ দূরবীন চোখে লাগিয়ে তাকিয়ে থাকলেই হলো। ওই ধুলো চোখে পড়বেই। তারপর রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে সামনের লোককে।'

রাগ চড়ছে মুসার। বেশির ভাগটাই নিজের ওপর। 'এখানে আসার পর থেকেই ভেড়া বানিয়ে রেখেছে আমাদেরকে ওরা। সব সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকছে।'

কাঁধ চাপড়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল জুলি। 'হয়েছে, কাউবয়, দোষটা তোমার নয়। দোষ এই হতচ্ছাড়া এলাকার। তুমি তো আর জায়গা চেনো না। আসলে ভুলটা আমারই হয়েছে। ধুলোর কথা ভাবা উচিত ছিল।'

'ওসব বলে তো আর লাভ নেই এখন,' কিশোর বলল। 'যা খুঁজতে এসেছিলাম, পেয়ে গেছি। কারসন আংকেলের র‍্যাঞ্চে কেন এই গোলমাল চলছে, জানি এখন। এর পিছনে কারা রয়েছে, যদি কোনদিনও না জানি, তাহলেও ওদের প্ল্যান বানচাল করে দিতে পারব। তেলের খবর আংকেলের কানে গেলেই সতর্ক হয়ে যাবেন তিনি। ওই তেল বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। কড়া পাহারা বসাবেন।'

পা ছড়িয়ে বসল মুসা। 'ডেনকে পেলে এখন জিজ্ঞেস করতাম, শেষ কবে থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলটা ব্যবহার করেছে ওরটেগা। আরেকটা কথা, ওরটেগার নিশ্চয় কোনও বন্ধু আছে, যে তেল ব্যবসায় জড়িত, সেই লোকটার নামও জানা দরকার।'

'পারলে ভালই হতো,' জুলি বলল। 'আরও একটা কথা ভুলেই বসে আছো তোমরা।'

ঝট করে একে অন্যের দিকে তাকাল কিশোর-মুসা।

'কী ভুলে বসে আছি?' জুলিকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'পল ব্যানউড। এখন আমার মনে হচ্ছে, কোনভাবে ওদের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল সে। ফলে...'

'তাকে শেষ করে দেয়া হয়েছে,' জুলির মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিল মুসা। উঠে দাঁড়াল। 'র‍্যাঞ্চে গিয়ে আংকেলকে হুঁশিয়ার করতে হবে। লোকগুলো বেপরোয়া। এরপর কী করবে কে জানে!'

কিশোর বসে রইল। মনে করিয়ে দিল, 'পানি নেই আমাদের কাছে। এখন হেঁটে ফেরার চেষ্টা করলে আরও তিনটে খুন যোগ হবে ওই একটার সঙ্গে।'

'এভাবে বসে থাকার কোন মানে নেই,' জুলিও উঠে দাঁড়াল। 'দেখি, পানির একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

ঢাল বেয়ে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়েই বিপদ বাধাল সে। আলগা বালিতে পা হড়কে গিয়ে পড়ল বালিতে অর্ধেক দেবে থাকা একটা মেসকিটের ঝাড়ে।

এসে তাকে টেনে তুলল কিশোর আর মুসা।

'দারুণ হয়েছে!' পায়ের দিকে হাত তুলে মুখ বাঁকাল জুলি।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল মুসা। খাকি কাপড় ভেদ করে জুলির পায়ে ঢুকে গেছে দুই ইঞ্চি লম্বা দুটো মেসকিটের কাঁটা।

'ঝাড়ের ডালে লেগে থেমেছি,' জুলি বলল। 'তবে ঝাড়টাও কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। এখন আর হাঁটতে পারব কিনা, সন্দেহ।'

আস্তে টান দিয়ে কাঁটা দুটো খুলল মুসা। জাম্পসুটের পা গুটিয়ে ক্ষত দেখল জুলি। রক্তপাত বন্ধ হয়ে এসেছে, কিন্তু ক্ষতের চারপাশটা লাল, ইতিমধ্যে ফুলে উঠেছে অনেকখানি।

'ব্যথা করছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'এখনও বেশি না। তবে করবে।' পা টানটান করল জুলি। 'আমি আর খুঁজতে পারব না। তোমরা একজন যাও। দেখো পানি আছে কিনা। পাওয়া না গেলে কী আর করা। এখানেই কোথাও ছায়ায় বসে থাকব চুপ করে। সূর্য ডোবার পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হলে তারপর বেরোব।' আবার আকাশের দিকে তাকাল সে। 'এখান থেকে সরা দরকার। নইলে গরমেই মরব।'

পানি খুঁজতে কে যাবে সেটা নিয়ে টস করল দুই গোয়েন্দা। কিশোর পেল কাজটা। আধঘণ্টা পরে ঘামতে ঘামতে ফিরে এল। তার দিকে তাকিয়ে আফসোসের ভঙ্গি করল মুসা। আসার সময় আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনে এসেছে: গরম ১১৫ ডিগ্রিতে উঠবে।

ধপ করে ওদের পাশে বসে পড়ল কিশোর। 'মনে হয় সূর্য ডোবা পর্যন্ত বসেই থাকতে হবে।'

এক ঘণ্টা পেরোল, আরেক ঘণ্টা, তারপর আরও এক ঘণ্টা। আকাশটা যেন তামার পাত, তার ওপর ভাসছে সূর্য নামের গনগনে অগ্নিকুণ্ডটা, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পশ্চিমে। রোদের মধ্যে কী রকম গরম খোদাই জানে, মেসকিটের ছায়াতেও একশোর বেশি ছাড়া কম হবে না। জ্বলন্ত একটা চুলার মধ্যে বসে রয়েছে যেন ওরা। শুকনো বাতাস, ভয়াবহ গরম মুখের ভিতরটা শুকিয়ে খসখসে করে দিয়েছে।

একটু আগেও যে মাছিগুলো ছিল, সেগুলো এখন নেই, নিশ্চয় ছায়ায় গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। ঠিক ঘুম নয়, অদ্ভুত এক ধরনের তন্দ্রা নেমেছে মুসার চোখে। আশেপাশে অনেক পিঁপড়ে দেখতে পাচ্ছে। ওপরের ঝোপ থেকে ভেসে আসছে ঘাসফড়িঙের বিরক্তিকর একঘেয়ে কিড়-কিড় কিড়-কিড় ডাক। আরও অনেক ওপরে, শূন্যে অলস ভঙ্গিতে ডানা মেলে দিয়েছে শকুন। ঘুরে ঘুরে উড়ছে, তাড়া নেই। মাথার ওপর উড়ছে কেন ওই বদখত কালো পাখিগুলো? কিসের অপেক্ষায় রয়েছে?

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল মুসার। ঝট করে সোজা হলো। ঝোপের ভিতরে একটা নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। আস্তে পাশে ঝুঁকে কিশোরের পিঠে টোকা

দিল সে। হাত তুলে দেখাল ঝোপটা।

বেরিয়ে এল একজন মানুষ। হাতেবোনা সুতীর প্যান্ট আর শার্ট পরেছে। মাথায় খড়ের হ্যাট।

'মারকি!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল জুলি। চোখ রগড়াল।

'কী বলেছিলাম?' হেসে বলল কিশোর। 'আবার আসবে বলেছি না?'

সোজা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো। একহাত তুলে ইশারা করে আবার ঢুকে গেল ঝোপে।

'আমাদেরকে যেতে বলছে,' কিশোর বলল।

'কিন্তু পুবে বলেছে যে,' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'আমরা যেতে চাই পশ্চিমে, র‍্যাঞ্চে।'

অনেক কষ্টে যেন নিজেকে টেনে তুলল জুলি। 'মারকির ওপর ভরসা করা যায়। আমাদের বাপ-দাদারা এখানে আসার অনেক আগে থেকেই মারকির লোকেরা ছিল এখানে। এই অঞ্চল তার চেনা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'চলো।'

মুসার কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল জুলি। ওর কারণে গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে ওদের।

একটু পরে ফিরে তাকাল মারকি। ওদেরকে মাথা নিচু করে হাঁটতে ইশারা করল। এক সেকেন্ড পরেই কারণটা বুঝতে পারল ওরা। পুবে বহুদূরে ক্যাপরকের মাথায় ঝিক করে উঠল আলো।

'হয় দূরবীনের চোখ, নয়তো রাইফেলের স্কোপ,' কিশোর বলল। 'আমাদের ওপরেই চোখ রেখেছে।'

'লসন ব্লাফের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে লোকটা,' জুলি বলল, 'জোরে জোরে শ্বাস টানছে। জায়গাটা ওরটেগা র‍্যাঞ্চের সীমানায়।'

'হুঁ,' বিড়বিড় করল মুসা, 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

পথ দেখিয়ে একটা শুকনো নালার মধ্যে নিয়ে এল মারকি। এঁকেবেঁকে পুবে চলে গেছে ওটা, ক্যাপরকের দিকে। একটা পাড় বেশ উঁচু, ওদের আড়াল করার জন্য যথেষ্ট। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়ানো লোকটা ওদের দেখতে পাবে না। নালার বুকে জমে রয়েছে নুড়ি, আলগা মাটি। পথ হিসেবে মোটেই ভাল নয়। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হলো মুসা, গুলি খাওয়ার চেয়ে হাঁটার কষ্ট সহ্য করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মনে মনে মারকির প্রশংসা না করে পারল না সে। ছিপছিপে, তারের মত শক্ত শরীর লোকটার, স্বচ্ছন্দে হাঁটছে। সামান্যতম অসুবিধা আছে বলে মনে হচ্ছে না। মাটির দিকে একটিবারের জন্যও তাকাচ্ছে না। দৃঢ় পদক্ষেপ। মুহূর্তের জন্যও চমকাচ্ছে না, থমকাচ্ছে না, মাটিতে তার হালকা স্যান্ডেলের ছাপ পর্যন্ত পড়ছে না। কীভাবে অসম্ভব কাজটা করতে পারছে, সে-ই জানে। একবার তো

ভেবেই বসল মুসা, মরীচিকা নয় তো? বিভ্রান্তি? হাসল আনমনেই। 'গরম, আর কিছু না। আবল-তাবল ভাবছি। উল্টোপাল্টা দেখছি। কিন্তু একসাথে তিনজনেই কী আর মরীচিকা দেখছে?'

একঘেয়ে চলার মাঝে কিছুটা নতুনত্ব আনার জন্য কদম গুনে চলল মুসা। এক হাজার কদম পর জুলিকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলেছে জুলি, গতি কমায়নি। তবে খোঁড়াচ্ছে এখন বেশি, আর যতই এগোচ্ছে শরীরের ভার তত বেশি ছেড়ে দিচ্ছে মুসার ওপর। হাসার চেষ্টা করল। শুকনো ঠোঁটে কেমন যেন বিবর্ণ লাগল হাসিটা। 'ভালই। তবে পানি পেলে আরও ভাল লাগত। কারও কাছে চিউইংগাম আছে?'

হেসে উঠল মুসা। জুলির মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। তার গলাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মাথাটা হালকা হালকা লাগছে। কাছেই কোথাও ভাঙা গলায় ডেকে উঠল একটা দাঁড়কাক। মিনিটখানেক পরেই ওটার সঙ্গে এসে যোগ দিল আরও দুটো পাখি। মুসার মনে হলো, ওদেরকেই ব্যঙ্গ করে হাসছে ওগুলো।

যদি হেসেই থাকে, দোষ দেয়া যায় না। খটখটে শুকনো খাদের মধ্যে দিয়ে, এই প্রচণ্ড রোদে এগিয়ে চলেছে বিচিত্র একটা দল, পাগল ছাড়া আর কী? হাসার মত অবস্থা থাকলে এখন মুসাও ওরকম করেই হাসত।

তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে, এই পাগলামীর পরে সুফল আসবে। লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। ওদের মাথার ওপরে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে এখন ক্যাপরকের চূড়া। সামনে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে বড় বড় কয়েকটা পাথরের চাঙরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে নালাটা। পাহাড়ের ওপর থেকে ভেঙে গড়িয়ে ওখানে পড়েছে পাথরগুলো। তার ওপাশে সবুজ ছায়া। কটনউড গাছের মত লাগল মুসার কাছে।

'গরমে মাথায় গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার,' কিশোর বলল। 'নইলে পানির আওয়াজ শুনব কেন?'

মুসা আর জুলিও দাঁড়িয়ে গিয়ে কান পাতল। খাদের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে বয়ে যাবার সময় বিচিত্র ফিসফাস, কানাকানি করছে দামাল বাতাস, কখনও জোরে, কখনও আস্তে। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা ঘুঘুর মন-উদাস-করা বিলাপ। কিন্তু সব শব্দের মাঝেও শোনা যাচ্ছে পানি পড়ার মধুর আওয়াজ, গভীর ডোবায় ঝরে পড়ছে পানি। আবার চলতে শুরু করল ওরা। পলকে দ্বিগুণ হয়ে গেল গতি। মারকিকে ধরতে হবে। সে একইভাবে এগিয়ে চলেছে, ওরা যখন থেমেছিল, তখনও দাঁড়ায়নি।

'ওই যে!' মোড় ঘুরে বলল কিশোর।

পাথরের ফাটল থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে টলটলে পানি। পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকদূর বয়ে এসে ঝরে পড়ছে ছয় ফুট নীচে একটা খাদে। পাথরের একটা বিশাল বেসিনে পানি জমে ডোবা তৈরি করেছে। আশেপাশের নরম মাটিতে ঘন হয়ে গজিয়েছে মাংকি ফ্লাওয়ার আর মেইডেনহেয়ার ফার্ন। ঘিরে রেখেছে ডোবাটাকে। মাথার ওপরে বাতাসে শিরশির করছে কটনউড গাছের পাতা। ডাল-

পাতাগুলো এমনভাবে মেলেছে, মনে হয় যেন একটা সবুজ চাঁদোয়া।

ডোবার কিনারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিনজনে। জানোয়ারের মত পানিতে মুখ নামিয়ে চুমুক দিয়ে খেতে লাগল ঠাণ্ডা, মিষ্টি পানি। পেট বোঝাই হয়ে যাওয়ার পর হাতে তুলে থাবড়া দিয়ে ঘাড়ে, মাথায় পানি দিতে লাগল মুসা, ঠাণ্ডা করার জন্য।

'সাবধান,' মুসার কাণ্ড দেখে হেসে বলল কিশোর, 'গোসল করতে নেমে পোড়ো না।'

'বলা যায় না।' আরেক খাবলা পানি তুলে মাথায় দিল মুসা। 'তবে আমার খাওয়া যখন শেষ হবে, গোসল করার জন্য আর বাকি থাকবে কিনা সন্দেহ।'

'আশ্চর্য!' জুলি বলল। 'এই এলাকায় কত ঘুরেছি, অথচ এখানে একটা ঝর্না আছে, জানতামই না। বোধহয় মৌসুমী।'

'ওটা না শুকানো পর্যন্ত নড়ছি না আমি এখান থেকে,' কটনউড গাছের তলায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। 'আহ্, এত আরাম লাগছে, মনে হয় বেহেশতে আছি!'

'কোথায় আছি, বলতে পারবে?' জুলিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসল জুলি। 'বললে বিশ্বাস করবে না, বাংকহাউসটার নীচেই কোথাও। ওটা ওপরে, ওই ওদিকে হবে।'

এই সময় এগিয়ে এসে তাকে কিছু বলল মারকি। ভাষাটা অনেকটা স্প্যানিশের মত লাগল মুসার কাছে। মেকসিক্যান। বুঝতে পারল না। একই ভাষায় জবাব দিল জুলি। তারপর দুই গোয়েন্দাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাল, 'ও বলছে আমাদের এখন যাওয়া উচিত। নইলে দেরি হয়ে যাবে।'

'কিসের দেরি?' চোখ মেলল মুসা। 'কেউ কি পার্টি দিচ্ছে?'

তার রসিকতায় কান দিল না জুলি। 'আমাদেরকে ক্যাপরকের ওপরে উঠতে বলছে মারকি। বুঝতে পারছি না, কেন।'

চোখ মিটমিট করল মুসা। 'ওখানে?' মাথার ওপরে খাড়া হয়ে থাকা ক্যাপরকের দিকে তাকাল সে। 'আমাদেরকে কী ভেবেছে? পাহাড়ী ছাগল?'

কিন্তু ততক্ষণে উঠতে শুরু করে দিয়েছে মারকি। পাহাড়ের গায়ে যেন আঁকড়ে রয়েছে সরু একটা পথ, সেটা ধরে উঠছে।

উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। সে চেষ্টা করলে উঠতে পারবে। কিন্তু জুলির কী হবে?

ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারল জুলি। বলল, 'আমিও পারব।'

আধঘণ্টা ধরে একটানা উঠে চলল ওরা। পশ্চিম দিগন্তে অনেক হেলে পড়েছে সূর্য। তেজ হারিয়েছে। উঠতে অসুবিধা হচ্ছে অন্য কারণে। একে তো খাড়া, তার ওপর মাত্র ফুটখানেক চওড়া পথ, আর তাতে বিছিয়ে রয়েছে আলগা চুনাপাথর। সামনে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে মারকি, একটিবারও পা ফসকাচ্ছে না। কিন্তু পিছনে বার বার পা ফসকাচ্ছে জুলির। দু'হাতে আঁকড়ে ধরছে বেরিয়ে থাকা পাথর। পিছনে রয়েছে মুসা আর কিশোর। খুব সাবধান হয়ে পা ফেলছে। নীচে ফিরে

তাকানোর সাহস হচ্ছে না কারও।

অবশেষে চূড়ায় উঠে দেখল ওরা, বাংকহাউসটা মাত্র একশো গজ দূরে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বোলাল কিশোর। সব কিছু শান্ত। বাড়ির পাশে আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে হলুদ পিকআপটা। আস্ত।

বাড়ির দিকে প্রায় দৌড়ে এগোল মারকি। পিছনের দরজার কাছাকাছি পৌঁছে মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'আবার কোনও ফাঁদে গিয়ে পা দিচ্ছি না তো?'

এদিক ওদিক তাকাল মুসা। 'মরুভূমি থেকে নিরাপদে আমাদেরকে বের করে এনেছে বুড়ো। ক্ষতি করেনি। ওকে বোধহয় আরেকটু বিশ্বাস করা যায়।'

জুলির সাথে কথা বলছে মারকি।

'ভিতরে যেতে বলছে আমাদের,' জুলি জানাল। 'জলদি করতে বলছে।'

রান্নাঘরের জানালার কাছে এসে ভিতরে উঁকি দিল কিশোর। ভালমত দেখল ছোট্ট ঘরের ভিতরটা। 'সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'সকালে যেভাবে যা রেখে গিয়েছিলাম তেমনি রয়েছে।' পিছনের দরজা খুলল সে।

'এখনও বুঝতে পারছি না,' ভিতরে পা রেখে মুসা বলল, 'এত তাড়াহুড়ো করতে বলছে কেন আমাদের? কী চায়...'

'টেলিফোন!' নিচু গলায় বলে কানের কাছে হাত তুলে রিসিভার তোলার ভঙ্গি করল মারকি।

'ফোন তুলতে বলছে?' ভ্রুকুটি করে রিসিভারের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

'সাবধান!' ফিসফিসিয়ে বলে ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল মারকি।

আস্তে করে রিসিভার তুলে মাউথপিসে হাত চাপা দিল কিশোর। 'তোমাকে বলেছি...কখনও পার্টি লাইন ব্যবহার করবে না...রিস্‌কি!' কিঁচকিঁচ করে উঠল যেন রাগত কণ্ঠ, সব কথা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

'হয়েছে, হয়েছে,' বলল আরেকটা কণ্ঠ। এই লোকটা বোধহয় প্রথমজনের চেয়ে কাছে, কারণ তার গলা অনেকটা স্পষ্ট। ইস্, আরেকটু পরিষ্কার যদি শোনা যেত!–আফসোস করল কিশোর, তাহলে হয়তো গলা চিনতে পারত। দ্বিতীয় লোকটা বলল, সবচেয়ে কাছে আরেকটা ফোন রয়েছে বাংকহাউসে, কারসনের বাংকহাউসে। ছেলেগুলোকে বেকায়দা অবস্থায় রেখে এসেছি আমি। এতক্ষণে শেষ হয়ে যাওয়ার...।' কিঁচকিঁচ, খড়খড়, শোঁ শোঁ নানারকম যান্ত্রিক শব্দে ঢাকা পড়ে গেল কথা।

তারপর আবার শোনা গেল, 'নিজের কাজটুকু ভালমতই করেছে পল ছেলেটা...তোমাদের জন্য ক্যাপরকেই বসে থাকব।'

আবার কিছুক্ষণ যান্ত্রিক বাধা। শোনা গেল, '...আরেকজনকে তুলে নিতে পুরানো উইন্ডমিলে যেতে হবে। অন্ধকার হলে দেখা কোরো।'

পরের কথাগুলো শোনার জন্য রিসিভারটা এত জোরে কানের ওপর চেপে ধরল কিশোর, যেন কানের ভিতর ওটা ঢুকিয়ে ফেলতে চায়। শুনে মোচড় দিয়ে উঠল পেট। 'দু'জনকেই খতম করে দেবে।'

লাইন কেটে গেল। রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে তাকাল কিশোর। 'লাইনটা আরেকটু পরিষ্কার হলে ভাল হতো। গলা চিনতে পারতাম।' মাথা নাড়ল সে। 'পলের নাম বলল। সে-ও এতে জড়িত কিনা কে জানে!'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল জুলি। 'অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না। ওর মত ছেলে...'

'আরে!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'আবার গায়েব!'

ফিরে তাকাল জুলি আর কিশোর। হাত তুলে খোলা দরজা দেখাল মুসা। মারকি নেই। 'মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়েছিলাম।' হাত নাড়ল সে। 'ব্যস, হাওয়া!'

'ও বুঝেছে আর থাকার দরকার নেই,' হাসল কিশোর। 'এখন থেকে আমরাই সামলাতে পারব। কামনা করি তার ধারণাই ঠিক হোক।'

'শোনো,' আগের কথায় ফিরে এল মুসা, 'আমি জুলির দলে। সে পলকে চেনে। আমরা চিনি না।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যুক্তি ঠিকই আছে। লোকটা বলল, কাউকে তুলে নিতে যাচ্ছে। এবং দু'জনকে খুন করার কথা বলল। তারমানে পল আর অন্য লোকটাকে। কারসন আংকেলকে দরকার এখন। ওরা বলল পুরানো উইন্ডমিল, তিনি নিশ্চয় বুঝবেন কোনটার কথা বলেছে। শুনে মনে হলো ক্যাপরকেই কোথাও রয়েছে লোকগুলো।'

'ফোন করা ঠিক হবে না,' মুসা বলল। 'পার্টি লাইনে ওরাও আমাদের কথা শুনে ফেলতে পারে।' জুলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যাঞ্চ রোড ধরে আমরা এখানে এসেছি। শর্টকাটে কোনও রাস্তা আছে?'

শর্টকাট নেই, তবে ঘুরপথে আছে। হাইওয়ে। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে। তবে একবার পৌঁছাতে পারলে দ্রুত চলে যেতে পারব র‍্যাঞ্চে। কারও চোখে পড়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনাও কম।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিকআপটা পরীক্ষা করে নিল দুই গোয়েন্দা।

'এসব কাজ করতে করতে হাত পাকিয়ে ফেলেছ মনে হয়,' জুলি প্রশংসা করল।

র‍্যাঞ্চের কাছ থেকে দেড় মাইল দূরে থাকতে বুম করে শব্দ হলো গাড়ির সামনে ডান পাশে। ঝটকা দিয়ে ডানে ঘুরে গেল গাড়ির নাক। গায়ের জোরে স্টিয়ারিং চেপে ধরে কোনমতে পথের পাশের খাদে পড়া থেকে বাঁচাল মুসা। দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি।

'কপালই খারাপ!' স্টিয়ারিঙে থাবা মারল মুসা। চাকা ফাটার আর সময় পেল না!'

আস্তে জানালা দিয়ে মাথা বের করে তাকাল কিশোর। লুকানোর মত ঝোপ নেই কাছেপিঠে। 'গুলি করে ফাটায়নি তো?'

ততক্ষণে নেমে পড়েছে মুসা। বসে যাওয়া চাকাটা দেখে বলল, 'মনে হয় না। এখন কী করি?'

'আরেকটা চাকা লাগাতে হবে,' কিশোর বলল। 'তুমি লাগিয়ে জুলিকে নিয়ে এসো। আমি হেঁটে যাই।' হাসল। হালকা সুরে বলল, 'দেখা যাবে, কে আগে যেতে পারে।'

কেউ প্রতিবাদ করার আগেই রওনা হয়ে গেল কিশোর।

সূর্যাস্ত চলছে। আবহাওয়া অনেক ঠাণ্ডা। দুপুরের তুলনায় তো রীতিমত শীতকাল এখন। জমে থাকা বড় বড় কতগুলো মেঘের আড়ালে ঢুকে গেছে সূর্য। লাল, কমলা, নীলের খেলা চলছে পশ্চিম আকাশে। হঠাৎ ছড়ানো ডানা বন্ধ করে দিয়ে ভারি পাথরের মত নেমে এল একটা নিশাচর বাজ, কিশোরের ঠিক মাথার ওপর থেকে একটা পোকা ছোঁ দিয়ে নিয়ে উড়ে গেল আবার।

মুসাদেরকে ছেড়ে আসার পনেরো মিনিটের মাথায় হাঁপাতে শুরু করল কিশোর। তবে পৌঁছে গেছে। র‍্যাঞ্চহাউস আর মাত্র একশো ফুট দূরে। দৌড় থামাল না সে। বাড়ির সামনে শুধু অ্যান্ডি কারসনের সাদা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সবার আগে টের পেল ন্যাপ। ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল তাকে স্বাগত জানাতে। শব্দ শুনে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন অ্যান্ডি কারসন।

'আরে, কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'হেঁটে কেন? মুসা কোথায়?'

'চাকা বদলাচ্ছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'এসে যাবে।' বারান্দায় উঠল সে।

'আংকেল কোথায়? জরুরী দরকার। কেসের কিনারা করে ফেলেছি। এখন পলকে খুঁজে বের করতে পারলেই...'

'পল?' দ্বিধায় পড়ে গেলেন মিসেস কারসন। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। জ্যাক বেরিয়ে গেল তোমাদের সাথে দেখা করতে। এই তো, তিরিশ-চল্লিশ মিনিট আগে একটা ফোন পেয়েছে।'

পাথর হয়ে গেছে যেন কিশোর। 'আমাদের সাথে? কে ফোন করল?'

'নাম বলেনি। যে-ই করে থাকুক, বলেছে, পল বেঁচে আছে। তুমি আর মুসা নাকি ওকে খুঁজে পেয়েছ। সন্দেহ হয়েছে জ্যাকের। ও পলের সাথে কথা বলতে চেয়েছে ফোনে...'

'তারপর?' রাস্তায় ধুলো দেখতে পাচ্ছে কিশোর। হলুদ পিকআপটা আসছে।

'ফোনে কথা বলল পল। বলল, সে ভালই আছে। ওটা পলের গলা কিনা সন্দেহ হলো জ্যাকের, কারণ গলাটা অস্পষ্ট। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। কিংবা নেশা করেছে।' আতঙ্ক ভর করল হঠাৎ মিসেস কারসনের কণ্ঠে। 'তারপর আবার ফোন ধরল আগের লোকটা। বলল পল, মুসা আর তোমাকে যদি জীবিত দেখতে

চায়, তাহলে যেন এক সেকেন্ড দেরি না করে চলে যায় জ্যাক। একা!'

'কোথায় দেখা করতে বলেছে?' জিজ্ঞেস করল বটে, কিন্তু জবাবটা জানে কিশোর।

'উইন্ডমিল,' মিসেস কারসন জানালেন। 'পুরানো বাস্তুভিটার কাছে।'

চেহারা স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিশোর। কীভাবে বলবে ধোঁকা দিয়ে তাঁর স্বামীকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুন করার জন্য?

পনেরো

'খবর খারাপ!' মুসা কাছে এলে চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'কারসন আংকেল গেছেন ঘণ্টাখানেক আগে!'

'পুরানো বাস্তুভিটায় নিশ্চয়ই?' জুলি বলল।

'তাহলে আর দেরি করছি কেন আমরা?' ট্রাকটাকে পিছিয়ে এনে ঘুরিয়ে নিল মুসা। চলার জন্য তৈরি। 'এসো, ওঠো। আশা করি সময়মতই চলে যেতে পারব।'

মাথা নাড়ল কিশোর। পুরানো উইন্ডমিলে যা ঘটার তা নিশ্চয় এতক্ষণে ঘটে গেছে। বিরক্ত হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুসা। তবে নিরাশ হলো না। কিশোরের মুখ দেখেই বুঝতে পারছে, মনে মনে নতুন কোন পরিকল্পনা করছে সে।

'আধঘণ্টার মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'ওরটেগা বলেছে, ক্যাপরকে অপেক্ষা করবে সে আর পল। ওখানেই নিয়ে যাওয়া হবে কারসন আংকেলকে। আমাদেরকে হিসেবে ধরেনি ওরা। কাজেই, আমরা গিয়ে যদি ওদেরকে চমকে দিতে পারি, পল আর আংকেলকে বাঁচানো হয়তো সম্ভব হবে।'

'কিন্তু ক্যাপরকের কোথায়?' প্রশ্ন তুলল জুলি।

আন্টির দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?'

এক মুহূর্ত ভাবলেন মিসেস কারসন। 'নিশ্চয় পুরানো ছাউনিটাতে। ওরটেগা র‍্যাঞ্চের উত্তর ধারে, লসন ব্লাফের ঠিক দক্ষিণে। কিন্তু এখনও ওখানে টেলিফোন লাইন আছে? আমি তো ভেবেছিলাম কবেই সব নষ্ট হয়ে গেছে।'

'বিকেলে আলো দেখেছিলাম ওখানেই,' জুলি বলল। 'ওই যে, আমরা আসার সময় ঝিক করে উঠেছিল।'

'জায়গা কেমন ওখানকার?' জানতে চাইল কিশোর। 'বাংকহাউসের আশেপাশের মতই?'

'যদ্দূর মনে পড়ছে,' জবাবটা দিলেন মিসেস কারসন, 'খোলা। ঘাস আছে। আর কিছু মেসকিট ঝোপ। একটা ছাউনি আছে, পিছনে একটা কোরাল। হাইওয়ে থেকে বেশ দূরে।'

পিকআপের গায়ে হেলান দিল মুসা। 'হাইওয়ে থেকে যাওয়া পথের ওপর চোখ রাখবেই ওরা। কাজেই ওপথে গিয়ে সুবিধা করতে পারবে না।' মাথা নাড়ল সে। 'সময়ও কম। একটা কাজই করা যেতে পারে। বালির পাহাড় পেরিয়ে গিয়ে ক্যাপরক পেরোনোর চেষ্টা করতে পারি, আজ বিকেলে যেমন করেছি।'

'এই অন্ধকারে?' প্রতিবাদ জানাল জুলি। 'মারকিও সাথে নেই এখন।'

কী যেন ভাবছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'কীভাবে যাব সেটা বড় কথা নয়, ব্যাটাদের ওপর কীভাবে গিয়ে চড়াও হব, সেটাই হলো আসল। আসছি।'

কারসনের অফিসে এসে ঢুকল সে। দেয়ালে ঝোলানো ম্যাপটা দেখল মিনিটখানেক। তারপর ডেস্ক থেকে একটা রুলার তুলে নিয়ে ম্যাপে চেপে ধরে মাপতে আরম্ভ করল। তারপর ডেস্কের ওপর বসে ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব শুরু করল। 'কাজ হবে মনে হয়,' সন্তুষ্ট হয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করল সে। আবার বারান্দায় বেরিয়ে দেখল, নিচু গলায় কথা বলছে মুসা, জুলি আর মিসেস কারসন। মুসার মুখে চওড়া হাসি।

কিশোরকে দেখেই মিসেস কারসন বলে উঠলেন, 'কীভাবে চড়াও হবে?'

পুবে দেখাল কিশোর। ক্যাপরকের ওপরে, সামান্য দক্ষিণে লাল আলো মিটমিট করছে দেখতে পেল সবাই।

'ওগুলো রেডিও টাওয়ারের আলো,' কিশোর বলল। 'ক্যাপরকের মাইল দুই দক্ষিণে। সোজা উড়ে গিয়ে ওদের ওপর পড়ব আমি আর মুসা···'

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জুলি, 'ডানা পাবে কোথায়? আরব্য রজনীর দৈত্যকে ডাকবে নাকি জাদুর কার্পেটের জন্য?'

'আধুনিক জাদুর কার্পেট,' জবাব দিল কিশোর। 'আলট্রালাইটে করে সোজা উড়ে যেতে পারব। আমার বিশ্বাস, ক্যাপরক পেরোনোর মত উঁচুতে উঠতে পারবে বিমানটা।'

'কিন্তু ভীষণ আওয়াজ হবে,' মুসা বলল। 'ওদের কানে যাবেই। দেখলেই গুলি করবে।'

হাসল কিশোর। 'আওয়াজ হবে না। ক্যাপরক পেরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেব। বাকি পথ গ্লাইড করে উড়ে যাব নিঃশব্দে। ক্যালকুলেটরে হিসেব করে দেখেছি। ম্যাকসিমাম অলটিচিউডে উঠে যদি ইঞ্জিন বন্ধ করে দেই, বাতাসে ভেসে ছাউনি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারব।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল মুসা। 'গ্লাইড করে?'

জবাব না দিয়ে বাতাস কোনদিকে থেকে বইছে পরীক্ষা করল কিশোর। আকাশের দিকে তাকাল। দক্ষিণে রেডিও টাওয়ারের ওপাশে তখন সবে উঁকি দিয়েছে বাঁকা চাঁদ।

'এই দখিনা বাতাস কোন কাজে আসবে না,' নিজেকেই যেন বোঝাল কিশোর। 'আমাদের গতিই শুধু নষ্ট করবে। তবে চাঁদটা উপকার করবে। আকাশ থেকেই ছাউনিটা দেখতে পাব। ভিতরে আলো না থাকলেও মিস করব না।'

'ধরো পেলে,' জুলি জানতে চাইল। 'তারপর কী করবে?'

কাঁধ সোজা করল কিশোর। ল্যান্ড করাটাই হবে সবচেয়ে কঠিন। নামার মাত্র একটা সুযোগ পাব আমরা। ঠিকমত নামতে না পেরে ওড়ার জন্য আবার ইঞ্জিন চালু করলেই ওদের কানে যাবে। তাহলে পল আর আংকেলকে বাঁচানোর আশা শেষ।'

'আমরা কী করব?' মিসেস কারসন জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি আর জুলি?'

'আপনারা শেরিফকে খবর দিন, যাতে পালানোর পথ সব বন্ধ করে দিতে পারে। আংকেলকে যে ধরে নিয়ে গেছে তাকে ধরার চেষ্টা করবেন।' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'হয়তো তাঁকে নিয়ে এখনও ছাউনিতে পৌঁছায়নি সে। একবার গিয়ে ওখানে পৌঁছালে আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না তিনি। সেই সঙ্গে পলও যাবে।'

'তোমাদের সাহায্য দরকার হবে না?' জুলি জিজ্ঞেস করল।

'লাগলে সঙ্কেত দেব। গুলি করব, হর্ন বাজাব, কিংবা টর্চ জ্বালব। সঙ্কেত পেলেই এগোবে।'

ফোন করতে গেলেন মিসেস কারসন। ছাউনিতে ছুটল দুই গোয়েন্দা ও জুলি, আলট্রালাইটটাকে বের করার জন্য।

'ট্যাংক বোঝাই করে নিতে হবে,' কিশোর বলল। আজকের রাতে তেলের অভাবে বিপদে পড়তে চাই না।'

বিমানটাকে ঠেলে নিয়ে চলল মুসা আর কিশোর। একটা তেলের টিন তুলে নিয়ে ওদের পিছনে এল জুলি। এখনও খোঁড়াচ্ছে। বিমানটাকে কাঁচা রাস্তায় বের করে ছোট্ট ট্যাংকটা বোঝাই করতে লাগল কিশোর।

'হয়েছে,' বলে টিনটা মাটিতে রেখে পাইলটের সীটের পাশে চলে এল সে।

হালকা বিমানটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। আবছা আলোতে এই প্রথম তার মনে হলো যন্ত্রটা বড়ই ক্ষুদ্র।

'ম্যাকসিমাম অলটিচিউড কতখনি এটার?' কণ্ঠের উদ্বেগ ঢাকার চেষ্টা করল সে।

'পাঁচ হাজার ফুট,' বলে পাইলটের সীটে উঠে বসল কিশোর। হেসে বলল, 'এসো, ওঠো। ভয় পেলে বিপদ কমবে না।' ইগনিশনে মোচড় দিতেই যেন জ্যান্ত হয়ে চিৎকার শুরু করল ইঞ্জিন।

'সাবধান থেকো, কাউবয়,' বলে মুসার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল জুলি। 'কিশোর, তুমিও।'

কিশোরের পাশে উঠে বসল মুসা। ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ চিৎকারকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাতের বেলা উড়ে আইন অমান্য করছি না তো?'

'করছিই তো।' টেসটিং কন্ট্রোল নাড়াচাড়া শুরু করল কিশোর। 'এফ এ এ ইন্সপেক্টর খবর পেলে কানটা ধরে মাটিতে নামিয়ে দেবে, তারপর হাঁটা ছাড়া গতি নেই।' মুসার অসুখী মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ কী হয়েছে তোমার? এত ভাবছ কেন? বুঝতে পারছ না, কারসন আংকেলদের বাঁচানোর এটাই একমাত্র উপায়?'

মুসা চুপ করে রইল।

আলট্রালাইটের পাশে এসে থামল হলুদ পিকআপ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গেল জুলি। গান র‍্যাক থেকে একটা শটগান বের করে জানালা দিয়ে জুলির হাতে তুলে দিলেন মিসেস কারসন। কিছু বললেন, মুসা শুনতে পেল না।

'উনি বললেন এটা তোমাদের দরকার হতে পারে,' ফিরে এসে মুসার হাতে বন্দুকটা তুলে দিতে দিতে বলল জুলি।

মিসেস কারসনের দিকে হাত নাড়ল মুসা।

থ্রটল টেনে ইঞ্জিনে শক্তি জোগাল কিশোর। ঝাঁকুনি দিয়ে রওনা হয়ে গেল আলট্রালাইট। খুব ধীরে গতি বাড়ছে বলে মনে হলো মুসার। কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে কিশোর। অবশেষে যেন অনেক কষ্টে মাটির মায়া ছাড়িয়ে শূন্যে উঠল বিমান।

'তুমি যে এত ভারি, জানা আছে তোমার?' ঝোপের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে মুসাকে বলল কিশোর। মাটি ছাড়ার পর পেটে খাবার ভর্তি করা শকুন যেমন করে ওড়ে, মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল, ঠিক তেমনি টালমাটাল অবস্থা আলট্রালাইটের, ভারের কারণে।

'তোমার হিসেব ভুল না হলেই বাঁচি,' মুসা বলল। উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

রওনা হয়ে গেছে পিকআপটা, দেখা যাচ্ছে। তীব্র বেগে ছুটছে উত্তরে, হাইওয়ের দিকে। সামনের আবছা অন্ধকার আকাশে মাথা তুলে রেখেছে তিনটে বিশাল রেডিও টাওয়ার, মিটমিট করছে লাল তিনটে আলো যেন দানবের চোখ। সোজা সেদিকে বিমানের নাক ঘুরিয়ে দিয়ে পাখার লেভেল ঠিক করল কিশোর। ধীরে ধীরে উঠে চলেছে উঁচুতে। বাতাস ঠাণ্ডা। ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ যেন মুসার কানের পর্দা ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে।

'এই ভার নিয়ে,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'তেমন সুবিধে করতে পারব না আমরা। যদিও সরাসরি যাচ্ছি, তবু পিকআপের আগে পৌঁছতে পারব বলে মনে হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। যতই ওপরে উঠছে, ততই অস্পষ্ট হয়ে আসছে মাটির নিশানা। এখন শুধু চোখে পড়ছে এখানে ওখানে কিছু সাদা মাটির টিলা। এখনও দিগন্তের কোল ঘেঁষেই রয়েছে চাঁদ, যেন মায়া কাটিয়ে উঠতে মন চাইছে না ওপরের আকাশে। শুধু, সামনের তিনটে লাল আলো খানিকটা উষ্ণ স্বস্তি ছড়াচ্ছে মুসার মনে। সেই আদিমকাল থেকেই আলো এবং আগুন যে মানুষের খুব প্রিয়, এটা বোধহয় তারই প্রমাণ। আরও কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল ক্যাপরক। নীচের অন্ধকারে সাদা মোটা একটা রেখা যেন এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে। পাঁচ হাজার ফুট ওপর থেকে এতই ছোট লাগে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না মাটিতে দাঁড়িয়ে এই পাহাড়টারই আকৃতি দেখেই বিস্ময়ে থ হয়ে যেতে হয়।

ঠিক ওই মুহূর্তে থ্রটল ধরে টান দিল কিশোর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল

ইঞ্জিনের শব্দ। শুধু উঁচুমাত্রার একটা চিঁ-চিঁ আওয়াজ টিকে রইল। বন্ধ হয়ে গেল সেটাও। তারপর কানের পাশে কেটে যাওয়া বাতাসের শোঁ শোঁ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। বাতাসে ডানা মেলে শিস কাটতে কাটতে উড়ে চলেছে যেন একটা অতিকায় নিশাচর পাখি।

ডানে কাটল কিশোর। দক্ষিণে উড়ে চলেছে।

অন্ধকারে নিঃশব্দে উড়ছে বিমান। মসৃণ গতিতে। তবে ধীরে ধীরে কমছে গতিবেগ, উচ্চতাও হারাচ্ছে সেই সঙ্গে। পাখার লেভেল আবার ঠিক করল কিশোর। 'নামতে আর পাঁচ মিনিট। ছাউনি কোথায় দেখো। কোথায় নামলে ভাল হয়, সেটাও দেখবে।'

গ্লাইডিঙের সময় তাহলে এই অবস্থা হয়!–ভাবল মুসা। তার পেটের মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত শূন্যতা, যেন গিঁট বেঁধে গেছে নাড়িগুলোতে। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ। মনে পড়ল কথাটা; শুনেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্লাইড করে শত্রু এলাকায় ঢোকার সময় কত বিমান যে বিপদে পড়েছে, ধ্বংস হয়েছে তার হিসেব নেই। বেশির ভাগ চুরমার হয়েছে গাছপালা আর শক্ত বেড়ায় বাড়ি লেগে। যেভাবে ভেসে চলেছে ওরা, এখন হঠাৎ করে সামনে যদি গাছটাছ কিছু পড়ে যায়, বাঁচার আশা নেই।

আরও নীচে নামার পর ম্লান চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে মাটি দেখা গেল। খোলা সমতল জায়গা, ঘাস থাকতে পারে, তবে বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কালো ছায়া–নিশ্চয় মেসকিটের ঝোপ। কোথাও কোথাও ছায়াগুলো বেশ ঘন। মেসকিটের লম্বা, বাঁকা কাঁটায় গিয়ে আছড়ে পড়ার কথা ভেবে শিউরে উঠল মুসা।

'লসন ব্লাফ আসছে,' ঘোষণা করল কিশোর। সামনে, ডানে যেখানে ঠেলে উঠেছে ক্যাপরক, সেদিকে আঙুল তুলে দেখাল। গাছপালা নেই বটে, খোলাও আছে, তবে নামার জন্য যথেষ্ট সমতল নয়। শেষ মাথায় একটা ছড়ানো রেখার মত চোখে পড়ছে–নিশ্চয় কাঁটাতারের বেড়া।

মুসা ভাবল, সেই ভয়ানক রাতে যখন শ্বেতাঙ্গদের খুন করার জন্য চড়াও হয়েছিল নেটিভ আমেরিকানরা, আকাশ থেকে যদি এরকম একটা বিমানকে ওদের ওপর আচমকা নেমে আসতে দেখত, দেবতার আকাশযান মনে করে কী করত ওরা ভেবে হাসি পেল তার।

'কিশোর, আলো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। সামনে দু'শো গজ দূরে একটা হলদে আলো মিটমিট করছে। তারপর, চাঁদের আলোয় ঘরটার আবছা অবয়ব ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছোট একটা কেবিনের মত, একটা কোরাল রয়েছে, তার পিছনে একটা ছাউনি।

'নামার জায়গা দরকার!' জরুরী গলায় বলল কিশোর। 'এখুনি···'

মুসাও দেখতে পাচ্ছে, ওদের নীচে মাটির প্রতিটি ইঞ্চি জুড়ে রয়েছে ঘন ঝোপ। বাঁয়ে কালো ছায়ার মাঝে এক চিলতে সাদা জায়গা চোখে পড়ছে। হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওখানে নামা যায়?'

চোখের পলকে বিমানের নাক ঘুরিয়ে সেদিকে ছোটাল কিশোর। কিন্তু প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল, দেরি করে ফেলেছে। সময়মত পৌঁছাতে পারবে না ওখানে। ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে আলট্রালাইট। তার ওপাশে রয়েছে ঘন ঝোপ আর কিছু বড় বড় গাছ।

'নাহ্, বোধহয় আর পারলাম না!' নিরাশার বাণী শোনাল কিশোর।

ষোলো

তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে কালো ছায়াগুলো। 'শক্ত হয়ে চেপে বসো,' সাবধান করল কিশোর। 'বাড়ি লাগবে।'

মেসকিটের হালকা মাথা সবে ছুঁয়েছে বিমানের চাকা, কন্ট্রোল ধরে টান মারল সে। আলট্রালাইটের নাক সামান্য উঁচু হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ শরীরের নীচের অংশটা লাফ দিয়ে উঠে এল সীট থেকে। ডালে লেগে ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছে আলট্রালাইট। তাতেই ঝাঁকুনি খেয়ে ওপরে উঠে গেছে শরীর। বিচিত্র কয়েকটা তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। তারপর সামনের চাকা ধাক্কা খেলো মাটিতে। বাঁকা হয়ে গেল চাকা ধরে রাখা স্টীলের পাইপ। হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিমান।

সামনের দিকে উড়ে যাচ্ছিল মুসা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে আটকে রাখল সীট বেল্ট। পাগলের মত দুলছে আলট্রালাইট, পিছনের চাকা আটকে রয়েছে ঝোপের ডালে, নাক নিচু লেজ উঁচু করে বেকায়দা ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে রয়েছে। তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে বন্দুক।

'মুসা, ঠিক আছো তুমি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আছি। তুমি?'

'বৈমানিকদের একটা প্রচলিত কথা আছে: যতক্ষণ ভেঙে পড়া বিমানের কাছ থেকে দূরে না যাবে, ততক্ষণ ভাল আছি বলবে না!' দ্রুতহাতে সীট বেল্ট খুলছে কিশোর। 'জলদি সরে যাওয়া দরকার।'

বেরিয়ে এসে দৌড় দিতে গিয়েই কিসে যেন হোঁচট খেল মুসা। দেখল, পড়ে যাওয়া শটগানটা। আস্ত নেই, দুই টুকরো। ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে বাঁট। এটা আর নেয়ার কোন মানে হয় না।

মেসকিটের ঝাড়ের আড়ালে থেকে ছুটল দু'জনে। খোলা জায়গার আলোটা লক্ষ্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে রয়েছে একটা ছায়ামূর্তি। পিছনের চারণভূমি থেকে ভারি গলায় ওঁম্‌বাঁআ করে উঠল একটা ষাঁড়। বারান্দার লোকটা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েই আবার ঘরে চলে গেল।

'কিছু শুনেছে মনে হয়?' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

'মনে হয়। তবে আলট্রালাইটের কথা কল্পনাও করেনি, ভেবেছে গরুটরু কিছু একটা ঢুকেছে ঝোপের মধ্যে। ঝোপগুলো থাকায় ভালই হয়েছে আমাদের জন্য।'

দুই মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কেবিনে কোন নড়াচড়া নেই। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছে লোকসঙ্গীত আর ওয়েস্টার্ন মিউজিকের মিশ্র শব্দ।

'ঘটনা ঘটাতে হলে এখন শুরুটা আমাদেরকেই করতে হবে,' কিশোর বলল। 'শোনো। শুনে বুঝে দেখো আমি যা বলি পছন্দ হয় কিনা।'

চুপচাপ শুনে মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'পছন্দ হয়েছে।'

মুহূর্ত পরেই ধুলোয় ঢাকা নোংরা চত্বর ধরে দৌড় দিল কিশোর। ছায়ার মধ্যে থেকে, মাথা নিচু করে। বারান্দার কাছে পৌঁছেই ঝপ করে বসে পড়ল।

'এই, পল!' মুসার ডাক কানে এল তার। লুকিয়ে থেকে ডাকছে সে।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গান। আলো নিভে গেল। কাঠের মেঝেতে ভারি পায়ের ছোটাছুটির শব্দ। ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল একটা স্ক্রীন ডোর, বন্ধ হলো দড়াম করে। বারান্দায় বেরোল একটা লোক, হাতে উদ্যত রিভলভার। দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামল সে।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে লোকটার ওপর গিয়ে পড়ল কিশোর। লোকটা ওরটেগার মত বেঁটে নয়, বিশালদেহী। তার হাতে থাবা মারল কিশোর। লোকটার হাত থেকে রিভলভারটা উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক ফুট দূরের নরম বালিতে।

কিশোরের মুখোমুখি হলো লোকটা। ডেন মারটিন! ঘুসি মারল কিশোরের চোয়ালে। ঝট করে মাথা সরিয়ে ঘুসিটা এড়াল কিশোর, কিন্তু বাহুর ঘষা লাগল ঘাড়ে মুগুরের মত। দ্বিতীয় ঘুসিটা এড়াতে পারল না কিশোর। কপালের পাশে লাগল। তার বুকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে চিত করে ফেলে দিল লোকটা। মাথার পিছনে বাড়ি লেগে জ্ঞান হারাল কিশোর। মুহূর্তের জন্য।

আবার চোখ মেলে যা দেখল তাতে মনে হলো জ্ঞান না ফিরলেই ভাল হতো। কিশোরের গায়ের দুই পাশে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দুই হাতে বিশাল একটা পাথর তুলে ধরেছে লোকটা। কিশোরের মাথা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য।

'খবরদার! একদম নড়বে না!' বাতাস চিরে দিল তীক্ষ্ণ আদেশ। 'পাথর ফেলো!'

দ্বিধা করছে দৈত্যটা। কিশোরের গায়ের ওপর থেকে সরছে না।

'কিছু করেই দেখো খালি!' এগিয়ে আসছে কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'ঘিলু বের করে দেব। নামাও ওটা, নামিয়ে রাখো! এবং খুব আস্তে আস্তে নামাবে!'

আর আদেশ অমান্য করার সাহস পেলো না লোকটা। কিশোরের মাথার কয়েক ইঞ্চি দূরে নামিয়ে রাখল পাথরটা। ওর ডান কানের পিছনে পিস্তলের নল ঠেসে ধরেছে মুসা। মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল ডেনের পিস্তলটা।

'মাথার পিছনে হাত এনে আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে ঘাড় চেপে ধরো,' আবার আদেশ দিল মুসা। 'আস্তে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডেন, 'এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে, বদমাশ...'

'তোমাকেও,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধেও অনেক

আছে। দুটো কিডন্যাপিং, তিনবার খুনের চেষ্টা…'

'আমার মত ছিল না তাতে…।' বলতে গিয়ে থেমে গেল ডেন।

উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। কাপড়ের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কার মত ছিল? বলো, শুনতে খারাপ লাগবে না আমাদের।'

'তা তো লাগবে না,' রাগে চাপা গরগর করে উঠল ডেন। 'কিন্তু মনে কোরো না খেলাটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে।'

'করছি না,' স্বীকার করল কিশোর। 'কারণ বাকি খেলোয়াড়েরা এখনও এসে পৌঁছায়নি।' বারান্দায় উঠল সে। পুরানো মরচে ধরা একটা ঘণ্টা ঝুলছে। তবে বাজে খুব জোরে, সঙ্কেত দেয়ার জন্য যথেষ্ট। শিকল ধরে তিনবার টান দিল সে।

বিড়বিড় করল, 'দেখা যাক, কেউ আসে কিনা।'

ঢং! ঢং! ঢং! রাতের স্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে ভারি শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

'ভিতরে গিয়ে দেখা দরকার।' বলে ডেনের দিকে পিস্তল নাচিয়ে ইশারা করল মুসা।

দরজার পাশে ঘরের ভিতরের দিকের আলোটা জ্বেলে দিল কিশোর। বাংকে শুয়ে আছে এক তরুণ, চোখ আধবোজা, নেশাগ্রস্তদের মত। পল। বাংকের পাশে গিয়ে ওর নাড়ি পরীক্ষা করল সে। 'কী করেছ ওকে?'

'কিছু না,' জবাব দিল ডেন, চোখের অস্বস্তি ঢাকা দিতে পারল না। 'শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।…এই ছেলে,' মুসার দিকে ফিরে বলল, 'পিস্তলটা সরাও না বাপু। হেয়ার ট্রিগার। গুলি বেরিয়ে যাবে তো।'

দুটো গাড়ির শব্দ শুনে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। 'সাহায্য এসে গেছে আমাদের,' মুসাকে জানাল সে।

পুবের চারণভূমি ধরে নাচতে নাচতে দ্রুত এগিয়ে আসছে দুই জোড়া পার্কিং লাইট। হলুদ পিকআপটাকে চাঁদের আলোতেও চিনতে পারল কিশোর। ওটার আগে আগে আসছে পুলিশের একটা স্কোয়াড কার। বারান্দায় বেরিয়ে হাত নাড়ল সে।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল জুলি, 'মুসা কোথায়?'

'আছে, ভালই আছে,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'ভিতরে ডেন মারটিনকে পাহারা দিচ্ছে। পল আছে ওখানে।'

গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে আসতে লাগলেন মিসেস কারসন। তার পিছনে থেকে শেরিফ জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনাটা কী?'

'কিডন্যাপিং এবং আরও অনেক কিছু,' কিশোর বলল।

বারান্দায় উঠে তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল শেরিফ। পিস্তলের মুখে তখনও ডেনকে আটকে রেখেছে মুসা। তাড়াহুড়ো করল না শেরিফ, এক এক করে ডেনের দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। তার আগে অবশ্যই হাত দুটো নিয়ে এসেছে পিঠের ওপর।

'জ্যাক কোথায়?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলেন মিসেস কারসন।

'দেখিনি,' কিশোর জানাল। 'পথে আপনারা কিছু দেখেছেন?'

'না,' আতঙ্ক ফুটল মিসেস কারসনের কণ্ঠে। 'কিশোর, জ্যাককে···'

'ডেন!' ধাক্কা দিয়ে ওকে বাইরে বেরোনোর নির্দেশ দিল শেরিফ। 'আশা করি ভালয় ভালয় মুখ খুলবে। কষ্ট করতে হবে না আমাকে।'

জবাব দিল না ডেন। কান পেতে কিছু শুনছে মনে হয়। কুৎসিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে।

ঝট করে ঘুরল জুলি। পশ্চিমে তাকাল। পাশে দাঁড়ানো মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের শব্দ?'

সবাই শুনতে পাচ্ছে এখন শব্দটা। ভারি মস্ত ইঞ্জিনের গর্জন। চূড়ার নীচ থেকেই আসছে মনে হয়।

'আমি বলছি,' কিশোর বলল। 'বড় ট্রাক ওটা। নিচু গীয়ারে চলছে। ঘণ্টার শব্দ শুনে আসছে।'

ধীরে ধীরে বাড়ছে শব্দ। অবশেষে দেখা গেল গাড়িটা। সাথে সাথে চিনতে পারল কিশোর। সেই ম্যাক ট্যাংকার-ট্রাকটা, আরেকটু হলেই সেদিন যেটা ওদেরকে পিষে ফেলত। আলো নিভানো। চাঁদের আলোয় চকচক করছে জানালার কাঁচ আর ধাতব গ্রিল। দুই বার জ্বলল নিভল হেডলাইট, তারপর থেমে গেল ইঞ্জিন।

'সঙ্কেত দিল,' মুসা বলল কিশোরকে। 'জবাব আশা করবে। কী জবাব দেব?'

'ঘণ্টা বাজাতে হবে বোধহয়,' ডেনের দিকে ফিরল কিশোর। 'কী?'

'আমি কিছু বলব না তোমাদের,' শয়তানি হাসি হেসে বলল ডেন। 'এইবার দেখা যাবে কীভাবে উদ্ধার পাও।'

সতেরো

হাতে হাতকড়া লাগানো অবস্থায়ও এমন ভাব করছে লোকটা, যেন দাবার সমস্ত চাল তার হাতে। 'দেখুন, শেরিফ,' মসৃণ কণ্ঠে বলল সে, 'কেউ গুলি খাক এটা নিশ্চয় চান না? একটা কাজ করা যেতে পারে। জ্যাককে ফেরত পাবেন আপনারা, বিনিময়ে আমাকে এবং আমার বন্ধুকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'না,' কঠিন গলায় বলল মুসা।

'এখন কেউ গুলি খেলে তোমাকে দায়ী করা হবে,' কিশোর বলল ডেনকে।

আবার গর্জে উঠল ট্রাকের ইঞ্জিন। এগিয়ে আসতে শুরু করল। সঙ্গে আনা ছয় ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে ট্রাকের দিকে ধরে রাখল শেরিফ।

'ডেন?' ট্রাক থেকে শোনা গেল রাগত কণ্ঠ। 'হচ্ছেটা কী?' হঠাৎ করেই ট্রাকের বিশাল উজ্জ্বল সার্চলাইটের মত আলো জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিল সবার।

'ও, গোলমাল যা করার তাহলে করে বসে আছো,' ডেনের উদ্দেশ্যে বলল আবার কণ্ঠটা। 'শেরিফ, ডেনকে ছাড়বেন না। আমি যাই।'

'বাহ্, মামার বাড়ির আবদার। তোমাকেও ছাড়ব না আমরা!' ধমক দিয়ে বলল শেরিফ।

খিকখিক করে হাসল লোকটা। 'ছাড়বেন। ছাড়বেন। কারণ জিম্মিটা তো আমার কাছে।' ঝটকা দিয়ে খুলল ট্রাকের দরজা। 'জিম্মির নাম জ্যাক কারসন।' হেডলাইটের পিছনে আবছা দেখা গেল লম্বা একটা মূর্তি, সামনের দিকে করে হাত বাঁধা। পিছনে বেঁটে, গাট্টাগোট্টা আরেকজন লোক। তার হাতের লম্বামত জিনিসটা বন্দুক তাতে কোন সন্দেহ নেই। জ্যাককে নিশানা করে রেখেছে।

'জ্যাক!' ফিসফিস করে বললেন মিসেস কারসন।

বালিতে থুথু ফেলল ডেন। 'শয়তান! বেঈমান! আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচতে চায়! ব্যাটা যে পাগল আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তারপরেও মনে করেছিলাম বিশ্বাস করা যায়।'

হঠাৎ সামনের দিকে কারসনকে ঠেলে দিল বেঁটে লোকটা। হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন কারসন। পিছনে রাইফেল তুলে ধরল লোকটা। চেঁচিয়ে বলল, 'দশ সেকেন্ড সময় দিলাম! আমাকে যেতে না দিলে কারসনকে শেষ করে দেব!'

অসহায়ভাবে একে অন্যের দিকে তাকাল কিশোর আর মুসা। থমথমে নীরবতা। চারণভূমি, কোরাল আর পিছনের ঝোপঝাড় ও পাহাড়ে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে বাঁকা চাঁদের আলো।

'এক!' হাঁক দিল বেঁটে মূর্তিটা। 'দুই···তিন···'

'ধাপ্পা দিচ্ছে?' ডেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল শেরিফ।

'মনে হয় না,' ডেনের কণ্ঠে উদ্বেগ। সে বুঝতে পারছে, কারসনের যদি কিছু হয়, তাকেও জবাবদিহি করতে হবে।

'···পাঁচ···ছয়···সাত···' গুণে চলেছে লোকটা।

ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস কারসন।

'আট···'

'থামো! থামো!' চিৎকার করে বললেন মিসেস কারসন। 'আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও!'

তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরাল অসহায় শেরিফ, তাকাল আলোর ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অস্পষ্ট মূর্তি দুটোর দিকে।

'নয়···দ···' গোণা শেষ করতে পারল না লোকটা। আরেকটা শব্দ শুরু হয়েছে। বিচিত্র খটখট আওয়াজ, বাড়ছে ক্রমেই।

'হে-হে-হেইয়া! হে-হে-হেইয়া!' তালে তালে সুর করে বলল একটা পাতলা কণ্ঠ। ভৌতিক চাঁদের আলোয়, এই পরিবেশে রোম খাড়া করে দেয়া সুর। ট্রাকের ওপাশে, লসন ব্লাফের পাশে যেখানে বেড়া রয়েছে, তার কাছে উদয় দাঁড়াল

হাড্ডিসর্বস্ব ছিপছিপে একটা মূর্তি। আকাশের দিকে হাত তুলে নাচতে নাচতে মন্ত্রপাঠ চালিয়ে গেল, 'হে-হে-হেইয়া! হে-হে-হেইয়া! হে-হে-হেইয়া!'

'এই, এই, থামো! থামো বলছি!' ধমক দিয়ে বলল বেঁটে লোকটা। তবুও থামছে না দেখে শাসানির ভঙ্গিতে তার দিকে এগোল কয়েক পা। কারসন আর বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষগুলোর ওপর থেকে নজর সরে গেল।

'এসো,' ফিসফিসিয়ে বলে কিশোরের হাত ধরে টান দিল মুসা। 'কোরাল ঘুরে চলে যাই!'

আস্তে করে ছায়ায় নেমে নিঃশব্দে কোরালের দিকে এগুলো দু'জনে।

'হে-হে-হেইয়া! হে-হে-হেইয়া!' চলেছে একঘেয়ে গলায় মন্ত্রপাঠ। বেঁটে লোকটার বন্দুক দেখেও নাচ থামাল না। বরং বাড়ল আরও।

'মারকি,' কিশোর বলল। 'একেবারে সময়মত এসে হাজিরা দেয়।'

মারকির কণ্ঠ বেঁটে লোকটার স্নায়ুর জোর কমিয়ে দিচ্ছে, অস্থির করে তুলছে। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'থামো!' হুঁশিয়ারি হিসেবে ফাঁকা গুলিও করল একবার। কোরালের কোণে পৌঁছে গেছে ছেলেরা। বেঁটে লোকটা এখন কারসনের দিকে পিছন করে রয়েছে।

গুলির শব্দেও থামল না মারকি। একটা পাথরের ওপর উঠে দুলে দুলে সুর করে গাইতে লাগল, 'হে-হে-হেইয়া!' যেন ভূত নাচছে। বহুকাল আগে মরে যাওয়া নেটিভ আমেরিকানের ভূত।

'থামো!' আবার চিৎকার করে উঠল বেঁটে। বেড়ার দিকে এগোতে এগোতে রাইফেল উঁচু করে ধরল।

এইই সুযোগ। কাজে লাগালেন কারসন। মাথা নিচু করে দৌড় দিলেন কোরালের দিকে। বুঝতে পারছেন, ওখানেই রয়েছে নিরাপত্তা।

দৌড় দেয়ার সময় কিশোর-মুসাকে দেখেননি কারসন, কোরালের কাছে আসার পর দেখলেন। হাত ধরে তাঁকে আড়ালে টেনে নিল কিশোর। সে আর মুসা মিলে দ্রুত খুলে দিল তাঁর হাতের বাঁধন।

'বাঁচালে!' কব্জি ডলতে ডলতে বললেন কারসন। 'ওই লোকটা পাগল! ভেবেছিলাম, আজ আমি শেষ!' মারকির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও কী করছে?'

পাথরের ওপর থেকে নেমে নাচতে নাচতে এগিয়ে এল মারকি। হাতে কী যেন একটা রয়েছে। ওর কণ্ঠ আরও জোরাল হয়েছে। বুকের ভিতর কাঁপুনি তুলে দেয় সেই স্বর। লম্বা চুল বেণি করেছে। নড়ে উঠল হাতের জিনিসটা।

'খাইছে, সাপ!' আঁতকে উঠল মুসা। 'হাতে ওর জ্যান্ত সাপ!'

কিশোর চুপ করে রইল।

'হে-হে-হেইয়া!' বন্দুকধারী লোকটার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মারকি। নাচ থামিয়ে দিয়েছে। সামনে বাড়িয়ে দিল সাপ-ধরা হাতটা।

'সরাও, সরাও ওটা!...ওরে বাবারে! খেয়ে ফেলল...!' বলেই হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিল বেঁটে লোকটা। মাটিতে বসে পড়ল। পা চেপে ধরে চেঁচাতে

লাগল, 'মেরে ফেলেছে! আমাকে মেরে ফেলেছে! সাপে কামড়ে দিয়েছে! বাঁচাও! বাঁচাও!'

চোখের পলকে বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল দুই গোয়েন্দা। দু'দিক থেকে ধরে টেনে তুলল লোকটাকে। দ্রুতহাতে পকেট খুঁজল। আর কোন অস্ত্র নেই। শুধু গুলির খোসা পাওয়া গেল কয়েকটা।

'এগুলো দিয়ে খেলা করতেন নাকি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। মনে পড়ল পুকুর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া খোসাগুলোর কথা। আনমনে বিড়বিড় করল, 'নাকি গুলির খোসা জমানোর শখ!' পুকুরের পানিতে কে লবণ ফেলেছে, তা-ও বুঝতে পারল।

কিন্তু কিশোরের কথায় কান নেই লোকটার। চেঁচিয়ে চলেছে, 'ডাক্তার দরকার আমার! ডাক্তার! আমার পায়ে কামড় দিয়েছে···'

ওকে আবার বসিয়ে দেয়া হলো। দ্রুতহাতে নিজের জুতোর একটা ফিতে খুলে লোকটার পায়ে, ক্ষতস্থানের ঠিক ওপরে শক্ত করে বাঁধল মুসা। সান্ত্বনা দিল, 'মরবেন না আপনি।'

মুসার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে কিশোর বলল, 'এই দেখো, আবার হাওয়া!'

ফিরে তাকাল মুসা।

সমস্ত লসন ব্লাফ শূন্য। নীরব। আবার গায়েব হয়ে গেছে মারকি। সাপটাও নেই। নিশ্চয় মারকি নিয়ে গেছে।

আঠারো

'জুলি আসতে দেরি করছে,' অনুযোগ করল মুসা। ঘড়ি দেখল। কারসন র‍্যাঞ্চের সামনে পার্ক করা হলুদ পিকআপের টেইলগেটে বসে আছে সে।

নিজেদের ব্যাগ-সুটকেসের পাশে দাঁড়ানো কিশোর। 'তাড়া নেই আমাদের। প্লেনের দেরি আছে। আর বলেছে যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে, নিশ্চয় আসবে।'

একগাল হাসি নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এলেন কারসন। 'হাসপাতালে ফোন করে এলাম। পল ভাল আছে। ডাক্তার বলেছে, ওর রক্ত থেকে বিষের প্রভাব কেটে গেছে। আর দিন দু'য়েকের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে পারবে।'

'ডেন আর তার দোস্তের খবর কী? বুলি ফুটেছে?'

'ফুটেছে। আশ্চর্য! একটা রাত জেলে কাটালেই লোকের যে কী পরিবর্তন হয়ে যায়! তোমরা যখন জুলির জীপটা টেনে আনতে গিয়েছিলে, তখন শেরিফের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।'

'বেঁটে লোকটার পরিচয় পাওয়া গেছে?' মুসা জানতে চাইল।

'ওর নাম জুয়ে মারশ। সাপের কামড় খেয়ে অসুস্থ যেমন হয়েছে, ভয়ও পেয়েছে তেমনি। সব বলে দিয়েছে শেরিফকে। বেশ কিছু তেল কোম্পানিতে চাকরি করেছে সে। তেল তোলার অভিজ্ঞতা আছে। আর আর্মিতে যখন ছিল, তখন শিখেছে বোমা ফাটানো।' মাথা নাড়লেন কারসন। 'ওর দাদা এই অঞ্চলেরই মানুষ।'

নীরবে শুনছে দুই গোয়েন্দা।

কারসন বললেন, 'তেলের সার্ভে যখন করা হয়, তার আগে থেকেই এই অঞ্চলে ছিল মারশ পরিবার। শোনা যায়, ওদেরকে ঠকিয়ে জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আর ওই জায়গার নীচেই নাকি রয়েছে তেল।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন কারসন। 'একরাতে বারে বসে গল্প বলছিল জুয়ে। সেটা শুনে ফেলেছিল ডেন। শুনেই বুঝল, জুয়ের গল্প সত্যি হলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। আলাপ-আলোচনা করে পার্টনার হয়ে গেল দু'জনে।'

'লোকটার মাথায় গোলমাল আছে, তাই না?' মুসা বলল। 'পাগলকে বিশ্বাস করেছিল ডেন।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল কিশোর। 'কাল রাতে যে কাণ্ডটা করল, পাগল ছাড়া আর কি?'

'ডেনও সব বলে দিয়েছে,' কারসন আগের কথার খেই ধরলেন। 'জুয়ের সঙ্গে হাত মেলানোর পর ফেডারেল ল্যান্ডের মিনারেল লীজগুলো গিয়ে কিনে ফেলল সে। ওখানেই যদি ক্ষান্ত থাকত, তাহলে হয়ত বিপদে পড়ত না। কিন্তু ওরা আমাকেও তাড়ানোর ফন্দি করল। যাতে আমি বুঝতে না পারি ওরা কী করছে।'

'কারণ,' কারসনের কথার পিঠে বলল কিশোর, 'ওরা জানত, বেশিরভাগ তেলই রয়েছে আপনার এলাকায়। পরীক্ষা করে বুঝেছিল এটা।'

'আর সেটা করার সময়ই,' মুসা বলল, 'নিশ্চয় ওখানে গিয়েছিল পল। দেখে ফেলেছিল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'তাকে আটকে ফেলেছিল সেকারণেই। তার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিল বালির পাহাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে, যাতে আমরা মনে করি দুর্ঘটনায় মারা গেছে পল।'

'প্রথম দিন আমি যখন আলট্রালাইট নিয়ে উড়ি, ওরা নিশ্চয় ভয় পেয়েছিল, ভেবেছিল ওদের গর্তগুলো দেখে ফেলব আমি। আমাকে ঠেকানোর জন্য গুলি করে বিমানের তার কেটে দিয়েছিল ডেন। রাইফেলটা ওরটেগার। নিশ্চয় ওর ওপর সন্দেহ ফেলার জন্যই একাজ করেছে ডেন।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন কারসন। 'তারপর ওরা কিছুদিন চুপ করে থাকলে পারত। পলকে আমরা খোঁজাখুঁজি বাদ দিলে আবার কাজ শুরু করতে পারত। কিন্তু সময় খুব কম ছিল ওদের হাতে। একটা তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি করে ফেলেছিল মারশ। তেল চুরি আরাম্ভ করতে আসত ওরা শীঘ্রি।'

'পলকে খোঁজা যখন বাদ দেয়া হলো,' মুসা বলল, 'শেষ আরেকবার পরীক্ষা

চালাতে গেল ওরা। তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'আমরা বোমা ফাটানোর আওয়াজকে বজ্রপাতের আওয়াজ ভাবলাম। তখনও কিছুই জানি না। কিন্তু মারশ ভাবল, আমরা ওদের সর্বনাশ করব, কাজেই আগেভাগেই আমাদের শেষ করে দেয়া দরকার। এই কথাটা মাথা থেকে কিছুতেই সরাতে পারছিল না সে।'

'স্টোভে আর গাড়িতে সে-ই বোমা পেতে রেখে গেছে,' কেঁপে উঠল মুসার গলা। 'সেদিন আরেকটু হলেই···!' বাক্যটা শেষ না করে ইশারায় বুঝিয়ে দিল যা বলার।

'তারপর মারকির বাড়ি যাবার পথে ট্রাক দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেয়েছিল,' বলল কিশোর। 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। মারকি আগে থেকেই এত কথা জানল কী করে?'

'যেখানে সেখানে হাজির হয়ে চট করে উধাও হয়ে যাওয়ার কায়দা ভাল জানে,' কারসন বললেন। 'হয়তো লুকিয়ে থেকে শুনে ফেলেছিল ওদের কথা। ওর ভয় ছিল ওকে ক্যাপরক থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আমি চলে যেতে বাধ্য হলে তা-ই করা হতো। তবে এখন আর সে-ভয় নেই ওর। আমি যতদিন আছি, ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না। বেড়া দিয়ে আলাদা করে দেব ওদের পবিত্রভূমি। যা খুশি করুক ওরা ওখানে।'

কারসনের দিকে শ্রদ্ধা মেশানো দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর। 'তেলের ব্যাপারটা কী হবে আংকেল? কী করবেন?'

গাল চুলকালেন কারসন। 'এখনও ঠিক করিনি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওই তেল রয়েছে ওখানে। থাকুক না আরও কিছুদিন, ক্ষতি কী? একদল তেল-শিকারি এসে আমার জায়গা তছনছ করবে, এটা আমি মোটেই সইতে পারব না। ভাবছি, ওরটেগার সাথে আলোচনা করে নতুন বেড়ার ব্যবস্থা করব, যাতে বাইরের কেউ হুট করে যখন তখন ঢুকে পড়তে না পারে।'

এই সময় জীপের হর্ন শোনা গেল। মুখ ফিরিয়ে মুসা দেখল, ধুলো ওড়াতে ওড়াতে একটা গাড়ি আসছে। 'ওই যে এসে গেছে আমাদের ম্যাগাডন,' হাসিতে ভরে গেল তার মুখ।

ওদের দুজনের গালে চুমু খেলেন অ্যান্ডি। 'আবার এসো, শিকারের মৌসুমে, আগেই দাওয়াত দিয়ে রাখলাম। রাশেদকে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ো। তোমাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ।' ছলছল করছে তাঁর চোখ।

কারসনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। জীপটা এসে থামল। ব্যাগ-সুটকেস হাতে তুলে নিয়ে সেদিকে এগোল কিশোর।

ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে চলেছে জুলি। বাতাসে উড়ছে তার লম্বা চুল। দৃষ্টি পথের ওপর নিবদ্ধ। বলল, 'দেরি করে ফেললাম?'

'কেন, ডাইনোসরটা গোলমাল করছিল?' মুসার প্রশ্ন।

'ডাইনোসর?' বুঝতে পারল না জুলি। অবাক চোখে মুসার দিকে তাকাল।

হাসল মুসা। 'ম্যাগাডন। শুনে ডাইনোসর মনে হয় না?'

হেসে ফেলল জুলি। 'ঠিক বলেছ তো!'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে মুসা বলল, 'আচ্ছা, মারকির সাথে একবার দেখা করে গেলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়,' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'সময় আছে এখনও।'

গরগর করতে করতে মারকির উঠনে ঢুকল ম্যাগাডন। কুঁড়ের দরজার কাছে রোদে বসে ঝিমাচ্ছিল বুড়ো, চোখের ওপর হ্যাট টেনে দেয়া। ইঞ্জিনের শব্দে মুখ তুলল। হ্যাটটা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে আস্তে করে উঠে দাঁড়াল।

'ওকে বলো,' জুলিকে বলল মুসা। 'কারসন আংকেল যা যা বলেছেন, সব বলো ওকে। জানাও, পবিত্রভূমি ছেড়ে যেতে হবে না ওকে।'

সব শোনার পরও মুখ আগের মতই ভাবলেশহীন রইল মারকির, তবে চোখ উজ্জ্বল হলো। দ্রুত কিছু বলল বিচিত্র ভাষায়। ইংরেজি জানে, তবু মাতৃভাষায় কথা বলতেই পছন্দ করে। অনুবাদ করে শোনাল জুলি, 'ও বলেছে, সিনর কারসনকে অনেক ধন্যবাদ।'

'আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাও ওকে,' মুসা বলল।

'আর বলো,' কিশোর বলল, 'ওর সাহায্য পাওয়াতেই বেঁচে আছি আমরা এখনও। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।'

দুই গোয়েন্দার কথা শুনে চিলতে হাসি ফুটল বুড়োর মুখে।

ইংরেজিতে সরাসরি জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আচ্ছা, প্রথম রাতে আমাদেরকে সব বলেননি কেন? অনেক ঝামেলা বাঁচত আমাদের।'

জুলির দিকে ফিরে মাতৃভাষায় জবাব দিল বুড়ো। অনুবাদ করে শোনাল জুলি, 'সেদিন ওর জানা ছিল না তোমরা কে, কী করতে এসেছ। ভেবেছিল খারাপ লোকের সঙ্গী তোমরা।'

'অন্য ব্যাপারগুলো কী করে জানল?' জুলিকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এই যেমন, টেলিফোনে যে কথা হচ্ছে, এটা?'

জবাবটা আর পাওয়া হলো না মুসার। আবার উধাও হয়ে গেছে মারকি।

***

রবিনের ডায়েরি

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

এক

আমার চাচাতো ভাই বব হঠাৎ করেই উদ্ভট আচরণ শুরু করে দিল। ব্যাপারটা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে ঠিক বলতে পারব না, তবে আলফ্রেড চাচারা পার্কভিলে আসার আগের রাত থেকে বলেই মনে হয়।

বাতাসের দোলায় বারে বারে কেঁপে-কেঁপে উঠছে ছায়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত শব্দ করছে গাছের পাতা।

নিচু কণ্ঠে কথা বলছেন আলফ্রেড চাচা আর শেলী চাচী।

'পার্কার বব আর রবিনকে উপহার আর শুভেচ্ছা কার্ড পাঠিয়েছে,' চাচা বললেন চাচীর উদ্দেশে। 'উপহার দুটো নিশ্চয়ই ওদের পছন্দ হবে।'

পার্কার চাচা! আলফ্রেড চাচার বড় ভাই। ইম্পোর্টের ব্যবসা করেন। সারা দুনিয়া চষে বেড়ান। আজব-আজব জায়গায় যান, উদ্ভট সব জিনিস কেনার বাতিক।

বাবার কাছে শুনেছি পার্কার চাচার কাছে নাকি মানুষের একটা ছোট করে ফেলা আস্ত খুলি আছে। প্রায়ই তিনি বাবার কাছে আমার জন্য এটা-সেটা পাঠান। গতবার পেয়েছিলাম একটা হাঙরের চোয়াল। এবার আমি আলফ্রেড চাচার বাসায় বেড়াতে এসেছি বলে উপহারটা এখানেই পাঠিয়েছেন।

ববও নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। কেননা সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামতে গিয়ে ওর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল আমার। চাচা যখন কিচেনের সুইং ডোর ঠেলে ঢুকলেন, আমরা অপেক্ষা করছি তাঁর জন্য।

'তোরা এখানেই আছিস দেখছি,' বললেন হাসি মুখে।

আমার বাহুর সমান মোটা, আর পায়ের মত লম্বা এক টিউব টেনে বের করলেন চাচা। জিনিসটা তুলে দিলেন আমার হাতে। ভারী ঠেকল বেশ।

'তোদের পার্কার আঙ্কল পাঠিয়েছে,' বললেন।

কার্ডে লেখা: 'বড়দিন, জন্মদিন, হ্যালোউইন এবং আরও যেসব অনুষ্ঠান আমি মিস করি তার জন্যে। ভালবাসা নিস, ইউপি,' ইউপি মানে, আঙ্কল পার্কার।

প্যাক খোলার পর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো—জলজ্যান্ত এক সামুরাই তরোয়াল!

'সাবধানে নাড়াচাড়া করিস কিন্তু, রবিন,' সতর্ক করলেন চাচী। 'জিনিসটা খেলনা নয়।'

'ও নিয়ে ভেবো না, চাচী,' দু'হাতে চেপে ধরলাম তরোয়ালটার বাঁট। তারপর খাপ থেকে টেনে বের করলাম। দুর্দান্ত একটা জিনিস!

'দেখিস, হাত-টাত কাটিস না,' আবারও সাবধান করলেন চাচী।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন চাচা।

'সাজিয়ে রেখে দিবি। এটা খেলার জিনিস নয়।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলাম।

বব এতক্ষণ টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ভাবখানা এমন যেন, পার্কার চাচা কী পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহই নেই। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করার বান্দা ও নয়।

আলফ্রেড চাচা ব্যাগটা নামিয়ে রেখে চেন খুললেন। ছোট্ট এক চারকোনা বাক্স উঠে এল তাঁর হাতে।

'এটা তোর জন্যে, বব।'

চাচার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে বাক্সটা নিল বব। এখনও ঠাণ্ডু মিয়ার অভিনয় করে চলেছে–উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। জিনিসটাকে ঝাঁকি দিয়ে কাগজটা অল্প একটু ছিঁড়ল। তারপর ঝটপট আবার ভাঁজ করে ফেলল। কী ওটা একঝলক দেখারও সুযোগ পেলাম না।

একটু পরে হনহন করে কিচেন ত্যাগ করল ও। তরতর করে উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি ভেঙে।

'থ্যাংক ইউ আমাকে না, পার্কার আঙ্কলকে দে,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন চাচা।

'ও কী পেয়েছে জানো নাকি, চাচা?' প্রশ্ন করলাম।

'না রে। পার্কার আমাকে কিচ্ছু বলেনি। এটা নাকি বব আর ওর ব্যাপার।'

চাচা-চাচীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এক দৌড়ে উপরে উঠে এলাম।

'রবিন, তলোয়ার হাতে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করিস না!' হেঁকে বললেন চাচী।

গতি কমিয়ে ববের ঘরের সামনে থেমে দাঁড়ালাম।

'বব?'

'ভাগো এখান থেকে! ঘুমাতে যাও,' গর্জাল ও।

'স্বার্থপর!' বিড়বিড় করে আওড়ালাম।

ধীর পায়ে আমার রুমে চলে এলাম। দরজা লাগিয়ে, বাতি নিভিয়ে দিলাম। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম চাচা-চাচী উঠে আসেন কিনা। যখন নিশ্চিত হলাম আসবেন না, খাপ থেকে একটানে তরোয়ালটা বের করে মেলে ধরলাম চাঁদের আলোয়।

হঠাৎই অদ্ভুত এক ব্যাপার লক্ষ করলাম, তরোয়ালের ফলা আর হাতলে খোদাই করা রয়েছে খুদে খুদে অদ্ভুত কিছু বানরের কঙ্কাল। ওরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে। এক বানর আরেক বানরের মাথা কাটছে। অপর এক বানর প্রতিপক্ষের বাহু নামিয়ে দিচ্ছে। দুটো বানরকে দেখা যাচ্ছে পরস্পরের গলা টিপে ধরেছে। সব মিলিয়ে বিদঘুটে ঠেকল ছবিটা আমার কাছে।

খাপে পুরে তরোয়ালটা রেখে দিলাম বিছানার এক কিনারে।

এবার সটান শুয়ে পড়ে মাথার নীচে দু'হাত রাখলাম। দেয়ালে চাঁদের আলোর ছায়া পড়েছে।

আচ্ছা, হঠাৎই চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়–পার্কার চাচা ববকে শুকনো মাথাটা দিয়ে দেননি তো? অসম্ভব না, কেননা পার্কার চাচার মতিগতি বোঝা দায়। হয়তো সেজন্যেই বব উপহারটা কাউকে দেখাতে চায়নি। চাচা-চাচী কি ব্যাপারটা পছন্দ করবেন? মনে হয় না। চাচী তো রীতিমত চেঁচামেচি জুড়ে দেবেন, আর চাচা বলবেন ওটা দিয়ে দিতে···মানে পার্কার চাচাকে আরকী।

বব কিন্তু আমাকে জিনিসটা দেখাতে পারত। ওর ভাব-সাব ইদানীং কেমন জানি অদ্ভুত ঠেকছে আমার কাছে।

ঘরের চারধারে নজর বুলিয়ে নিলাম। আচমকা চোখ চলে গেল পায়ের পাতায়। আরে, আমার পায়ের পাতা অমন হাতের মত দেখাচ্ছে কেন?

বুড়ো আঙুল আর তার পাশে চারটে আঙুল।

কেন কে জানে, ঝট করে উঠে বসলাম বিছানায়। তরোয়ালটা খাপ থেকে বের করে বানরের ছবিগুলো দেখছি। আজব তো!

হঠাৎই চিন্তাটা ঘাই মারল মাথার মধ্যে। আমার পায়ের পাতা দুটোকে মানুষের হাতের মত লাগছে না তো। দেখাচ্ছে ঠিক বানরের থাবার মত।

তরোয়ালটা রেখে দিয়ে ফের শুয়ে পড়লাম। যতবারই দৃষ্টি যাচ্ছে পায়ের পাতায়, বানরের থাবা বলে মনে হচ্ছে। শেষমেশ, ভয় পেয়ে একটা বালিশ চাপিয়ে দিলাম পায়ের উপর। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম নিজের অজান্তেই।

সে রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম কোথায় যেন কুকুর ডাকছে। এখানে আসার পর আশপাশে কুকুর ডাকতে শুনিনি। পরক্ষণে মনে হলো বাতাসে কীসের জানি গন্ধ ভেসে রয়েছে।

'পোড়া চুল,' আওড়ালাম মনে মনে।

খুব দ্রুতই অবশ্য মিলিয়ে গেল গন্ধটা। আরে, এই গুনগুন শব্দটা আসছে কোথা থেকে? এ তো যেন থামবেই না মনে হচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, কিন্তু পরদিন সকালে ববকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

দুই

পরদিন সকালে ওপরতলার হলঘরে গিয়ে দেখি খাঁ-খাঁ করছে। কার্পেট, ছবি, টেবিল কোন কিছুর বালাই নেই। একটা বাতি শুধু দেয়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে, কেঁদে-কেঁদে লাল হয়ে যাওয়া নাকের মতন। খুব ভোরেই তারমানে মালপত্র সরানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

এক দৌড়ে নেমে এলাম সিঁড়ি ভেঙে। লিভিং রুম আর ডাইনিং রুমের সমস্ত জিনিসপত্র ইতোমধ্যে ট্রাকে উঠে গেছে।

আলফ্রেড চাচা সফটওয়্যার কনসালট্যান্ট। এজন্যে প্রায়ই তাঁদেরকে বাড়ি বদলাতে হয়। বড়জোর একবছর, তার বেশি কোথাও থাকতে পারেন না। ব্যাপারটা গা সওয়া হয়ে গেছে ওঁদের কাছে।

'বব উঠেছে?' চাচী প্রশ্ন করলেন।

'মনে হয়। ঘরে তো দেখলাম না।'

'অদ্ভুত ব্যাপার। সকাল থেকে ওর দেখা নেই। গেল কোথায়?'

'ও তো গা ঢাকা দেয়ার ছেলে নয়,' যোগ করলেন চাচা। উদ্বেগের মেঘ ঘনাল তাঁর মুখের চেহারায়।

'আমি দেখি ওকে খুঁজে আনি,' প্রস্তাব করলাম। হঠাৎই অনুভব করলাম, আমার জানা দরকার ও কোথায়। কেন দরকার তা অবশ্য নিজেরও জানা নেই।

'নাস্তা খেয়ে যা,' বললেন চাচী।

আপত্তি করার কোন কারণ দেখলাম না।

একটু পরে, বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে।

মলের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। ধারণা করলাম, বব হয়তো ফাস্ট ফুড খেতে ওখানে গেছে। ওকে পেলাম না। রেকর্ড স্টোরেও টু মারলাম—নেই।

অবশেষে, এত জায়গা থাকতে খুঁজে পেলাম কিনা এক সফটওয়্যার স্টোরে। হেঁটে গিয়ে নীরবে চেয়ে রইলাম।

অবাক কাণ্ড। কর্মচারী লোকটা ববের মুখ আঁকছে স্ক্রীনে। কিবোর্ড ব্যবহার করে ববের আদল তৈরি করছে।

লোকটা প্রথমে টেনে লম্বা করল ববের কান দুটো, এবার পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে দিল, শেষে মাথার দু'পাশে জুড়ে দিল।

এবার চোয়াল টেনে নামিয়ে দিল নীচের দিকে। ববকে এখন দেখাচ্ছে অনেকটা গরিলার মত। ববের কপালের উপরদিকটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ভিতরদিকে। আশ্চর্য, অপার্থিব এক জন্তুর চেহারা পেল ও। গা কেঁপে উঠল আমার। জানোয়ারটাকে ববের চাইতেও বেশি রকমের বব বলে মনে হচ্ছে।

শেষমেশ পিঠে খোঁচা দিলাম ওকে।

'চাচা-চাচী তোমাকে খুঁজছে,' বললাম।

'আরে, বাঁটকু হাজির!' বলল ও। তারপর সটান উঠে দাঁড়িয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এল স্টোর ছেড়ে। বাড়ি ফেরার পথে আমার সাথে একটি কথাও বলল না। শুধু পকেট থেকে দুটো কলা বের করে, একটার খোসা ছিলে খেতে লাগল। একটা কলা বাড়িয়ে দিল আমার উদ্দেশে।

বাড়ি পৌঁছে দেখি, চাচা-চাচী গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন। আমরা ঝটপট উঠে বসতেই চাচা স্টার্ট দিলেন। ছ'ঘণ্টা পর পার্কভিলে, নতুন বাসার সামনে এসে ব্রেক কষলেন চাচা।

ধূসর রঙের তিন তলা বাড়ি। পুরানো। জানালায় সবুজ শাটার আর ছাদটা স্লেট-পাথরের। সামনের দিকে বিরাট এক বারান্দা। সিঁড়িতে পা রাখলে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হয়। হরর ছবিতে এরকমের ভুতুড়ে বাড়ি প্রায়ই দেখা যায়।

সামনের উঠনে বিশাল এক ওক গাছ আর শতাব্দী প্রাচীন এক বীচ। গুঁড়িটা থেকে দানবের হাড় আর বাঁকা বাহুর মত শিকড় গজিয়েছে।

বাড়ির ভেতরে এখনও ফাঁকা। ভূতে বিশ্বাস নেই আমার, তবুও গা-টা কেমন জানি ছমছম করে উঠল।

মনে হচ্ছে এটা যেন অন্য কারও বাড়ি। আমরা এখানে অনাহূত। খানিক পরে, মালপত্র নিয়ে ট্রাক চলে এলে মনে সাহস পেলাম।

একটু পরে, মাল-সামান খোলা আর বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লেগে পড়লাম সবাই। চাচী ট্রাফিক পুলিসের মত দাঁড়িয়ে দিক্ নির্দেশ করছেন। ব্যস্ত হতে পেরে মনটা হালকা হয়ে গেল। ববের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেলাম না। ও এখানে আসার পথে একটি কথাও বলেনি। মাঝে-মাঝে শুধু 'খোঁত' জাতীয় শব্দ করেছে, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থেকেছে, আর ঘুমিয়েছে। চাচা-চাচীর কাছে অবশ্য ওর আচরণ অস্বাভাবিক ঠেকেনি।

কে জানে, আমিই হয়তো বেশি-বেশি ভাবছি।

সারাদিনের ধকলে এতটাই ক্লান্ত ছিলাম, বালির বস্তার মত ধপ করে বিছানায় পড়লাম। চোখজোড়া যখন লেগে এসেছে, মনে হলো ববের ঘর থেকে অদ্ভুত কিছু শব্দ ভেসে এল। উঠে গিয়ে যে দেখব সে সাধ্য হলো না, তলিয়ে গেলাম ঘুমের অতলে।

তিন

পরদিন সকালে আবার কাজে লেগে পড়তে হলো। গাঁটরি-বোঁচকা খুলছি, জায়গা মত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সাজাচ্ছি। দুপুর নাগাদ ফ্রী হতে পারলাম। দেরি না করে চাচার চটের দোলনায় গিয়ে চড়লাম। আরামসে দোল খাচ্ছি, বব কোথায় জানি না। আলফ্রেড চাচা হাতের কাজ সেরেই এই দোলনাটা টাঙাবার ব্যবস্থা করেছেন।

শুয়ে শুয়ে সামনে পিছে দুলছি, হঠাৎই একটা রুপোলী ফ্লাইং সসার আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটু দূরে পড়ল।

'হাই,' বলে উঠল কে যেন।

ঘাড় কাত করে চাইলাম।

'আমি লিযি। তোমাদের প্রতিবেশী,' সোনালী চুলের এক কিশোরী বলল।

'ফ্রিসবিটা আমার।'

'আমি রবিন,' বললাম।

'তোমরা পাগল বিজ্ঞানীর বাসায় থাকছ, তাই না?' ফ্রিসবিটা লুফতে লুফতে বলল মেয়েটি।

'কী বললে?'

'পাগল বিজ্ঞানী, বুড়ো হিচককের কথা বলছি। আমি ঠিক পাশের বাড়িটাতেই থাকি। সব সময়ই দেখতাম বুড়োকে। আজব কিসিমের লোক।'

'কীরকম?' কৌতূহলী হয়ে উঠছি আমি।

'দিনের বেলায় বাসায় জন্তু-জানোয়ার নিয়ে আসত, কিন্তু রাত নামার আগে বের করত না।'

'তাতে কী,' বললাম, খানিকটা হতাশই হয়েছি।

'ঘটনাই তো সেখানে,' রহস্য করে বলল মেয়েটি। 'কেন শুধু রাতের বেলাতেই বের করবে?'

জবাব দিলাম না। মেয়েটির চোখে অদ্ভুত এক চাউনি। অচেনা কারও সঙ্গে আমি ঝট করে মিশে যেতে পারি না। এই মেয়েটা কেমন না কেমন কে জানে।

'বুড়ো ওগুলোকে বদলে দিত,' ফিসফিস করে বলল। 'জন্তুগুলোকে বেসমেন্টে নিয়ে গিয়ে বিকৃত করে ছাড়ত।'

মেয়েটি তামাশা করছে না তো?

আমার চেহারা দেখে কী বুঝল কে জানে, বকে চলল মেয়েটি।

'আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই,' বলল। 'তবে আমি কিন্তু ওই বিকৃত জানোয়ারগুলোকে দেখেছি। দুই মাথাওয়ালা একটা কুকুর আর তিন লেজওয়ালা বিড়াল আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

এক মুহূর্ত নিথর দাঁড়িয়ে রইল ও, মুখ হাঁ, কাঁধ ঝুঁকে রয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সেরা খবরটা ছাড়তে চলেছে।

'আর একটা ভেড়া ছিল যেটা হাম্বা-হাম্বা ডাক ছাড়ত

'সস্তা কারসাজি,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলাম কথাটাকে।

'কে জানে,' বলল মেয়েটি, 'কারসাজি হতেও পারে। কিন্তু এর মধ্যে সস্তার কোন ব্যাপার ছিল না, একেবারে জলজ্যান্ত সত্য।'

'কীভাবে বানাত?'

'জানি না, তবে বানাত তোমাদের বাসায়, নিজের ল্যাবে।'

'আমাদের বাসায় কোন ল্যাবোরেটরি নেই,' জোর গলায় বললাম। গোটা বাড়ি চষে বেড়িয়েছি আমি। কোথাও কোন ল্যাবের চিহ্নমাত্র দেখিনি

'আছে,' বলল মেয়েটি। 'যেদিন চলে গেল সেদিন সব যন্ত্রপাতি বের করা হয়েছিল।'

কই, আলফ্রেড চাচা তো বলেননি, এ বাড়িতে ল্যাবোরেটরি ছিল!

'সময়মত খুঁজে দেখো পেয়ে যাবে, আমি শিয়োর ছয় ঠ্যাঙওয়ালা ব্যাঙের

দেখা পাবে তুমি, তখন হয়তো বিশ্বাস হবে আমার কথা।'

'ব্যাঙটা যদি কামড়ায় তবেই,' বললাম।

মেয়েটা হেসে উঠে, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল।

এক গড়ান দিয়ে দোলনা থেকে নেমে এলাম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালাম। তারপর বেসমেন্ট থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম।

কীসের কী? ল্যাবের ল-ও নেই।

তারপরও অবশ্য অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল।

কিচেনে গিয়ে চকোলেট মিল্ক পান করছি, এসময় বব এসে ঢুকল। হাতে সদাইয়ের ব্যাগ।

'এই যে, বাঁটকু, কলা খাবে?' ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল বব। ব্যাগের ভিতর দুই কাঁদি কলা। তখন এর মধ্যে কোন ধরনের অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি আমার চোখে, ববের আচরণ দিব্যি আগের মতই লাগছিল।

'শিয়োর,' খোশমেজাজে বললাম।

এক কাঁদি কলা আমার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

'খেতে দারুণ, আমি পাঁচটা খেয়ে ফেলেছি।'

ওই কলাগুলোর মধ্যে বিশেষ কিছু একটা ছিল। ওয়ান-অন-ওয়ান খেলায় কখনোই আমার সঙ্গে পারে না ও। অথচ সেদিন আমাকে হারিয়ে দিল। ফলাফল ১১-২।

ওকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছেলে মনে হলো আমার, ঠিক যেন জানোয়ারের মত ক্ষিপ্র। ডানে যাবে ভেবেছি, গেছে বাঁয়ে। যখন ভেবেছি শট করবে, সহসা আমার পাশ কাটিয়ে বাস্কেটের উদ্দেশে লাফ দিয়েছে। ওকে ঠেকানো ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য। পাঁচ মিনিটে খেল খতম।

'দলে যোগ দেব কিনা ভাবছি,' বলল বব ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় এক ফালি ঘাস জমি, সেখানে বসতে বসতে বলল।

'সত্যি বলছ? আমি তো ভাবতাম তুমি হাই স্কুল স্পোর্টস পছন্দ করো না।'

বব মুচকি হাসল শুধু, কথা বলল না। এবার হঠাৎই স্নিকার্স আর মোজা খুলে পায়ের পাতা মেলে দিল। বাপরে, ওর পায়ের পাতা দুটো এত বড়!

'একটা খেলা দেখবে?' জিজ্ঞেস করল।

কাঁদি থেকে একটা কলা ছিঁড়ে নিল ও, তারপর খোসা ছাড়িয়ে ফেলল—পা ব্যবহার করে!

আমার চোখ ছানাবড়া। বব ওর পায়ের ব্রেন সার্জারি করালেও বোধহয় এতটা অবাক হতাম না।

'খোসা ছাড়ানর দল বানানো হলে তুমি ক্যাপ্টেন হতে পারবে,' ঠাট্টা করে বললাম।

দেঁতো হেসে বাস্কেটবলটা সোজা আমার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল ও।

শেষমুহূর্তে ঝট করে মাথা নোয়াতে পারলাম।

'এর মানেটা কী?' গর্জে উঠলাম।

কীভাবে জানি ঠোঁটজোড়া পিছনে টেনে নিল ও। দাঁত খিঁচোল আমার উদ্দেশে, নীচের চোয়ালটা বাড়িয়ে দিয়ে। কুৎসিত একটা দৃশ্য। হেসে উঠল এবার। এ হাসি আগে কখনও হাসতে শুনিনি ওকে। জঘন্য। নীচ। জানোয়ারের সঙ্গেই শুধু তুলনা করা চলে।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে ববের মধ্যে। শীঘ্রিই টের পেলাম, আমার ধারণা নির্ভুল।

চার

সে রাতে, বিছানায় যেতে না যেতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। তিন কি চার সেকেন্ড হবে, মনে হলো ঘুম ভেঙে গেল। আলোর বন্যায় ভাসছে গোটা ঘর।

বীচ গাছের মাথা ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড যে চাঁদটা ঝুলে রয়েছে পিছনের উঠনে, এ তারই আলো।

কাত হতে যাব, একটা শব্দ কানে এল। ববের কামরা থেকে আসছে।

বিছানা থেকে হড়কে নেমে পড়লাম। চাদরের তলায় বালিশ গুঁজে ডামি তৈরি করলাম–কেউ এলে মনে করবে ঘুমাচ্ছি। এবার আলগোছে দরজার পাশে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লাম।

আমার ঘরের দরজা আলতো ঠেলা দিয়ে খুলল বব, পা রাখল ভিতরে। মুহূর্তে কাঠ হয়ে গেলাম, মেঝের দিকে মাথা দিয়ে চোখ বুজে ফেললাম।

ববের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। ওর পাজামার পায়ের কাছটা আমার কব্জি ছুঁয়েছে। এখন এক চুল নড়াচড়া করলে ও ধরে ফেলবে। বাড়ির ও প্রান্তে, হলঘরে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা সময় দিয়ে যাচ্ছে–টিক-টক, টিক-টক।

অবশেষে, হলের দিকে চলে গেল বব। ওর পা পড়তে সিঁড়ির ধাপ যেই ককিয়ে উঠল, পা টিপে টিপে অনুসরণ করলাম আমি।

সিঁড়ির মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে, উঁকি দিলাম ব্যানিস্টারের উপর দিয়ে। ভারী এক ব্যাগ বয়ে, বেসমেন্টের উদ্দেশে চলেছে বব। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানান দিল, শুকনো খুলিটা রয়েছে ব্যাগের ভিতরে।

ওকে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিলাম। ঘড়ির কাঁটার শব্দ দশ পর্যন্ত গুণে, সন্তর্পণে নামতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে।

বেসমেন্টের দরজা খোলা রেখেছে বব, কিন্তু কোন আলোর রেখা চোখে পড়ল না আমার। ঠায় দাঁড়িয়ে কান পেতে রয়েছি।

কিছুই ঘটল না। অপেক্ষা করছি। চোখ বুজলাম মনোযোগ বাড়াতে। বৃথা।

নিশ্ছিদ্র নীরবতা, তারপর…ঢং! ঢং!

লাফিয়ে উঠেছি প্রায়। ঘণ্টা পড়েছে ঘড়িতে।

বব কি শুনতে পেয়েছে? কান খাড়া করলাম আবারও। নাহ, ঘড়ির কাঁটা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

আলগোছে বেসমেন্টের ধাপ ভেঙে নামছি আমি। চারদিকে কালিগোলা অন্ধকার। ধীর গতিতে হাঁটছি, দেয়ালে হাত রেখে। এখানে-ওখানে অনেকগুলো বাক্স ছড়ানো। ভয় হলো, কোনটায় পা বেধে হোঁচট না খাই।

বেসমেন্টে নেমে, অর্ধেকটা মেঝে পেরোবার পর মাথায় এল চিন্তাটা। আমার যদি এই নিরেট আঁধারে নড়তে-চড়তে কষ্ট হয়, তবে বব পারল কীভাবে? আর ওর কোন শব্দই বা পেলাম না কেন? গেল কোথায় ও?

বেসমেন্টে কোন জানালা নেই, দরজা মাত্র একটা। বব এখানেই কোথাও নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কোথায়? আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে ওঁৎ পেতে নেই তো? আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে? ও কি জানে ওকে আমি অনুসরণ করেছি? বব এই মাঝরাতে কী করছে সত্যিই কি জানতে চাই আমি? আমাকে বাগে পেলে কী করবে ও?

একটা একটা করে খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের রোম। শিরদাঁড়ায় অদ্ভুত অনুভূতি। টের পেলাম, হলঘরের সিঁড়িতে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে। চাচা কিংবা চাচী কি, শব্দের উৎস খুঁজে বের করতে নেমে আসছেন?

না। পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে!

এতেই কাজ হলো। লাইট সুইচটা হাতড়ে খুঁজে নিয়ে টিপে দিলাম।

বেসমেন্টে আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। আর আছে কিছু বাক্স। যেভাবেই হোক, আমাকে ফাঁকি দিয়েছে বব। কিংবা বেসমেন্টে হয়তো নামেইনি।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েই থমকে গেলাম। মেঝের উপর কিছু একটা পড়ে রয়েছে। পুরানো এক খবরের কাগজ। তুলে নিলাম। ১ নভেম্বর, ১৯৬৩। আগে কেন চোখে পড়েনি এটা? বেসমেন্টে তো কতবারই এসেছি-গেছি আমি।

একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছে ওটায়। বারো বছরের এক কিশোর হঠাৎ একদিন ঠিক করল, সে কুকুরের জীবন যাপন করবে। পিছনের উঠনে, কুকুরের ঘরে বাস করতে শুরু করে সে। বাবা-মা ডগ ডিশে করে খেতে দিতেন ওকে, ডগ কলার পরিয়ে শিকলে বেঁধে রাখতেন। এক পর্যায়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয় ছেলেটি। শুধু ঘেউ-ঘেউ ডাক ছাড়ত।

বেশ কটা ছবিও ছাপা হয়েছে ছেলেটির। লোকে ওকে ডগ বয় নামে ডাকত। কে জানে, হয়তো বানোয়াট গাল-গপ্পো। তবে ছবিগুলো একদম বাস্তব। বিদঘুটে। কাগজটা ভাঁজ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম।

আমার ঘরের দরজা যেই খুলতে যাব, থপ করে কাঁধের উপর কার যেন থাবা পড়ল। তালুর উল্টোপিঠ উজ্জ্বল লাল রোমে ভরা।

'বেসমেন্টের আশপাশে ঘুরঘুর কোরো না, বাঁটকু। আমাকে আবার যদি

ফলো করো, ঠ্যাং ভেঙে দেব। আমি চাই না আমার জন্যে তোমার কোন বিপদ হোক।'

বব। মুখের চেহারায় কুৎসিত অভিব্যক্তি। ধারাল দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, গাঢ় চোখে স্পষ্ট হুমকি।

গা ঝাড়া দিয়ে সরে গেলাম।

'আমি তোমাকে ফলো করিনি, বব। আমি বাথরুম খুঁজছিলাম। ভেবেছিলাম নীচে বোধহয় বাথরুম আছে।'

'ফাজলামি,' খেঁকিয়ে উঠল বব।

আমি কথা না বাড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কখন যাবে বব? দরজার ওপাশ থেকে ওর ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। অবশেষে, পায়ের শব্দ পেলাম—চলে যাচ্ছে।

আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে শুধু ববের লোমশ থাবাটার কথা। বানরের হাতের মত দেখাচ্ছিল। আর কী ভয়ঙ্কর লাগছিল ওর চোখের দৃষ্টি!

আমাকে জানতেই হবে, ববের কী হয়েছে।

পাঁচ

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডিম ভাজার সুগন্ধ পেলাম।

তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নামলাম। ঝটপট ড্রেস পরে, স্নিকার্সে পা গলিয়ে নেমে এলাম নীচে। একেকবারে চারটি করে সিঁড়ি টপকেছি।

একটা সিরিয়াল বক্স ছোঁ মেরে তুলে নিলাম, আর একটা পাত্র। ববের অস্বাভাবিক আচরণের কথাটা পাড়তে হবে, তবে কোন তাড়াহুড়ো নয়—ধীরেসুস্থে, কী বলব অনেক ভেবেচিন্তে শেষমেশ বলে বসলাম, 'ববের কী হয়েছে বলো তো?'

'তার মানে?' চাচা জবাব চাইলেন।

'কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে যেন ও। কালকে আমাকে বাস্কেটবলে হারিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই না, কিংকঙের মত গাদা-গাদা কলা সাবড়াচ্ছে…'

'তোকে ওয়ান-অন-ওয়ানে হারিয়েছে, তো এর মধ্যে অবাক হওয়ার কী আছে? ও বয়সে তোর চাইতে বড় না?' চাচা বললেন।

'শুধু খেলায় হারানোর কথা বলছি না…কলা খাওয়া আর অন্যান্য সব কিছু,' রীতিমত কথা হাতড়াচ্ছি।

চাচী মুচকি হেসে চাচার দিকে চাইলেন।

'ববের খুব খিদে পাচ্ছে মনে হয় আজকাল।'

'কিন্তু…'

'ছাড় তো, রবিন,' চাচা বাধা দিয়ে বললেন. 'উঠনে আমার সাথে হাঁটবি চল।'

আমি এখন হাটব না…'

চাচা উঠে দাঁড়িয়েছেন। বুঝলাম, আপত্তি ধোপে টিকবে না। অগত্যা তাঁকে অনুসরণ করে ব্যাকইয়ার্ডে আসতে হলো।

'চাচা, আমি কিন্তু সত্যি কথাই বলছি। ববের কিছু একটা হয়েছে। ঠিক জানি না কী, কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে।' কষে লাথি মারলাম একটা ড্যান্ডেলিয়নের মাথায়।

'কিছু না, এটা বয়সের দোষ,' বললেন চাচা। 'ওর এখন চোদ্দ বছর বয়স। ওর মধ্যে নানান পরিবর্তন আসছে!'

'তাই বলে যখন তখন না বলে লাপাত্তা হয়ে যাবে?'

'ওর সাথে খোলাখুলি কথা বল, সব জানতে পারবি,' বললেন চাচা।

'কিন্তু, চাচা…'

'কোন কিন্তু নয়, রবিন। তোর চাচী আর আমি এই উইকএন্ডে বাইরে যাচ্ছি। অনেক আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল। আমরা তোদের দু'ভাইকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে চাই না। কাজেই দু'জনকে মিলেমিশে থাকতে হবে, কোন সমস্যা যাতে না হয়, ওকে?'

কিছু একটা বলতে মুখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললাম।

'তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে,' বললেন চাচা।

'কী!'

'কিশোর আর মুসাকে আমি ফোন করে দিয়েছি। ওরা শীঘ্রি চলে আসছে।'

'বলো কী!' সোল্লাসে বলে উঠলাম আমি। ওরা চলে এলে আমার জন্য অনেক সুবিধা। ববের রহস্যময় কাণ্ড-কারখানা নিয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ করা যাবে। আমি অনুভব করছি, বব বিপদে পড়তে চলেছে। ওকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে। একটু পরে, ঘুরে দাঁড়িয়ে কিচেনের উদ্দেশে পা বাড়ালাম। টেবিলে বসে বব, গায়ে গাঢ় নীল টার্টলনেক শার্ট। এত গরমে এই শার্টটা পরেছে কেন ও? সিরিয়ালে দুধ ঢালবে বলে হাত বাড়াল ও, আর তাই দেখে আমি রীতিমত আঁতকে উঠলাম। শার্টের হাতা ছাড়িয়ে অন্তত তিন ইঞ্চি বেরিয়ে আছে ওর হাত।

'বাছা,' ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন চাচী, 'শার্টটা ছোট হয়ে গেছে, এজন্যেই প্রি-শ্রাঙ্ক কাপড় কিনতে নেই।'

ওঁদের চোখ ফাঁকি দিল কীভাবে? ববের শার্টটা ছোট হয়ে যায়নি। বরঞ্চ ওর বাহু দুটো ক্রমেই বড় আর লোমশ হয়ে উঠছে, শুধুমাত্র আমার চোখেই ধরা পড়ছে কেন ব্যাপারটা? চাচা-চাচী কি কিছুই টের পাচ্ছেন না কী ঘটে চলেছে?

আধ ঘণ্টা পর চাচা-চাচী বেরিয়ে পড়লেন। স্বীকার করতে বাধা নেই, ওঁরা চলে যাওয়াতে আমি একরকম খুশিই হলাম। আমাকে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় কাজে নামতে হবে। তবে কাজটা সহজ হবে না। কী ঘটছে সেটা যে শুধু টের পাচ্ছেন না ওঁরা তাই নয়, আমাকেও বুদ্ধু ঠাওরাচ্ছেন!

চাচা-চাচী যখন ড্রাইভওয়ে থেকে গাড়ি বের করেন, আমরা হাত নেড়ে

বিদায় জানাই। বব এক হাতে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। কিন্তু যেই গাড়িটা চোখের আড়াল হলো, পকেট থেকে একটা কলা বের করে বিনাবাক্যব্যয়ে চলে গেল গটগট করে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লিযির বাড়ির উদ্দেশে এগোলাম আমি।

'এসো, রবিন,' হাতছানি দিয়ে আমাকে কিচেনে ডাকল ও। 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

কিচেনে গিয়ে ঢুকলাম। লিযির পরনে গোলাপি সোয়েটপ্যান্ট ও টী শার্ট। তিনটে পনিটেইল করে চুল বেঁধেছে। ওকে ভাল লেগে গেছে আমার। কখন জানি বন্ধু ভেবে নিয়েছি।

নীলরঙা প্রকাণ্ড এক গোট্যানো কাগজ মেলে ধরল ও।

'আমার মা যে রিয়েল এস্টেট এজেন্সীতে কাজ করে, তারাই তোমাদেরকে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছে। আমি তাই কালকে ওদের কাছ থেকে প্ল্যানটা ধার করে এনেছি।'

'বেসমেন্ট কোন্‌টা?' প্রশ্ন করলাম।

'বেসমেন্ট?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস ল্যাবটা বেসমেন্টেই কোথাও আছে।'

'তারমানে তুমি বুড়ো হিচককের কথা বিশ্বাস করেছ?'

'উপায় কী বলো,' বললাম, 'মনে হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই ববের কিছু একটা পরিবর্তন ঘটছে। মানে আমি শিয়োর আরকী। আমাকে এখন শুধু প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।'

'কার জন্যে, পুলিস?'

'না! ওকে কোনমতেই বিপদে ফেলতে পারব না আমি। চাচা-চাচীকে বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কানে তোলেননি। আমি কিন্তু ববকে নিয়ে সত্যিই চিন্তিত।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিযি।

'এই ছোট বাক্সগুলো,' বলল অবশেষে, 'একেকটা ঘর। এটা লিভিং রুম। এটা ডাইনিং। এগুলো কিচেন আর অন্যান্য ঘর।'

বাক্সগুলো চটপট গুণে, সবগুলো ঘর কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম।

'এগুলোর মধ্যে ল্যাব কোথায়?' হতাশ কণ্ঠে বললাম।

বেসমেন্টের ব্লুপ্রিন্টের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে। মার্জিনের ধারে সংখ্যা লেখা, যাতে বোঝা যায় প্রতিটা দেয়ালের দৈর্ঘ্য কত। তা ছাড়াও বয়লার ইত্যাদির অবস্থান বোঝাতে খুদে ছবি আঁকা।

এসময় হঠাৎই জিনিসটা নজরে এল আমার।

'এটা কী?' লাইনের ভাঙা এক অংশে আঙুল রেখে বলে উঠলাম। এখানে দেয়াল থাকার কথা।

'জানি না।'

আইডিয়াটা তখনই মাথায় এল।

ছয়

ব্যাপারটা খুবই সরল। ল্যাবটা অবশ্যই বাড়ির মধ্যে কোথাও রয়েছে। যেহেতু আমাদের হাতে গোটা বাড়ির প্ল্যান, এবং প্ল্যানে সব কটা ঘরের মাপ রয়েছে–এখন শুধু ব্লুপ্রিন্টে উল্লেখ করা স্পেস যোগ করতে হবে। বাড়িটায় যদি প্ল্যানে উল্লেখ করা বর্গফুটের চাইতে কম থেকে থাকে, তারমানে কোথাও না কোথাও গোপন ঘরটা রয়েছে। আমাদেরকে প্রতিটা ঘর মেপে, মিলিয়ে দেখতে হবে প্ল্যানের সঙ্গে।

লিভিংরুম দিয়ে আরম্ভ করলাম আমরা।

ঘরের এক মাথায় দাঁড়াল লিযি। দেয়ালে ধরে রেখেছে মেজারিং টেপ। আমি ওপ্রান্তে চলে যাচ্ছি টেপটাকে সঙ্গে নিয়ে। বিশাল কামরা এটা। দশ ফিট বাই বিশ ফিট, প্ল্যান অনুযায়ী।

'দশ ফিট একজ্যাক্টলি,' আমার গোণা শেষ হলে হতাশকণ্ঠে বলল লিযি।

উল্টোদিক থেকে গুণলাম, পুরোপুরি বিশ ফিট।

মনটা দমে গেল। ভাল আইডিয়া থেকে মানুষ ভাল ফল আশা করে। না পেলে কষ্ট পায়।

এবার ডাইনিং রুমে গেলাম। কোন গোলমাল পাওয়া গেল না।

'বাদ দাও,' টেপ গুটিয়ে বললাম। 'বোকার মত ভেবেছিলাম আমি।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল লিযি। 'চলো, বেসমেন্টটা মেপে দেখি। ডাইনিংরুমে গোপন ল্যাবের কথা কে কবে শুনেছে?'

যুক্তিটা অকাট্য।

সিঁড়ি ভেঙে অন্ধকারাচ্ছন্ন বেসমেন্টে নেমে এলাম দু'জনই। মাপ-জোক শুরু করলাম।

প্রথমে মাপলাম প্রস্থ। দেয়ালে টেপ ধরে থাকল লিযি। ধীরপায়ে ঘরটা পার হলাম আমি।

'পঁচিশ ফিট,' বললাম।

'মিলেছে,' বলল লিযি। 'প্ল্যান বলছে, বেসমেন্টটা পঁচিশ বাই চল্লিশ।'

এরপর দৈর্ঘ্য মাপার পালা। মাপা শেষে কপালে উঠে গেল চোখ। ত্রিশ ফিট!

'কী বললে?' আমার কথা শুনে কামরার ও মাথা থেকে চমকে উঠল লিযি। 'ঠিক বলছ তো?'

টেপটা পরখ করলাম আরেকবার।

'আলবত।'

'ইয়াহু,' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল লিযি। 'পেয়েছি!'

এক দৌড়ে আমার প্রান্তে চলে এল ও। হাঁটছে দেয়াল ঘেঁষে।

'কী করছ?' জবাব চাইলাম।

'গোপন দরজা খুঁজছি।'

দেয়াল বরাবর এমাথা-ওমাথা হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম আমরা। গুপ্ত দরজার চিহ্ন খুঁজছি। বৃথা। সবখানে টোকা দিয়ে দেখলাম। নিরেট বলে মনে হলো। দরজার পাত্তাও নেই।

'ব্লুপ্রিন্ট যে মাপের কথা বলেছে সেটায় ভুল নেই তো?' প্রশ্ন করলাম।

'না।'

প্ল্যানটা আরেকবার নিরীখ করলাম আমরা।

'এটা কী?' প্ল্যানের একটা জায়গা ভাঙা। আঙুল রাখলাম সেখানে।

লিযি মাথা নাড়ল, তারপর বাড়ির অন্যান্য তলার প্ল্যান খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'মনে হচ্ছে জানালা,' বলল শেষ পর্যন্ত।

'কিন্তু এই দেয়ালে তো কোন জানালা নেই।'

এবার লাইনের অপেক্ষাকৃত বড় এক ভাঙা অংশে আঙুল রাখলাম।

'আর এটাকে দেখতে দরজার মত লাগছে। ল্যাবটা নিশ্চয়ই এই দেয়ালের পিছনে আছে!'

আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল লিযি।

হঠাৎই মাথায় খেলে গেল আরেকটি আইডিয়া।

'এসো, লিযি,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছি, এগোচ্ছি সিঁড়ি লক্ষ্য করে। 'বাইরেটা চেক করে দেখি।'

বেসমেন্টের দেয়ালটা বাড়ির পিছনের অংশে। ঝোপ-ঝাড় আর ফুলগাছে ছাওয়া, ফলে পরিষ্কার চোখে পড়ে না।

একটা ঝোপের ভিতর দিয়ে উঁকি দিলাম।

'দেখো, দেখো, একটা জানালা!'

মাটির নীচে দেবে রয়েছে জানালার অর্ধেকটা।

কাঁচ কালো রঙে পেইন্ট করা। বন্ধ। তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না, কেননা আমার শরীর ওটার ভিতরে গলাতে পারতাম না।

'এবার দরজাটা খুঁজে বের করতে হবে!' মহা উত্তেজিত দেখাচ্ছে লিযিকে।

প্ল্যানটা আবারও পরখ করলাম আমরা। জানালাটার ডান দিকে, আট ফিট দূরে থাকার কথা দরজাটার। কিন্তু কোথায় দরজা?

'ওটা এখানেই কোথাও থাকবে,' বলল লিযি। 'একটা দরজা লুকিয়ে রাখা এত সোজা না।'

ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে জানালাটার কাছে চলে এলাম। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে তারপর বুকে হেঁটে দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে লক্ষ করলাম। কিচ্ছু নেই। ঝোপ-ঝাড় থেকে লাগা কাদা আর আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে শুধু। এবার সটান

উঠে দাঁড়িয়ে, বাড়িটার কাছ থেকে দূরে হেঁটে যেতে শুরু করলাম। কিন্তু একটু পরেই শিকড়ে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। পতনের শব্দটা ভারী অদ্ভুত শোনাল কানে।

এক লাফে উঠে পড়লাম। দু'হাতে কাদা খুঁড়তে শুরু করলাম লিযি আর আমি। ইঞ্চি তিনেক নীচে খুঁজে পেলাম ওটা—ইস্পাতের তৈরি এক তলকুঠুরির দরজা।

'দরজাটা আড়াল করতে খুব খাটতে হয়েছে,' বললাম।

'তোমার ভাইকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভারী তালাটা ধরে টান দিলাম। ঝকঝকে নতুন তালা। প্রাইস ট্যাগ সাঁটা রয়েছে এখনও।

'ভিতরে ঢুকতে হবে আমাদের,' বললাম। 'নিশ্চয়ই এমন কিছু প্রমাণ পাব, যাতে সবাইকে বোঝানো যাবে রব সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছে।'

'আমার ভয় করছে,' ফ্যাকাসে মুখে বলল লিযি।

'কেন?'

'ধরো, হিচকক কোন মিউট্যান্ট জানোয়ার এখানে রেখে গিয়ে থাকে যদি?'

থমকে গেছি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলাম।

'তারমানে তোমার কথাগুলো সত্যি ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল ও। ভয়ানক আতঙ্কিত। ওর কথা বিশ্বাস করিনি আমি···এই একটু আগে পর্যন্ত। বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও করছে না।

'এখানে কোন জন্তু-জানোয়ার থাকার প্রশ্নই ওঠে না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চেষ্টা করলাম। 'কেউ না কেউ শুনতে পেতই।'

'কথাটা ঠিক নয়,' প্রতিবাদ করল লিযি। 'অনেক হিংস্র জানোয়ার আছে শব্দ করে না। সাপের হিসহিসানি কজন শুনতে পাবে?'

'সাপ ঘেন্না লাগে আমার।'

হঠাৎই কানে এল সদর দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ।

'রব ফিরেছে,' ফিসফিস করে বললাম।

দ্রুত লাথি মেরে দরজার উপর ধুলো-মাটি চাপা দিলাম। ভাগ্যিস পুরো দরজাটা ঢাকতে হচ্ছে না। ঝটপট সেরে ফেলা গেল কাজটা।

রব যখন হেলেদুলে পিছনের উঠনে হাজির হলো, আমরা দু'জন তখন ফ্রিসবি লোফালুফি করছি।

আমি জানি, বেসমেন্টে আমাকে ঢুকতেই হবে, কিন্তু কীভাবে? রবের কাছে নিশ্চয়ই চাবি আছে। ওর কাছ থেকে ওটা আদায় করব কেমন করে? আর আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেললে কী করবে ও?

সাত

ঘণ্টা দুয়েক পরে ভাগ্য সহায় হলো সাপার সেরে টিভি দেখছিলাম। অপেক্ষা করছি বব কখন শাওয়ারে যাবে। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, ও বাথরুমে ঢুকলে ওর চাবি 'ধার' নেয়া, এক দৌড়ে নীচে নেমে এসে তালা খোলা, এবং দৌড়ে উপরে গিয়ে চাবি ফেরত দেয়া···ও গোসল সেরে বেরোবার আগেই।

উপরতলার বাথরুমে পানি পড়ার শব্দ পেতেই কাজে নেমে পড়লাম।

সাবধানে, একটা একটা করে সিঁড়ি ভাঙছি। কেননা ববের ঘরের ঠিক পাশেই বাথরুম। তার মানে, ওর কান এড়িয়ে কাজটা করতে হবে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে, নীচে হলের দিকে চাইলাম। সহসাই ওটাকে অসম্ভব রকমের লম্বা দেখাল আমার চোখে। শাওয়ারের শব্দ শুনতে প্রায় পাচ্ছিই না, কিন্তু আমার করা প্রতিটা শব্দ যেন দেয়ালে বাড়ি খেয়ে শতগুণ জোরালো হয়ে কানে এসে বাজছে।

হলঘর ধরে শ্লথগতিতে হাঁটছি। সাবধান থাকছি যাতে শব্দ না হয়, কিন্তু ধাপে পা রাখতেই সিঁড়িটা ককিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল। জমে গেলাম আমি! মাথায় চিন্তা এল, বেশি দেরি করলে বব শাওয়ার সেরে বেরিয়ে আসবে–চাবি হাত করতে পারব না। এবার শশব্যস্তে পা চালালাম।

আরেকটু হলেই পা বেধে যেত টেলিফোনের তারে। যন্ত্রটা ববের ঘরের ঠিক বাইরেই রয়েছে টেবিলের উপর!

একটু পরে, আলগোছে ববের কামরায় সেঁধিয়ে পড়লাম। চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম···সাবাস···বিছানার উপরেই দেখতে পেলাম ববের চাবির গোছাটা। ঝাঁ চকচকে একখানা চাবিও দৃষ্টি কাড়ল আমার।

প্রথমে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম বিছানার ঠিক কোনখানে গোছাটা রয়েছে। এবার আলতো হাতে ওটা তুলে নিয়ে, সাঁত করে বেরিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে, তারপর পা টিপে টিপে হল পেরিয়ে নেমে এলাম নীচে।

দোতলায় নামার পর, একছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে এলাম উঠনে।

মুখ তুলে চাইতে বাড়ির একটা পাশ নজরে এল। পানি পড়ার শব্দ এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার।

ভাল। ধুলো-মাটি হাতড়ে, তালাটা খুঁজে পেয়ে চাবি ঢোকালাম।

বসে গেল খাপে-খাপে। এবার মোচড় দিতেই ক্লিক করে উঠল।

ইচ্ছে করছিল গোপন ঘরটায় উঁকি দিই, কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, এক দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে। ববের হাতে কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। যতক্ষণ শাওয়ার খোলা থাকবে বাথরুমের,

ততক্ষণই আমি নিরাপদ। বব জেনে গেলে কী করব বা কী বলব নিজেও জানি না।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, ল্যান্ডিঙে পৌঁছতেই···হলরুমের ফোনটা বেজে উঠল!

স্থাণু হয়ে গেলাম।

জবাব দেওয়ার উপায় নেই। চাবি রেখে আসার আগেই হয়তো বব বেরিয়ে আসবে বাথরুম থেকে, তারপর কী হবে কে জানে!

ঝেড়ে দৌড় দিতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু পরমুহূর্তে উপলব্ধি করলাম আমাকে শান্ত থাকতে হবে। আমাকে হলঘরে খুট-খাট করতে শুনলে বব সন্দেহ করবে কেন আমি ফোন ধরছি না।

ফোন ধরা-টরা পরে। আগে চাবি রেখে আসি।

হলঘর ধরে সন্তর্পণে এগোচ্ছি আমি।

'রবিন! ফোনটা ধরো!' গর্জে উঠল বব। ওর আদেশ পালন করা এমুহূর্তে অসম্ভব।

ওর ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে নবটা ঘোরালাম।

'অ্যাই, বাঁটকু! ফোন ধরছ না কেন!'

ঠেলা দিয়ে দরজা খুললাম। আচমকা শাওয়ারের পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। প্রমাদ গুণলাম। মনে হলো স্তব্ধ হয়ে গেল বুঝি আমার হৃৎপিণ্ড।

ওর বিছানার কাছে দুই লাফে পৌঁছে জায়গা মত রেখে দিলাম গোছাটা।

'রবিন! বাঁটকু কোথাকার!'

দরজার দিকে এগোলাম। খুলে গেল বাথরুমের দরজা। জমে গেলাম আমি। বব আমাকে ওর কামরায় দেখলে স্রেফ জানে মেরে ফেলবে।

বব ফোন ধরতে যাচ্ছে শব্দ পেলাম। পরমুহূর্তে ওর বিছানার তলায় ডাইভ দিলাম। অতিকষ্টে জায়গা করে নিতে হলো। খাটের নীচে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স। অদ্ভুত এক গন্ধ বেরোচ্ছে ওটা থেকে। বাক্সের ভিতরে উঁকি দিলাম। কলা! এক বাক্স ভর্তি।

রিসিভার তুলেছে বব।

'কে?' ক্রুদ্ধ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'কে?' আবার বলল। 'লিযি? লিযি কে?' এবার গলা চড়িয়ে ডাকল, 'রবিন! ফোন!'

হায়রে, লিযি আর ফোন করার সময় পেল না!

'অই বাঁটকু, তোর ফোন!' গর্জাল বব।

টেবিলে খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেলাম।

একটু পরে ওর ঘরের দরজা খুলে গেল দড়াম করে। সভয়ে শ্বাস চাপলাম।

যেখানে শুয়ে আছি, সেখান থেকে ওর পায়ের পাতা দুটো দেখা যাচ্ছে। ঘন ও কালো লোমে ঢাকা। আঙুলগুলো দ্বিগুণ লম্বা হয়ে গেছে বলে মনে হলো। বিছানার দিকে হেঁটে আসছে ভয়ঙ্কর একজোড়া পা!

আচমকাই উল্টোদিকে ঘুরে গেল ও দুটো। খাটে বসেছে বব। পিঠে ম্যাট্রেসের চাপ অনুভব করছি। মুহূর্ত পরে উঠে পড়ল ও।

সরে যাচ্ছে বিছানার কাছ থেকে। এবার মেঝেতে ওর হাত দুটো উদয় হলো, পায়ের পাতার ঠিক পাশে। পা দুটো হঠাৎই উঠে গেল শূন্যে! লোমশ হাত দুটোই এখন শুধু দেখতে পাচ্ছি।

'খোঁত' করে শব্দ করল বব। হাতজোড়া ঘরময় ঘুরছে।

হাতের উপর ভর করে হেঁটে বেড়াচ্ছে বব!

খানিক বাদে আরও অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। হাতজোড়া হেঁটে চলে এল স্টিরিওর কাছে, বেজে উঠল গান! তারমানে নিশ্চয়ই পায়ের সাহায্যে স্টিরিও অন করেছে ও।

উঁকি দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল ওর কাণ্ড-কারখানা। সতর্ক থাকলে হয়তো দেখতে পাবে না। আর দেখে যদি ফেলেও, ও আমার ভাই হয় না? আমাকে কি মেরে ফেলবে নাকি?

ঠিক এমনিসময়, অশ্রাব্য এক গালি ঝাড়ল বব। আগে কখনও এ ধরনের শব্দ ওর মুখ দিয়ে বেরোতে শুনিনি।

সশব্দে এক গাদা সিডি পড়ে গেল মেঝের উপর। কেস থেকে খসে বেরিয়ে, একটা সিডি গড়িয়ে এল আমার দিকে।

হাতজোড়া এবার আমার উদ্দেশে হেঁটে আসছে। এবার আর ধরা না পড়ে উপায় নেই!

বিছানার সামনে এসে থেমে গেল হাত দুটো। দম বন্ধ করে রেখে সিডিটা ঠেলে দিলাম বসের উদ্দেশে।

ববের একটা পা সহসা খাটের কিনারা দিয়ে ঢুকে গেল। সিডিটা বাড়িয়ে দিলাম। পায়ের বুড়ো আঙুলটা যেন সাপের মত কিলবিল করছে—ন্যাগাল পেল সিডিটার। ওটাকে কাত করে টেনে বের করে নিল ও।

এতক্ষণে শ্বাস ছাড়লাম ধীরে ধীরে। এ যাত্রা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। ববের পা থেকে পশুর গায়ের দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম। অথচ এখুনি গোসল সেরে বেরিয়েছে ও। চিড়িয়াখানায় বানরের খাঁচার কাছে এ জাতীয় দুর্গন্ধ পাওয়া যায়! শুধু তাই নয়। ওর পায়ের পাতায় নীল মাছিও ভন-ভন করতে দেখেছি।

চাচা-চাচী বাসায় থাকলে তাঁদেরকে ববের পা দুটো দেখতে বলতাম। তাহলেই টের পেয়ে যেতেন আমার কথা সত্যি কিনা। ববের পায়ের পাতাজোড়াকে এখন আর মানুষের পায়ের পাতা বলা যাবে না। এর মানেটা কী?

উঁকি দিয়ে দেখলাম আবারও। বাস্কেটবলের কাছে চলে গেছে বব। পা নামিয়ে দিল ওটা তুলে নেওয়ার জন্য। কিন্তু পারল না। আবারও চেষ্টা করতে গিয়ে ফেলে দিল।

কুৎসিত এক গাল ঝেড়ে, আলতো শব্দ করে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়াল ও। বাস্কেটবলটা নিশ্চয়ই তুলে নিয়েছিল, কেননা ঝন-ঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ

পেলাম একটু পরে।

এবার জঘন্য গালি-গালাজের তুবড়ি ছুটল ওর মুখে। আওয়াজ যা করছে, মনে হচ্ছে বুক চাপড়াচ্ছে গরিলার মত। সে সঙ্গে কানে আসছে খোঁত-খোঁত আর হিস-হিস শব্দ।

এবার হঠাৎই বিছানায় বসে পড়ল ধপ করে।

'খাবার!' মনে হলো এ শব্দটাই উচ্চারণ করল।

বিছানার পাশে দেখা গেল ওর হাত দুটোকে। কলা তুলে নেবে বলে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু অসম্ভব লম্বা বাহু সত্ত্বেও নাগাল পেল না।

ওর পায়ের পাতা দেখতে পেলাম, এবার গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি—লোমাবৃত। এইবার ধরা পড়তে যাচ্ছি আমি। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসবে ও, উঁকি দেবে খাটের নীচে, এবং দেখে ফেলবে আমাকে। কপালে খারাবি আছে আমার।

মেঝের উপর একটা হাত উদয় হলো।

ঠিক এমনিসময় ডোরবেল বেজে উঠল।

গাল দিয়ে উঠে দাঁড়াল বব।

ডোরবেল বেজে চলেছে বারে বারে।

শব্দ পেলাম পোশাক পাল্টাচ্ছে বব। এবার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে নামতে লাগল সিঁড়ি ভেঙে।

চট করে বিছানার নীচে থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলাম হলঘর লক্ষ্য করে। লিযি এসেছে! পা টিপে টিপে ফোনটার কাছে গিয়ে, রিসিভারটা ক্রাডলে রেখে দিলাম। এতক্ষণ এভাবে পড়ে থাকায় অদ্ভুত শব্দ করছিল ফোনটা।

লিযি আমার বিপদ কিছু টের পেয়েছিল কিনা জানি না, তবে ববকে ও সদর দরজায় ব্যস্ত রেখেছে। এই ফাঁকে আমি আলগোছে নীচে নেমে এসে ফ্যামিলি রুমে ঢুকে পড়লাম। কাউচে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমের ভান করলাম দু'মুহূর্ত। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সামনের হলে চলে এলাম। ভাবখানা এমন যেন কিছুই জানি না।

লিযি তখনও কথা বলে চলেছে ববের সঙ্গে।

'ফোনে জবাব না পেয়ে ভাবলাম কী ব্যাপার দেখা দরকার,' বলছে লিযি। 'তারপর শুনলাম জানালা ভাঙার শব্দ। ভাবলাম না জানি কী বিপদ-আপদ হয়েছে।'

'কিছুই হয়নি, লিযি,' বললাম।

ঘুরে দাঁড়াল বব। আমাকে এক নজর দেখল, তারপর একটি কথাও না বলে সিঁড়ির উদ্দেশে পা চালাল।

দীর্ঘ একটি মুহূর্ত পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম লিযি আর আমি।

'অল্পের জন্যে পার পেয়েছি,' গলা নামিয়ে বললাম। 'ফোন করেছিলে কেন?'

'তুমি চাবি জোগাড় করতে পেরেছ কিনা জানতে।'

'পেরেছি, লিযি।'

সহসা ও একটা হাত তুলল।

'আসছে,' ফিসফিস করে বলল।

আমার পিছনে এসে দাঁড়াল বব।

'অই, বাঁটকু,' খেঁকিয়ে উঠল। 'তোমার বান্ধবীকে কেটে পড়তে বলো।'

'পরে দেখা হবে,' বলে ঝটপট সটকে পড়ল লিযি। যাওয়ার আগে আমাকে চোখ টিপে গেছে। এর মানেটা হচ্ছে, গোপন ল্যাবে অনুপ্রবেশের আগে ফোনে ওকে জানাব আমি।

সে রাতেই অভিযান চালাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সে গুড়ে বালি। বেডরুমে না গিয়ে সোজা বেসমেন্টের উদ্দেশে এগোল বব।

সিঁড়িতে পা রাখলাম। ওপরতলায় পৌঁছে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া হরিণের দশা হলো আমার।

হল ফোন! ওটা তুলে রেখেছি আমি! ববের চোখে কি ধরা পড়েছে ব্যাপারটা?

যদি পড়ে থাকে, তা হলে ও জেনে গেছে লিযি যখন বেল বাজায় আমি তখন ফ্যামিলি রুমে ছিলাম না। আর জেনে গিয়ে থাকলে আমার সামনে অপেক্ষা করছে মহাবিপদ!

আট

সে রাতে, বিছানায় শুয়ে সমস্ত ঘটনা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখলাম।

কুকুর-সাজা ছেলেটির চাইতে অনেক জটিল লাগছে আমার কাছে ববের কেসটা। ছেলেটির মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। তা ছাড়া কুকুর হচ্ছে বন্ধুভাবাপন্ন প্রাণী। কিন্তু আমার ভাই শুধু যে গরিলার অভিনয় করছে তা-ই নয়, ভয়ঙ্কর এক গরিলাতে রূপান্তরিতও হচ্ছে।

চিড়িয়াখানার এপ হাউস দেখতে গেছিলাম একবার। টাকি নামে এক গরিলা ছিল ওখানে। খাঁচার ছাদের দিকে চেয়ে বসে ছিল ওটা। হাতে ছিল একটা পুতুল।

দীর্ঘক্ষণ লক্ষ করেছিলাম গরিলাটাকে। যেই চলে যাব বলে নড়ে উঠেছি, অমনি আমার দিকে ঝট করে ঘুরে বসল ওটা—চোখে চোখে চেয়ে রইল।

মুহূর্ত পরে, পুতুলের মাথাটা এক টানে ছিঁড়ে আমার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারল। দু'দিন পর কাগজে পড়লাম, গরিলাটা আরেকটা গরিলাকে হত্যা করেছে।

সে রাতে, সামুরাই তরোয়ালটা পাশে নিয়ে শুয়ে থাকলাম আমি, রাত

বাড়ালেই যেন নাগাল পাই। ভুলেও ঘুমানোর চেষ্টা করলাম না। মাঝ রাতে হলঘরের ঘড়িতে ঘণ্টা পড়তে শুনলাম। এরপর দেখি সকাল হয়ে গেছে।

চটপট পোশাক পরে, সিরিয়াল প্রায় শেষ করে এনেছি, এসময় শুনি পা ঘষটে ঘষটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে বব। কিচেনে গিয়ে ঢুকল ও, হাতে এক কাঁদি কলা। ঠিক যেন একটা গরিলা।

অবিশ্বাস্য রকমের লোমশ এখন বব। সারা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখতে খারাপ লাগত না, যদি না মুখের চাইতে ঘাড়ে লোমের পরিমাণ বেশি হত।

শর্ট পরেছে বব, ফলে লোমে ভরা পা দুটো দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন চুল নয়, পশম গজিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে।

'মর্নিং, বব,' বললাম।

মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকাল, খোঁত করে শব্দ করল, খোসা ছাড়াল একটা কলার, এবং গিলে নিল তিন সেকেন্ডের মধ্যে।

এবার কিচেন সিঙ্কের পানি ছেড়ে দিয়ে ফসেটের উপর ঝুঁকে পড়ল। আঁজলা ভরে বার কয়েক পানি তুলে পান করে, নীরবে আরও সাতটা কলা সাবাড় করল। খানিক পরপর ঘাড় কিংবা লোমশ পা থেকে মাছি তাড়াল।

ওখানে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা কলা গিলল ও, সে সঙ্গে আঁজলা ভরে পানি পান করল। খাওয়া শেষে, কিচেন ত্যাগ করে চলে গেল পিছনের উঠনে।

খানিক পরে, বাস্কেটবল নিয়ে বাড়ির এক পাশে ওকে ড্রিবলিং করতে দেখলাম।

'হ্যাঁ,' আপন মনে বললাম। 'আজকে বাছাই।'

এই সপ্তাহান্তে পার্কভিল হাই স্কুল নতুন খেলোয়াড় বাছাই করছে। বব বলেছে ও-ও চেষ্টা করে দেখবে সুযোগ পায় কিনা। ওখানেই নিশ্চয়ই যাচ্ছে ও।

মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একটু আলাপও করল না বব।

অবশ্য এর একটা ভাল দিকও রয়েছে। বব অনেকক্ষণ বাসায় থাকছে না কাজেই লিযিকে ফোন করলাম।

'হ্যালো,' অপরপ্রান্ত থেকে বলল কেউ একজন।

'আমি রবিন, পাশের বাসায় থাকি। লিযিকে চাইছি।'

'হাই, রবিন।'

বব অন্তত ঘণ্টা দুয়েক থাকবে না শুনে খুশি হয়ে উঠল লিযি।

'আমি এখুনি আসছি,' বলেই ফোন রেখে দিল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে লম্বা করে শ্বাস টানলাম। সময় এসে গেছে। শীঘ্রিই, ববের সমস্যা কী সে বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারব আমি।

এসময় দরজায় নক হলো। লিযি।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। লিযির হাতে ফ্ল্যাশলাইট, মাথায় বেসবল ক্যাপ।

'হ্যা,' বলল ও।

'ওকে, বললাম সায় দিয়ে।

বাড়ির পিছন দিকে হেঁটে এলাম আমরা। কিন্তু যা দেখলাম তাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলাম।

একটা কাঠবিড়ালী, মরে কাঠ হয়ে আছে। গোপন দরজাটার কাছে পড়ে রয়েছে। ঘাড়টা মুচড়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সারা গায়ে ছোপ-ছোপ কালচে রক্ত। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লাগল পা দুটো দেখে। দৌড়ের ভঙ্গিতে পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। পালাতে গিয়েও পারেনি, মারা পড়েছে অবলা জানোয়ারটা।

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করলাম আমরা। কারও মুখে বাক্য সরল না, কিন্তু লিযির মনের কথাটা বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না আমার। ওর ধারণা, বব খুন করেছে কাঠবিড়ালীটাকে, এবং দরজার সামনে ফেলে রেখে গেছে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করতে। কথাটা অবশ্য বিশ্বাস করতে মন চাইছে না আমার।

'কুকুরের কাজ হতে পারে,' বললাম।

'হুঁ,' বলল লিযি। 'ইয়ে···মানে রক্ত দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন জানোয়ার আক্রমণ করেছিল কাঠবিড়ালীটাকে।'

'হ্যাঁ, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

একটা বেলচা খুঁজে এনে মরা জানোয়ারটাকে একপাশে সরিয়ে দিলাম।

'কবর দিয়ো না,' বলল লিযি। 'যেখানে ছিল ফেলে রাখব। বলা তো যায় না বব যদি···'

'হ্যাঁ,' কথা কেড়ে নিলাম। আসলে ওকে কথাগুলো বলার সুযোগ দিতে চাইলাম না।

দরজা থেকে মাটি চেঁছে দ্বিতীয়বারের মত চমকে গেলাম আমরা।

তালা মারা

'তারমানে বব জানে যে আমরা সব জেনে গেছি,' বলল লিযি।

কাঠবিড়ালীটার দিকে আবারও দৃষ্টি চলে গেল আমাদের। লিযির কথা জানি না, তবে আমার ইচ্ছে হলো প্রাণপণে দৌড় দিই। হঠাৎই অন্তরের গভীর থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'ভেঙে ফেলো। তোমাদের হারানর কিছু নেই।'

লিযি চাইল আমার উদ্দেশে। এবার একটু-একটু করে হাসি ফুটল ওর মুখে।

চাচার টুলবক্স থেকে একটা ক্রোবার এনে, কাজে লেগে পড়লাম আমি। তালা পরাবার আংটার নীচে ক্রোবারটা ঢুকিয়ে, চাড় দিতে লাগলাম গায়ের জোরে। এতটাই জোরে টানছি, মনে হলো নাক থেকে বুঝি রক্ত বেরিয়ে আসবে। হাল যখন প্রায় ছেড়ে দিচ্ছি, এমনিসময় ঠং করে ভেঙে গেল তালাটা।

'সাব্বাস,' সপ্রশংস সুরে বলল লিযি।

ওর দিকে একবার চাউনি বুলিয়ে নিলাম। এবার জোর ধাক্কা মারলাম দরজায়। ভুতুড়ে ছবির পুরানো বাড়ির মত ককিয়ে উঠে খুলে গেল ওটা।

কংক্রিটের সিঁড়িতে আলোর রেখা চুইয়ে এসে পড়েছে। প্রথম ধাপটায় পা রাখলাম আমি।

'এখানে কোন জ্যান্ত প্রাণী নেই তো?' লিযি প্রশ্ন করল।

'জানি না, লিযি,' বললাম। 'খুঁজে দেখব বলেই তো আসা। এসো।'

নেমে যাচ্ছি আমি। পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে লিযি। সাতটা মাত্র ধাপ। কিন্তু এত দীর্ঘ সিঁড়ি আগে কখনও ভাঙতে হয়নি আমাকে।

বাতাসে ভাপসা গন্ধ। মেঝেতে শ্যাওলা জন্মেছে। পানির গন্ধ পেলাম, আর কলার।

লম্বা, সংকীর্ণ কামরাটার চারধারে আলো বুলিয়ে নিলাম।

দৈত্য-দানো কিংবা বিকৃত কোন জানোয়ার চোখে পড়ল না। তার বদলে ফুলদানি, পাত্রে রাখা মাটি—এমনি ধরনের নানান জিনিস দেখতে পেলাম।

দেয়াল জুড়ে সবুজ রং করা হয়েছে সম্প্রতি। শুকোয়নি এখনও। ছাদেও সবুজ রং। অদ্ভুত দেখাল চোখে। তবে এটুকুই, রহস্যময় কিছু দেখলাম না। কতই না ভয় পাচ্ছিলাম, অথচ আবিষ্কার করলাম কিনা একটা ফাঁকা ঘর।

'দেখে যাও,' ঘরের কিনারা থেকে বলে উঠল লিযি।

ঘুরে তাকাতেই দেখি সাদামাঠা এক লকার। ওটার ভেতর থেকে এক উইন্ডব্রেকার টেনে বের করল লিযি।

জিনিসটা ববের। হঠাৎই আর্তচিৎকার করে উঠল লিযি।

থপ-থপ করে মেঝেতে পড়ল কী যেন। দুর্গন্ধে ভরে গেল ঘর। আমার জুতোর উপর দিয়ে বয়ে গেল এক ধরনের তরল। নীচের দিকে চাইলাম। বাঁ পায়ের দু'ইঞ্চি মত দূরে··· তিনটে কান···মানুষের!

আমার গলা চিরেও আর্তনাদ বেরিয়ে এল। 'হায়, খোদা!'

'লকারে একটা জারের ভিতর ছিল,' জানাল লিযি। 'জারের ভিতর কাটা কান!'

দরজার দিকে ইতোমধ্যে পা বাড়িয়েছে ও।

'চলে এসো, রবিন,' বলল ও। 'আমার গা গুলোচ্ছে।'

'বেশ, চলো,' সায় জানালাম।

কিন্তু আমরা এক পা এগোতেই দড়াম করে লেগে গেল দরজা!

তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল লিযি। এতটাই চমকেছি, হাত থেকে খসে পড়ে গেল ফ্ল্যাশলাইট। চোখের নিমেষে ঠাস করে ভেঙে গেল ওটা। আমরা ঢাকা পড়লাম নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর শুনতে পেলাম আগুয়ান পায়ের শব্দ।

*

নয়

আমার বাহু আঁকড়ে ধরেছে লিযি। এতটাই জোরে, ব্যথা করছে। কারও মুখে বাক্য সরছে না। দু'জনেই উৎকর্ণ।

পায়ের শব্দ দরজার দিকে আরও কাছিয়ে এল। ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ

শোনা যাচ্ছে। এক চুল নড়ার সাহস হলো না আমাদের। অবশেষে, হাঁটা বন্ধ হলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেউ।

'তো মেয়েটাকে এখানেও নিয়ে এসেছ,' বলল বব।

'বব!' গর্জে উঠলাম প্রায়। 'ভীষণ ভয় দেখিয়েছ। তোমার কাছে ফ্ল্যাশলাইট আছে? আমারটা ভেঙে গেছে।'

'এখানে তোমার না নামলে চলত না, না?' ববের গলা শুনে মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু করতে চলেছে।

'কৌতূহল তো হতেই পারে, তাই না?' সাফাই গাইল লিযি। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

'কৌতূহলে বিড়াল মরে,' হিসিয়ে উঠল বব।

নাকি কাঠবিড়ালী, বললাম মনে মনে।

'হা, হা,' ভারী মজার কৌতুক শুনে যেন হেসে উঠল লিযি।

আচমকা ববের হাত (নাকি থাবা বলব) আমার কাঁধ স্পর্শ করল। 'এখুনি তোমার ব্যবস্থা করছি। আর তোমাকে...'

লিযির বাহু চেপে ধরল ও। ভয়ানক আতঙ্কিত বোধ করছে নিশ্চয়ই বেচারী। আমি তো করছি।

'তোমাকে এখুনি চলে যেতে হবে,' কথার খেই ধরে লিযিকে বলল বব।

লিযিকে কামরার অন্ধকার এক কোণে নিয়ে গেল ও। ক'মুহূর্ত ফিসফিস করে কথা বলল ওরা। তারপর নিচু, দীর্ঘ এক ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ উঠল।

'চলে গেছে,' ঘরের ও প্রান্ত থেকে বলল বব। 'ও আমাদেরকে আর জ্বালাতন করবে না।'

ঢোক গিললাম আমি।

ববের পায়ের আওয়াজ আমার দিকে এগিয়ে এসে থেমে গেল।

'ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। কাউকে কিছু বলবে না তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না। কথা দিয়ে থাকলে কেন বলবে?' বললাম। অনেকক্ষণ পর শ্বাস টানলাম বুক ভরে। 'ও ভাল মেয়ে।'

খলখল করে হেসে উঠল বব।

'না, ও কিচ্ছু বলবে না। বললে তোমার কী দশা হবে জানে।'

হঠাৎই হাসি থেমে গেল ওর। সুইচ টিপতেই ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে গেল ওর মুখ। চোয়াল ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সর্বাঙ্গে চুলের পরিমাণ আরও বেড়েছে। কপালে আড়াআড়ি মিশে গেছে ভ্রূ জোড়া।

'বাবন, সবই জেনে গেছ তুমি।'

'বব, এসব কী হচ্ছে তোমার?'

'কী পাচ্ছ, বাঁটকু?'

ভয়ানক আতঙ্কিত বোধ করছি। কিন্তু কোনমতেই ববের কাছে তা প্রকাশ করা চলবে না।

'না, বব,' বললাম। 'তুমি আমার ভাই। ভয় পাব কেন?'

হেসে উঠে উরুতে চাপড় মারল ও।

'বব, এসব কী হচ্ছে তোমার? কেন হচ্ছে?'

'কী আর এমন হচ্ছে? খালি তো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছি আমি, ব্যস এটুকুই। দেখতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি।'

'পুরো ঘটনাটা জানতে চাও?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'না। আগে বলো বাবা-মাকে বলবে না।'

'ঠিক আছে।'

'না, মুখের কথায় কাজ হবে না। রক্তের শপথ নিতে হবে।'

'আচ্ছা,' বললাম। একটা পিন দিয়ে আঙুল ফুটালাম। রক্ত বেরিয়ে এলে পরস্পরের আঙুলে আঙুল ঘষে নিলাম।

বাতি জ্বেলে দিল বব। গোপন ঘরটাকে এখন আর অতটা ভীতিকর লাগছে না। নতুন এক জিনিস চোখে পড়ল আমার। একটা ট্র্যাপ ডোর।

আমাকে ওটার কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল বব। ড্রেনের মত মনে হলো ফোকরটাকে। একজন মানুষ গলতে পারবে। তিন দিক কাঠ দিয়ে ঘেরা।

'এ ঘরটা যখন খুঁজে পাই, তখন কিছু বুঝিনি। ভেবেছিলাম যে বুড়ো এখানে থাকত সে এটা ব্যবহার করত না। হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ করে পা পিছলে পড়ে গেলাম এই গর্তটার ভিতরে।'

একটা বোতলের খাপে লাথি মারল ও। একটু পরে ছলাত করে শব্দ উঠল ওটা নীচে গিয়ে পড়লে।

'এক ধরনের তরলে ভরা জায়গাটা। মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ ছাড়ে। নীচে পড়ে যাওয়ার পর উঠতে বিশ মিনিট লাগে আমার। বিশ্বাস না-ও করতে পারো, এতটুকু ভয় পাইনি আমি। উঠে আসার জন্যে কোন তাড়াহুড়োও করিনি। বরঞ্চ বেশ আরামই লাগছিল বলা যায়। উঠে এসে দেখি অন্যরকম লাগছে। এই দেখো!'

একটা বাহু বাড়িয়ে দিল ও। আগের দিনের চাইতে আরও লম্বা দেখাচ্ছে, পেশীবহুল, এবং ভয়ানক রকমের লোমশ। বাইসেপ ফুলিয়ে আমাকে পেশী দেখাল ও।

'আজ রাতে ভাল করে একটা ডুব দেব। তারপর মনে হয় রূপান্তর পুরোপুরি শেষ হবে।' চোখ চকচক করছে ওর।

দীর্ঘ, লোমশ হাতে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরল ও।

'তারপর, বাঁটকু, তোমার পালা।'

দশ

কেন যে তখন ওর হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালালাম না খোদা জানেন। আমার অবশ্য একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া এখনও বাকি।

'বব, শুকনো মাথাটা কোথায়? পার্কার আঙ্কল যেটা তোমাকে দিয়েছেন?'

মুহূর্তের জন্য ভাবলেশহীন হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা। এবার মৃদু হাসল ও, আমার ধারণা।

'শুকনো মাথা! কীসের মাথা? পার্কার আঙ্কল আমাকে একটা ইলেকট্রিক রেযর দিয়েছেন!'

তারমানে আমি ইলেকট্রিক রেযরের শব্দ পেয়েছিলাম!

'কিন্তু,' বলে চলল বব, 'আমার তো দাড়ি কামাবার দরকার নেই। দেখছ না গরিলার মত লোম গজিয়েছে সারা গায়ে? অসম্ভব শক্তি ভর করেছে আমার দেহে। নিজেকে টারজানের চাইতেও শক্তিশালী লাগছে।'

ধীরে ধীরে এক পাক ঘুরল ও, মাথার উপর বাহু তুলে। ওর লোমশ দেহটা ক্রমেই বানরের দেহে পরিণত হচ্ছে। বড় কুৎসিত সে দৃশ্য। মনে হচ্ছে অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হবে।

বব আমাকে যেতে দেওয়ায় একটু অবাকই হলাম। প্রথমটায় ভেবেছিলাম ছলনা বুঝি। কিন্তু শেষমেশ বিশ্বাস হলো ছাড়া পেয়েছি। তারমানে রক্তের শপথকে গুরুত্ব দিচ্ছে বব, কিংবা হয়তো আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না।

চাচা-চাচীকে খবর দেব কিনা ভাবলাম। পরক্ষণে বাতিল করে দিলাম ভাবনাটাকে। অনেক দেরি হয়ে যাবে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে। আর পুলিসকে জানিয়ে লাভ নেই, বিশ্বাস করবে না। বব এখনও পুরোপুরি বানর হয়ে যায়নি, তাছাড়া আমি ছাড়া এশহরের আর কারও জানা নেই ও আগে কেমন ছিল।

মনের মধ্যে ভয়ও কাজ করছে। বব আমাকে ডোবাটার মধ্যে ফেলে দিতে চেয়েছে। আমি ওর মত বানর হতে চাই না। কিন্তু ঘাড় মটকানো কাঠবিড়ালীটার কথা ঘুরেফিরে বারে বারে মনে পড়ছে। আমাকেও যদি...?

বেরিয়ে এসেই ফোন করলাম লিযিকে। ওকে বললাম যেন মায়ের কাছ থেকে জেনে নেয় বুড়ো হিচকক এখন কোথায় থাকেন।

পরদিন সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠলাম আমরা। খানিক পরে, পাশের শহর ক্লিভল্যাণ্ডের উদ্দেশে বাসে চাপলাম আমরা তিন বন্ধু আর লিযি। কাল রাতে পার্কারভিলে এসে পৌঁছেছে কিশোর আর মুসা। ওদেরকে সব কথা খুলে বলেছি। ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম লিযির সঙ্গে।

রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি নিয়ে বাড়িটা দাঁড়িয়ে। পাগল বিজ্ঞানীর বাড়ি

বলে মনেই হয় না। অবশ্য অনেক উদ্ভট কিসিমের লোকও দিব্যি স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে বাস করে।

দরজায় টোকা দিলাম। সবার মনেই ভয়, মি. হিচকক হয়তো বা হাতে চেইন স কিংবা কুড়াল নিয়ে উদয় হবেন।

সাড়া দিলেন বেঁটে-খাট, মোটা, মাথাজোড়া টাক এক ভদ্রলোক। মানে মাথায় একটিও চুল নেই আরকী।

'কী ব্যাপার?'

'আপনি কি পার্কভিলের চারশো পঁচাশি মনরো অ্যাভিনিউতে থাকতেন?' রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি। মুছে গেছে মুখে লেগে থাকা স্মিত হাসি।

'আমার ভাই আপনার ফেলে রাখা কেমিকেলের ভেতর পড়ে গেছে,' হড়বড় করে বললাম। 'এখন···'

'বলো কী! আমি তো ফোকরটা ভাল মত সিল করে দিয়েছিলাম।'

হাতছানি দিয়ে ঘরের ভিতর ডেকে নিলেন আমাদের। চারধারে নজর বুলিয়ে আমার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। শুধু তাক আর তাক, আর তার উপরে নানা ধরনের জার।

জারের ভিতরে জীব-জন্তুর কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বাদুড়ের কান, শূথের পায়ের পাতা, নানা ধরনের চোখ। দেখে মনে হলো, যা চাইব তা-ই পাওয়া যাবে।

'বসো,' বললেন বৃদ্ধ। বসলাম আমরা।

'তোমার ভাইয়ের ঘটনাটার জন্যে আমি দুঃখিত,' বললেন। 'একটু ভেঙে বললে আমি বোধহয় সাহায্য করতে পারব।'

গড়গড় করে পুরো কাহিনীটা আওড়ে গেলাম। মেঝের দিকে চোখ রেখে এক মনে শুনে গেলেন তিনি। মাঝে মধ্যে শুধু টাকরায় আফসোসের শব্দ করলেন।

আমার বলা শেষ হলে মুখ তুলে চাইলেন। ভয় হলো কেঁদেই ফেলবেন নাকি।

'আমি কখনও কারও ক্ষতি করতে চাইনি,' বললেন। 'আমি একজন পশু চিকিৎসক। জেরিস জায়ান্ট থ্রী রিং সার্কাসে কাজ করি। জন্তু-জানোয়ারের দেখাশোনা করি। জীব-জন্তু বানাতেও সাহায্য করি। জেরিস জায়ান্ট ইউনিকর্নের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'খাইছে! তিন বছর আগে দেখেছি,' বলল। আমি আর কিশোরও সঙ্গে ছিলাম।

'ছাগলের শিং শেটল্যান্ড পনির মাথায় জুড়ে দিয়ে ওটা তৈরি করেছিলাম।'

মুখ ফুটে আর বললাম না, আমি ওটাকে আসল মনে করেছিলাম।

'কিন্তু পরে মাথায় আসে আমি বোধহয় জানোয়ারগুলোকে কষ্ট দিচ্ছি। তখন অন্য রাস্তা খুঁজতে থাকি। বায়োকেমিকেল টেকনিক নিয়ে কাজ শুরু করি। এক জাতের ট্রেইট নিয়ে অন্য জাতের উপর গবেষণা করি। এরফলে, প্রাকৃতিকভাবেই জন্মাতে থাকে ওরা। কুকুর, বিড়াল আর একটা ভেড়াকে নিয়ে কাজ করে প্রাথমিক

সাফল্যও পাই।

'এরপর জন্তুগুলোর পরস্পরের রক্ত মিশাতে শুরু করি। শেষে আবিষ্কার করি তরলে ডুবানোর প্রক্রিয়া। ওরাংওটান নিয়ে গবেষণা করছিলাম আমি। কিন্তু একটার পর একটা ওরাংওটান পাগল হয়ে যেতে থাকলে ওদেরকে শেষ করে দিতে বাধ্য হই।

'এক সময় উপলব্ধি করি, ভুল করছি। ব্যস, কাজ বন্ধ। সার্কাস ছাড়লাম, বাড়ি ছাড়লাম, এখন অবসরে যাব ভাবছি। ইনফ্যাক্ট, শহর ছেড়ে কালই দক্ষিণে চলে যাচ্ছি চিরদিনের জন্যে।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান। 'রবিনের ভাই কি সত্যি সত্যি ওরাংওটান হয়ে যাচ্ছে? ও কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে?'

'না, না, তা হবে না। নতুন প্রসেস তাঁর বেসিক মেটাবলিক ফাংশন পরিবর্তন করার আগেই থামাতে পারলে কিছু হবে না।'

'মানে?' হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

ক্লজিটের কাছে হেঁটে গেলেন বৃদ্ধ। ভিতর থেকে বের করলেন ফায়ার এক্সটিংগুইশারের মত দেখতে এক যন্ত্র।

'এটা দিয়ে ওকে স্প্রে করবে। পুরো শরীরে। এরফলে উল্টে যাবে প্রক্রিয়াটা। তারপর বাকিটুকু স্প্রে করে দেবে ফোকরটার ভিতরে। এতে করে সলিউশনটা নিউট্রালাইয হয়ে যাবে। তারপর আর ভয় নেই। লবণ পানিতে পরিণত হবে সলিউশনটা। তবে কাজটা ঝটপট সেরে ফেলতে হবে।'

অ্যান্টিডোটটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মুসা। পরমুহূর্তে দরজার দিকে দৌড় দিলাম আমরা।

এগারো

বাসে বাড়ি পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল, অথচ মনে হলো যেন কয়েক ঘণ্টা। দেখতে পাচ্ছি অ্যান্টিডোট বইতে বেশ কষ্ট হচ্ছে মুসার।

বাড়িতে যখন ঢুকলাম চারদিক সুনসান। না রেডিও, না টিভি। কিচ্ছু না। গা শিরশির করে উঠল আমার। নীরব বিপদ যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়বে যে কোনো মুহূর্তে

বাড়ি ভেঙে ববের ঘর লক্ষ্য করে উঠে যাচ্ছি চারজনে। হঠাৎ চিন্তাটা এল মাথায়। ফলস হলের ঘড়িটার শব্দ শুনতে পেলাম না কেন? ব্যানিস্টারের উপর দিয়ে পারদের মত গলা বাড়িয়ে দিলাম। ঘড়ির কাঁটা চারদিকে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে আছে। কাঁটা দুটো বেঁকে তুবড়ে গেছে, পিছনের পেণ্ডুলামটা মেঝেতে পড়িয়েছে। ওজন ধরে রাখার স্টীলের পাতটা আধ ইঞ্চি পুরু। বাঁকা হয়ে গেছে।

শ্বাস বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বব কাজটা কেন করল? নিশ্চয়ই ঘরের ভিতর নরক নেমে এসেছিল সে মুহূর্তে। আমরা কি ফিরতে দেরি করে ফেলেছি? ও কি আমার জন্য বসে রয়েছে উপরতলায়? নাকি নীচতলায়? কোন কোণে-টোণে ঘাপটি মেরে নেই তো? ছুটে পালাতে মন চাইল।

পিঠে কিশোরের খোঁচা খেয়ে হুঁশ ফিরল। পরের ধাপে পা রেখে উঠতে লাগলাম দুরুদুরু বুকে।

সিঁড়ির প্রায় মাথায় পৌঁছে গেছি আমরা। একটা ধাপ টপকে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দটা এড়ালাম। পরমুহূর্তে দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিলিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে অনুসরণ করছে দুই বন্ধু আর লিযি। ইশারায় ওদেরকে বিশেষ ধাপটা টপকাতে বললাম। কিন্তু কিশোর আর মুসা বুঝলেও বুঝল না লিযি। ফলে যা হবার তাই হলো। বিশ্রী শব্দ উঠল!

দম আটকে রেখেছি। এক লাফে আমার পাশে এসে দাঁড়াল লিযি। বলতে লজ্জা নেই, চোখ বুজে ফেললাম আমি।

ববের কামরার দরজা তখনও বন্ধ।

ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ছি। এবার একটু একটু করে খুলে যেতে শুরু করল দরজাটা।

কিশোর ভ্রূ দেখাল সিঁড়ির নীচ দিক লক্ষ্য করে। সদর দরজা খুলে রেখে এসেছি আমরা। বাতাসের শব্দ। ববের রুমের দিকে ফিরে তাকালাম। বিশ্বাস হলো না নিজের চোখকে।

বব নয়, আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছে এক ওরাংওটান। পরনে ববের জিম শর্টস। লালচে-বাদামি লোমে সারা গা ভর্তি। লম্বা দু'বাহু বিস্তার পেয়েছে মেঝে অবধি, আঙুলের গাঁট স্পর্শ করেছে কার্পেট। চিড়িয়াখানার বানর-ঘরের মত দুর্গন্ধ ভক করে নাকে এসে লাগল।

'খাইছে!' মুসার অস্ফুট কণ্ঠ।

একপাশে এক গাদা কলার খোসা। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে ও।

ঢোক গিললাম। এই জানালা দিয়ে ববের চেয়ে থাকার অর্থ, ও জেনে গেছে আমরা বাড়িতে ঢুকেছি। পরক্ষণে পাঁই করে ঘুরে বসল ও।

সরাসরি আমার দিকে দৃষ্টি ওর। চোখের ভাষায় বিষাদের ছায়া। চেয়ার থেকে নেমে আমার উদ্দেশে এগোতে লাগল ও। সভয়ে শ্বাস টানতে শুনলাম লিযিকে।

'অ্যান্টিডোট রেডি করো,' মুসাকে বলল ফিসফিস করে।

হেলেদুলে এগোচ্ছে বব। আমার উপর থেকে দৃষ্টি সরাচ্ছে না পলকের জন্যও। চোখের মণিতে এখনও বিষণ্নতা। ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে, আস্তে করে লাগিয়ে দিল।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর মুসা। আমরা যা ভেবেছিলাম তার চাইতে সহজ হবে কাজটা। সিধে হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুললাম। চেয়ারে বসে

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে বব। কিন্তু বিদ্যুতের মত ঘুরে বসে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার ছাড়ল ও। সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল আমার ঘাড়ের লোম।

বেসবল ব্যাট হাতে আমার দিকে তেড়ে এল বব। ঝট করে পিছিয়ে গেলাম আমরা চারজন। পিছু হটতে গিয়ে কিশোরের পায়ে পা বেধে পড়ে গেলাম চিত হয়ে। ভাগ্যিস পড়ে গিয়েছিলাম, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে ধাঁই করে ব্যাট চালিয়েছে বব। কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে আমাদের উপর ধপাস করে পড়ে গেল ও।

ওকে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে, ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম। লিযি ইতোমধ্যে পড়িমরি ছুটেছে সিঁড়ি লক্ষ্য করে। মুসা ব্যাটটা ববের হাত থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অসুরের শক্তি যেন ভর করেছে ববের উপর।

'খাইছে!'

'আমি পুলিস ডাকছি। ও ভীষণ ডেঞ্জারাস!' চেঁচাল লিযি।

'মুসা,' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ট্যাঙ্কটা কিছুতেই হাত ছাড়া কোরো না।' আমার কথা শুনে ঝেড়ে দৌড় দিল মুসা।

ওর হাত থেকে খসে, অ্যান্টিডোটের ট্যাঙ্কটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। সহসাই যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে গোটা বাড়িতে।

'পুলিস ডেকো না, লিযি,' হেঁকে বললাম। 'ওকে ওষুধ দিতে হবে।'

ববের ঘরের দরজাটা টেনে ধরে রাখলাম, বেরোতে যাতে না পারে।

লিযি আমার কথা শুনতে পায়নি। কিচেনে ডায়ালের শব্দ পাচ্ছি। প্রতিষেধক দেওয়ার আগেই যদি পুলিস এসে পড়ে তবে ববকে সোজা চালান দেবে। আমি কোন কিছুই ব্যাখ্যা করার সুযোগ পাব না। আমার ভাই চিরদিনের জন্য ওরাংওটান হয়ে যাবে।

হঠাৎই ডোরনবটা আলগা হয়ে এল। বব তার ঘরের জানালা খুলে ফেলেছে। জানালা বেয়ে নেমে সামনের দিক দিয়ে আমাদের ধরতে আসছে ও।

সামুরাই তরোয়াল! কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে এক ছুটে আমার কামরায় চলে গেলাম। খাপ থেকে এক টানে বের করে দৌড় দিলাম হলঘর লক্ষ্য করে। আশা করছি এটা দেখে ভয় পাবে বব। ওকে তো আমি সত্যি সত্যি আঘাত করতে পারব না।

সদর দরজায় এসময় উদয় হলো বব, ব্যাট দোলাচ্ছে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে। 'পালাও, বাঁটকু, আমি নিজেকে সামলাতে পারছি না,' চেঁচিয়ে উঠল। এক দৌড়ে ফ্রন্ট হলে চলে এল মুসা। এখনই সময়।

'ভেবেছ বন্ধুদেরকে নিয়ে এসে আমাকে শায়েস্তা করবে?' গর্জে উঠল বব। মট করে ভেঙে ফেলল ব্যাটের নীচের অংশটুকু। বাকিটা রয়ে গেল ওর হাতে। কী পাচ্ছে শক্তি এসে গেছে ওর গায়ে! তবে ঘাবড়ালাম না। বাঘা গর্জন ছেড়ে, তরোয়াল বাগিয়ে ধেয়ে গেলাম। বব আঁতকে উঠে পিছু হটল।

পলায়নপর ববকে অনুসরণ করলাম আমি।

'অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো, মুসা,' চেঁচিয়ে বলে গেলাম।

ব্যাকইয়ার্ডে পৌঁছে, বব তড়িঘড়ি সেলারের দরজা খুলে মিশে গেল নিকষ

অন্ধকারে। এবার আমার আঁতকানোর পালা। সেলারটাকে ও হাতের উল্টো পিঠের মত চেনে। আঁধার ঘরে বাড়তি সুবিধা পাবে ও। আর ফোকরটাও রয়েছে ওখানে। আমাকে ওটার ভিতরে ঢুবাতে চায়নি ও?

'রবিন, নেমে এসো এখানে!'

ববের গলা। এখনও কথা বলতে পারছে! তারমানে সব আশা শেষ হয়ে যায়নি এখনও। ওকে এখনও বাঁচাতে পারব আমি।

এমনিসময়, দূরাগত পুলিসের সাইরেন শোনা গেল। এদিকেই আসছে।

গুপ্তঘরের অন্ধকারে উঁকি মারলাম আমি।

'রবিন, নেমে এসো। আমি কিছু করব না। তুমি না আমার ভাই?'

পিছে সরে এলাম, তারপর এক লাফ মেরে গিয়ে পড়লাম বেসমেন্টের উপর। হাঁটু ভেঙে বসে, এক গড়ান দিয়ে দেয়ালে গা মিশিয়ে দিলাম।

এবং একেবারে সঠিক সময়ে। কেননা আমার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে ব্যাট চালিয়েছিল বব।

চরকির মত ঘুরে মাথার উপর লম্বালম্বি তুলে ধরলাম তরোয়ালটা। দেয়ালে পিঠ। আমাকে বাগে পেতে হলে আলোয় আসতে হবে ববকে। দরজা দিয়ে আলোর রেখা প্রবেশ করেছে ঘরে। আর সেই আলোয় লোমশ ববকে যে কী ভয়ঙ্কর লাগছে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

এক মুহূর্ত পরে, আমার হাঁটু লক্ষ্য করে ব্যাট চালাল বব। তরোয়াল দিয়ে ঠেকালাম আঘাতটা, কিন্তু তাল হারিয়ে ফেললাম। পড়ে গিয়ে, গড়িয়ে আবারও গা ঢাকা দিলাম অন্ধকারে। হাত থেকে ছিটকে চলে গেছে সামুরাই তরোয়াল, ছলাত করে ফোকরের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে বব, ব্যাট হাতে।

'এখুনি গোসল করতে হবে তোমাকে, বাঁটকু। তা নাহলে আমার হাত থেকে নিস্তার নেই। ব্যস, একবার শুধু গোসল করবে, তারপর আবার আমরা ভাই-ভাই হয়ে যাব।'

সটান উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে গেলাম ওর দিকে। ও যেই ব্যাট দিয়ে মারতে যাবে, ঝাঁপ দেব আমি।

'ঠিক আছে, বব,' বললাম, 'আমি রাজি।'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত দেখা গেল, তারপর হাসি ফুটল ওর মুখে।

'খুশি লাগছে যে তুমি··· '

হঠাৎই মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে যেন।

'রবিন···রবিন, আঘাহ্ননন।'

চোখজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত। বিড়বিড় করে কী সব আওড়াচ্ছে। যতই রেগে উঠছে ক্রুদ্ধ বানরের মত শব্দ করছে।

'বব,' চেঁচিয়ে বললাম, 'শান্ত থাকো··· আমি তোমাকে বাঁচাব···'

তড়াক করে লাফিয়ে সরে গেল ও, কী সব আওড়ে চলেছে দ্রুত লয়ে। একটু

পরে খেপে উঠে গোটা কামরাময় ব্যাট ঘুরাতে লাগল।

এসময় আমাদের ব্লকে প্রবেশ করল পুলিস কার।

আর সেলারের দরজায় দেখা দিল কিশোর, মুসা আর লিযি। মুসার হাতে অ্যান্টিডোট।

আমার কাজ হলো, ববকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া, মুসা সহজে যাতে প্রতিষেধক ব্যবহার করতে পারে।

কাজটা সহজ হবে না। বেসবল ব্যাট দিয়ে ফুলদানি আর দেয়ালে ক্রমাগত বাড়ি মেরে চলেছে বব। মুসা ছুটে যাচ্ছিল, চিৎকার করে নিষেধ করলাম।

এসময় আমাদের বাসার সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল পুলিস কার দুটো।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'সময় নেই!'

আমার মুখের কথা মাটিতে পড়ার আগেই গোয়েন্দাপ্রধান ঢুঁ মারার ভঙ্গিতে তেড়ে গেল ববকে লক্ষ্য করে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। ব্যাটটা চেপে ধরল এক হাতে, তারপর আরেক হাতের ধাক্কায় ওকে ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও।

'সাবাস!' চেঁচিয়ে বলল লিযি।

চোখের পলকে ববের আপাদমস্তক স্প্রে করে দিল মুসা।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না বব, পড়ে গেল। গোঙাতে গোঙাতে, গুড়ি মেরে গা ঢাকা দিল আঁধারে। প্রতিষেধক কাজ করল কিনা কে জানে।

ডোরবেল বেজে উঠল। পুলিস।

'মুসা, শিগ্‌গির লুকিয়ে ফেলো স্প্রে মেশিনটা,' চাপা গলায় বলে উঠলাম। মুসাকে দৌড় দিতে দেখলাম। অন্ধকারে যন্ত্রটা লুকিয়ে রাখছে ঘরের এক কোণে।

'খানিকটা রয়ে গেছে,' বলল ও।

একটু পরে, চারজনে বাড়িটাকে পাক দিয়ে চলে এলাম সদর দরজার কাছে। ভান করছি, যেন কিছুই হয়নি।

দরজার কাঁচ ভেদ করে দুই পুলিস ভিতরে উঁকি দিচ্ছে।

'তোমরা এখানে থাকো?' একজন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' জানাল কিশোর। 'কদিন আগে এসেছি।'

'এখানে নাকি কী সব গণ্ডগোল হচ্ছে, ফোন পেয়ে দেখতে এসেছি,' বলল অপর পুলিস অফিসার।

'গণ্ডগোল?' মুসা যারপর নাই বিস্মিত।

'হ্যাঁ,' বলে চলল দ্বিতীয়জন, 'কী যেন, টমাস, বানর না কী?' প্রথম জনকে উদ্দেশ্য করে বলল।

আমরা মুখে নির্লিপ্ততার মুখোশ আঁটলাম।

'এক্সকিউজ মি, অফিসার, আমাদের ছেলেরা আবার বাঁদরামি করেছে বুঝি?'

চাচা-চাচী ফিরে এসেছেন!

'আরে, কিশোর, মুসা, কখন এলে?' চাচী প্রশ্ন করলেন।

'কাল রাতে,' জানাল কিশোর। 'আপনারা ভাল আছেন, আঙ্কল, আন্টি?'

মাথা ঝাঁকালেন দু'জনেই।

'অফিসার, আমাদের এখানে এসে গুছিয়ে নিতে একটু সমস্যা হচ্ছিল প্রথম-প্রথম। এখন আর কোন প্রবলেম নেই, কি বলিস, রবিন?' চাচা বললেন।

দেরি না করে মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

'গুড,' বলল পুলিস অফিসার। 'আমরা তাহলে চলি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে চলে গেল তারা।

ঠিক এমনিসময় সদর দরজা খুলে গেল। বব। একদম স্বাভাবিক।

'সরি, মা, আমি ঘর-দোর সব নোংরা করে রেখেছি। চিন্তা কোরো না, এখুনি সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি,' বলল।

'ঘড়িটা ভাঙার কী ব্যাখ্যা দেবে ও?' বলল কিশোর। কাঁধ ঝাঁকালাম আমি।

'আমরাও হাত লাগাই?' প্রস্তাব করল মুসা।

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়। থ্যাংক ইউ।'

একটু পরে, লিযি বিদায় নিয়ে চলে গেল বাড়িতে।

সন্ধে উতরে গেল আমাদের সব গোছগাছ করতে।

সে রাতে ক্লান্ত দেহে বিছানায় গেলাম। একই ঘরে আলাদা দুটো কিটকটে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিশোর আর মুসার।

বিছানায় গা এলিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলাম। কী ভয়ঙ্কর এক উইকএন্ড কাটালাম, বাপরে!

ভাগ্যিস চাচা-চাচী কিছু টের পাননি। বললে অবশ্য ওঁরা বিশ্বাসও করবেন না। তা ছাড়া রক্তের শপথ নিয়েছি না বব আর আমি? বলে দিলে শপথ ভাঙা হবে না?

তড়াক করে উঠে বসলাম বিছানায়। চেয়ে দেখলাম সারা দিনের ক্লান্তির পর অঘোরে ঘুমোচ্ছে কিশোর আর মুসা। রক্তের শপথ! এর মানে, বব যখন ওরাংওটানে পরিণত হচ্ছিল তখন পরস্পর রক্ত মিশাই আমরা। মি. হিচকক বলেছেন, ওঁর ফর্মুলা রক্তের মাধ্যমে কাজ করে! তবে কি আমিও রূপান্তরিত হচ্ছি বানরে?

হাতের দিকে চাইলাম। তালুর উল্টোপিঠ হালকা বাদামি লোমে ছেয়ে গেছে। আমার পায়ের পাতা দুটোকে দেখাচ্ছে ঠিক বানরের থাবার মত।

এক লাফে নেমে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। পা টিপে টিপে এগোলাম দরজার দিকে। সেলারে যাব। মুসা ওখানে লুকিয়ে রেখেছে অ্যান্টিডোট। ও বলেছিল, খানিকটা নাকি রয়ে গেছে এখনও। কাজেই ভয় পেলাম না। ববের মত আমিও সেরে যাব। ঠিক করলাম, ব্যবহারের পর বাকিটুকু ছিটিয়ে দেব ফোকরটার ভিতরে। তা হলে আর কারও বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে না।

***